প্রক্ষিপ্ত তাহার অশনিকে বজ্র দ্বারা প্রহার করিয়াছিলে, তখন নির্যাতনার্থ সমাগত সেই বৃত্রকে হননেচ্ছায় তোমার বল আকাশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

৮৬১

১৪ অভিষ্টনে তে অদ্রিবো যৎ স্থা জগচ্চ রেজতে। ত্বষ্টা চিত্তব মন্যব ইন্দ্র বেবিজ্যতে ভিয়ার্চন্ননু স্বরাজ্যং॥

[illegible] তব "অভিষ্টনে" [illegible] [illegible] 'জগৎ' [illegible] 'চ' 'যৎ' অস্তি [illegible] 'ত্বষ্টা চিৎ' বজ্রনির্ম্মাতা [illegible] বেবিজ্যতে কোপাৎ ভিয়া ভীত্যা [illegible] সমানং।

১৪ হে বজ্রধর ইন্দ্র! তোমার সিংহনাদে স্থাবর জঙ্গম কম্পিত হয়। বজ্রনির্ম্মাতা বিশ্বকর্ম্মাও তোমার কোপ-ভয়ে পুনঃপুন কম্পিত হন। তুমি এই রূপে স্বীয় স্বাধীনতা বিস্তার করিতেছ।

৮৬২

১৫ নহি নু যাদধীমসীন্দ্রং কো বীর্যা পরঃ। তস্মিন্নৃম্ণমুত ক্রতুং দেবা ওজাংসি সংদধুরর্চন্ননু স্বরাজ্যং॥

[illegible] সর্ব্বত্র ব্যাপ্য বর্ত্তমানং 'ইন্দ্রং' 'নহি' 'নু' 'অধীমসি' [illegible] যত্তোনবকল্প্যোঃ। [illegible] [illegible] মহারাজনবায়ে [illegible] পরোদিবা পর- [illegible] পরঃ পরস্তাদভিদূরে [illegible] 'বীর্য্যা' বীর্য্যেণ সামর্থ্যেন বর্ত্তমানমিন্দ্রং 'কঃ' মনুষ্যঃ জানীয়াৎ ন কোঽপীত্যর্থঃ। [illegible] তত্রাহ [illegible]। যস্মাৎ 'তস্মিন্' ইন্দ্রে 'দেবাঃ' 'নৃম্ণং' ধনং [illegible] 'ক্রতুং' বীর্য্যং কর্ম্ম 'ওজাংসি' বলানি চ 'সং- দধুঃ' [illegible]। [illegible]

১৫ সর্ব্বত্রগামী ইন্দ্রকে আমরা অবগত নহি। অতি দূরে বর্ত্তমান ইন্দ্রের সামর্থ্য কোন মনুষ্যই জানিতে পারে না; যে হেতু দেবতারা ইন্দ্রেতে ধন, বীর্য্য ও বল স্থাপন করিয়াছেন। ইন্দ্র স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন।

৮৬৩

১৬ যামথর্বা মনুষ্পিতা দধ্যঙ্ ধিয়মত্নত। তস্মিন্ ব্রহ্মাণি পূর্বথেন্দ্র উক্থা সমগ্মতার্চন্ননু স্বরাজ্যং॥ ১। ৫। ৩১।

১৬ 'অথর্বা' এতৎসংজ্ঞকঋষিঃ 'পিতা' সর্ব্বাসাং প্রজানাং পিতৃভূতঃ 'মনুঃ' চ 'দধ্যঙ্' অথর্ব্বণঃ পুত্রঃ এতৎ সংজ্ঞকঃ ঋষিশ্চ 'যাং' 'ধিয়ং' [illegible] কর্ম্মোপেত অকুর্ব্বন্ [illegible] 'তস্মিন্' কর্ম্মণি যানি 'ব্রহ্মাণি' হবির্লক্ষণানি অন্নানি 'উক্থ' শস্ত্ররূপাণি স্তোত্রাণি চ যানি সন্তি তানি সর্ব্বাণি তস্মিন্ 'ইন্দ্রে' [illegible] সমগচ্ছন্ত। [illegible] দৃষ্টান্তঃ। 'পূর্ব্বথা' [illegible] [illegible] যজ্ঞেষু যথা হবীংষি স্তোত্ররূপাণি [illegible] তদ্বৎ। স ইন্দ্রঃ [illegible] 'অনু' প্রকাশ বৃত্রবধাদি রূপেণ [illegible] প্রকটয়তি, ত্যর্থঃ। ১। ৫। ৩১।

১৬ ইন্দ্রে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিদিগের যজ্ঞের ন্যায় অথর্ব্ব, সকলের পিতা মনু, ও দধ্যঙ্ নামক ঋষিদিগের যজ্ঞীয় অন্ন ও স্তোত্র সকল গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ইন্দ্র বৃত্র বধাদি দ্বারা স্বকীয় আধিপত্য প্রকটিত করিতেছেন। ১। ৫। ৩১।

পঞ্চমোধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

মেদিনীপুরে গোপগিরিতে বসন্ত কালে ব্রহ্মোপাসনা।

বসন্ত ঋতু উপস্থিত, প্রাতঃ-সূর্য্য সমুদিত, গোপগিরি প্রফুল্লিত। আমরা এই শুভ ক্ষণে এক কালে নূতন ঋতু, নূতন দিবস, শরীর ও মনের নূতন বীর্য্য, লাভ করিয়াছি। সকলই অভিনব; আমারদের ভক্তি-পুষ্প অভিনব রূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই মঙ্গলময়ের চরণে কি অর্পিত হইবে না? বন উপবন, গিরি কানন, স্রোতঃস্বতী, তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে; পক্ষিগণ বৃক্ষ-শাখায় আরূঢ় হইয়া তাঁহার গুণ গান করিতেছে; মলয় সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া তাঁহার যশ প্রচার করিতেছে; স্বয়ং বসন্ত গন্ধ পুষ্প

দেহে লইয়া তাঁহার পূজার জন্য অগ্রসর হইয়াছে; আমরাই কি কেবল তাঁহার উপাসনা হইতে বিরত থাকিব? তিনিই এই নব ঋতু, নব পত্র, নব নব কলিকা প্রেরণ করিতেছেন। যিনি ব্যাধিকে আরোগ্যে, বিপদ্‌কে সম্পদে, পরাজয়কে জয়ে পরিণত করেন; তিনিই বসন্তের প্রকাশ করেন। যিনি শীতকে বসন্তে, ব্যাধি আরোগ্যে, বিপদ্ সম্পদে, পরাজয় জয়ে, পরিণত করেন; তিনি কি মৃত্যুকে অমৃতেতে পরিণত করিতে পারেন না? সেই পারলৌকিক জীবন, বসন্তের ন্যায় আমারদিগের সম্বন্ধে স্ফুরিত হইবে; বাহ্য সূর্য্য আমারদিগের সম্মুখে এক্ষণে যে রূপ দীপ্তি পাইতেছে, তাহা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর রূপে প্রেম সূর্য্য পরলোকে আমারদের সম্মুখে দীপ্তি পাইবেক। যে মঙ্গলময় পিতা আমারদিগকে ইহ কালে ধর্ম্মাচরণের সুখের পর আবার পর লোকে অমৃত আনন্দ প্রদান করিবেন, তাঁহার উপাসনাতে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাক। তাঁহাকে প্রীতি কর, তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর; তাহা হইলে বসন্তের কুসুম অপেক্ষা তোমারদের হৃদয় মধুময় হইবে, বসন্তের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সৌন্দর্য্য তোমারদের মুখশ্রীতে প্রকাশিত হইবে, মলয়-সমীরণ অপেক্ষা প্রফুল্লকর আত্ম-প্রসাদের হিল্লোল তোমারদের অন্তরে নিত্য সঞ্চরণ করিবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

৬ চৈত্র ১৭৮৭ শক।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

যিনি চন্দ্র-তারকে থাকিয়া—চন্দ্র-তারকের অন্তরে থাকিয়া চন্দ্র-তারককে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই আমারদের আত্মাতে থাকিয়া—আত্মার অন্তরে থাকিয়া জ্ঞান ধর্ম্মে তাহাকে পরিপুষ্ট ও উন্নত করিতেছেন। তিনি আকাশে, তিনি আত্মাতে। তিনি বাহিরে, তিনি অন্তরে। তিনি সর্ব্ব-সাক্ষী, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষ। তিনিই আমারদের আরাধ্য দেবতা। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য দূরে যাইতে হয় না, দেশ বিদেশে অনুসন্ধান করিতে হয় না—তাঁহার প্রিয় আবাস-স্থান এই পবিত্র আত্মা। যিনি আপনার আত্মাকে পবিত্র করেন, তিনি তাঁহাকে অন্তরে দেখিতে পান। আকাশের রূপ নাই; আকাশকে চক্ষে দেখা যায় না, আকাশকে হস্তে ধারণে পারি না—তথাপি আমার সম্মুখে এই প্রকাশিত অনন্ত আকাশকে আমি সুস্পষ্ট অনুভব করিতেছি। এই শূন্য আকাশকে আমরা যে রূপ অনুভব করিতেছি, পূর্ণ ঈশ্বরকেও সে রূপ অনুভব করি না—আমারদের এ কি মোহ! আকাশ শূন্য পদার্থ—ঈশ্বর অনাকাশ, তিনি আকাশ নহেন, তিনি শূন্য নহেন, তিনি পূর্ণ, তিনি সত্য। আকাশ তাঁহার সত্তাতে—সেই সত্যের সত্তাতে পূর্ণ রহিয়াছে। তথাপি শূন্য আকাশকে আমরা যে রূপ অনুভব করিতেছি, পূর্ণ ঈশ্বরকে সে রূপ অনুভব করি না। যিনি এই আকাশে রহিয়াছেন; তিনি আবার যেখানে আকাশ নাই, সেখানেও রহিয়াছেন। আকাশ নাই কোথায়? আকাশ নাই আত্মাতে। আপনার শরীরের মধ্যে অশরীর আত্মাকে দেখ, দেখিবে যে সেখানে আকাশ নাই। আত্মাতে আকাশ নাই—আত্মা আকাশের অতীত পদার্থ। আত্মা স্থূল নহে, অণু নহে, হ্রস্ব নহে, দীর্ঘ নহে, এই আত্মার মধ্যেই অনাকাশ স্বপ্রকাশ পরমাত্মা অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি বাহিরে এই সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত

লক্ষেই আমরা কার্য্য-কারণ-তত্ত্বের প্রয়োগ করিয়া থাকি; কিন্তু আমরা যতদূর প্রয়োগ করিতে চাই—ফলে ততদূর পারিয়া উঠি না—অনেকটা আমাদের হাতে বাকি থাকিয়া যায়। যখন আমরা দেখি একখণ্ড দগ্ধ কাষ্ঠ পড়িয়া আছে তখনই আমরা মনে করি যে, অগ্নির দাহিকা শক্তির প্রভাবেই কাষ্ঠের এইরূপ ভাব-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে,—অগ্নিতে আমরা দাহন-কার্য্যের কারণত্ব আরোপ করি; কিন্তু তাহা করিয়াই আমাদের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। অগ্নি যে দাহন করে—তাহা কেন করে? কাহার শক্তি তাহাকে দাহন-কার্য্যে প্রবৃত্ত করে? আবার অগ্নিকে যে দাহন-কার্য্যে প্রবৃত্ত করে,—সে-ই বা কে? এবং তাহার সেই প্রবর্ত্তনা-কার্য্যেরই বা কারন কি? এইরূপ ক্রমাগতই কারণের পৃষ্ঠে কারণ লাগিয়া আছে, কোথাও তাহার অন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অনেক দার্শনিক পণ্ডিত আরোহী প্রণালী-অনুসারে কারণের মূল-আবিষ্কারে পরাভব মানিয়া শেষে এইরূপ এক অযথা সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া বসেন যে, কার্য্য-কারন-তত্ত্ব নিতান্তই বুদ্ধির অতীত—উহার আলোচনায় ক্ষান্ত থাকাই শ্রেয়। যদি আরোহী প্রণালী ভিন্ন আর কোন প্রকার যুক্তি-প্রণালী না থাকিত তবে ইহাঁদের কথা অকাট্য হইত; কিন্তু নিম্নে আমরা দেখাইব যে, একরূপ যুক্তি প্রণালীতে যে প্রশ্নের কিছুই মীমাংসা হয় না, আর একরূপ যুক্তি-প্রণালীতে তাহার মীমাংসা অতীব সহজে নিষ্পন্ন হইতে পারে।

প্রমাণের বিষয় যেমন নানা প্রকার, প্রমাণের পদ্ধতিও সেইরূপ নানা প্রকার; কোন পদ্ধতি কোন বিষয়ে খাটে—কোন বিষয়ে খাটে না। অতি-একটি সহজ বিষয়কেও যদি অনুপযুক্ত পদ্ধতি দ্বারা আয়ত্ত করিতে যাও—দেখিবে যে, তাহা কিছুতেই তোমাকে ধরা দিবে না। নিম্নে ইহার একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি।

ক খ

মনে কর ক দুই হাত পিছাইয়া আছে, খ দুই হাত এগিয়া আছে; আর মনে কর যে, ক যদিও দুই হাত পিছাইয়া আছে, তথাপি তাহা গ অপেক্ষা দ্বিগুণ বেগে চলে; ক এক নিমেষে দুই হাত অতিবাহন করে, খ এক নিমেষে এক হাত মাত্র অতিবাহন করে। মনে কর, ক এবং খ উভয়েই চলিতে আরম্ভ করিল; খ একগুণ বেগে চলিতেছে—ক দ্বিগুণ বেগে চলিতেছে; এস্থলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে কিয়ৎকাল পরেই ক, খ'কে ধরিতে পারিবে,—এবং তাহার পরেই খ'কে পশ্চাতে ফেলিয়া এগিয়া যাইবে, কিন্তু আমি আমার যুক্তি-প্রণালী অনুসারে প্রমাণ করিব যে, ক কখনই খ'কে ধরিতে পারিবে না। সে প্রণালী এইরূপ;—

ক খ গ ঘ

মনে কর, ক-স্থান হইতে ক এবং খ-স্থান হইতে খ একই সময়ে চলিতে আরম্ভ করিল, এবং উভয়ের মধ্যে দুই হাত মাত্র ব্যবধান; ক সেই দুই হাত ব্যবধান অতিক্রম করিয়া যখন ক-স্থান হইতে খ-স্থানে উপনীত হইল, খ তখন চুপ করিয়া বসিয়া নাই,—ক যেমন দুই হাত অতিক্রম করিয়া খ-স্থানে উপনীত হইল, খ তেমনি এক হাত অতিক্রম করিয়া গ-স্থানে উপনীত হইল, কেননা খ'য়ের গতি-বেগ ক-অপেক্ষা অর্দ্ধেক কম। এইরূপ ক যখন খ'য়ের প্রথম স্থানে—অর্থাৎ খ-স্থানে—আসিবে, খ তখন তাহার সেই প্রথম স্থান হইতে এক হাত দূরে দ্বিতীয়-স্থানে (অর্থাৎ গ-স্থানে) যাইবে; তাহার পর, ক যখন সেই এক হাত অতিক্রম করিয়া খ'য়ের দ্বিতীয় স্থানে (গ-স্থানে) যাইবে, খ তখন আধ হাত অতিক্রম করিয়া তৃতীয়

স্থানে (অর্থাৎ গ-স্থান হইতে ঘ-স্থানে) যাইবে; তাহার পর ক যখন সেই আধ হাত অতিক্রম করিয়া খ'য়ের তৃতীয় স্থানে (ঘ স্থানে) যাইবে, খ তখন সিকি হাত অতিক্রম করিয়া চতুর্থ স্থানে যাইবে; ক যখন সেই সিকি হাত অতিক্রম করিয়া খ'য়ের চতুর্থ স্থানে যাইবে, খ তখন অর্দ্ধ সিকি হাত অতিক্রম করিয়া পঞ্চম স্থানে যাইবে; ক যখন সেই অর্দ্ধ সিকি হাত অতিক্রম করিয়া খ'য়ের পঞ্চম স্থানে যাইবে, খ তখন সিকির সিকি হাত অতিক্রম করিয়া ষষ্ঠ স্থানে যাইবে : এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ক এবং খ'য়ের মধ্যে প্রথমে দুই হাত ব্যবধান ছিল ; ক যখন খ'য়ের পরিত্যক্ত খ-স্থানে আসিল, তখন উভয়ের মধ্যে এক হস্ত ব্যবধান রহিল ; ক যখন খ'য়ের পরিত্যক্ত গ-স্থানে আসিল, তখন উভয়ের মধ্যে অর্দ্ধ হস্ত ব্যবধান রহিল ; ক যখন খ'য়ের পরিত্যক্ত ঘ-স্থানে আসিল তখন উভয়ের মধ্যে সিকি হস্ত ব্যবধান রহিল ; ক যখন খ'য়ের চতুর্থ স্থানে আসিল উভয়ের মধ্যে তখন অর্দ্ধ সিকি হাত ব্যবধান রহিল ; ক যখন খ'য়ের পঞ্চম স্থানে আসিল, উভয়ের মধ্যে তখন সিকির সিকি হাত ব্যবধান রহিল ; ক্রমাগতই এইরূপ পদ্ধতি অনুসারে উভয়ের মধ্যে অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক করিয়া ব্যবধান কমিতে থাকিল—কিন্তু কোন কালেই ব্যবধান তিরোহিত হইল না। এক ব্যবধান আর-এক ব্যবধানের সিকির সিকির অর্দ্ধেক হইলেও তাহা ব্যবধান—সিকির সিকির সিকি হইলেও তাহা ব্যবধান, যতই অল্প ব্যবধান ভাবো না কেন তাহাও ব্যবধান তাহার আর ভুল নাই ;—অতএব আমার যুক্তি প্রণালী অনুসারে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কোন কালেই ক এবং খ উভয়ের মধ্যে ব্যবধান একেবারেই বিলুপ্ত হইবে না, খ একটু না একটু এগিয়া থাকিবেই থাকিবে ; অতএব প্রমাণ হইল যে, ক—খ'কে কিছুতেই ধরিতে পারিবে না।

উপরে শুদ্ধ কেবল স্থানিক যুক্তি প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে,—ক যখন খ'য়ের পরিত্যক্ত স্থানে পৌছিবে খ তখন সে স্থান হইতে একটু না একটু দূরে সরিয়া যাইবে —এইরূপ স্থান-ঘটিত প্রমাণ প্রয়োগ করা হইয়াছে ; কিন্তু সেরূপ যুক্তি-প্রণালী এখানকার অনুপযোগী ইহা বলা বাহুল্য। কালিক যুক্তি-প্রণালীতে সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, ক যখন এক নিমেষে দুই হাত অতিবাহন করে, তখন দুই নিমেষে ক-স্থান হইতে ৪হাত দূরে অগ্রসর হইবে, আর খ সেই দুই নিমেষে খ-স্থান হইতে দুই হাত (সুতরাং ক-স্থান হইতে ৪ হাত) দূরে অগ্রসর হইবে ; দুই নিমেষে উভয়েই ক-স্থান হইতে ৪ হাত দূরে পৌছিবে; অতএব প্রমাণ হইল যে, দুই নিমেষে ক খ'কে ধরিবে।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে শুদ্ধ কেবল স্থানিক যুক্তি-প্রণালী দ্বারা যাহা কোন মতেই প্রমাণ-সাধ্য নহে, কালিক যুক্তি-প্রণালী দ্বারা তাহা অতি সহজে সপ্রমাণ হয়। এখন, মূল কারণের অস্তিত্ব-প্রমাণ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদিও কারণের কারণ—তস্য কারণ—এরূপ করিয়া উপর্য্যুপরি ঊর্দ্ধে উড্ডয়ন করিতে থাকিলে কোন কালেই মূল কারণে পৌছান যায় না—যদিও কালিক যুক্তি-প্রণালী অনুসারে মূল-কারণের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারা যায় না—তথাপি আমরা আধ্যাত্মিক প্রণালী অনুসারে মূল-কারণের অস্তিত্ব স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারি"। উপরে আমরা দেখাইয়াছি যে, যাহা স্থানিক প্রমাণ-দ্বারা কোন মতেই সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহা কালিক প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে ; এক্ষণে আমরা দেখাইতে চাই যে, এমনও বিষয় আছে যাহা কালিক প্রমাণ

দ্বারা কোন মতেই সিদ্ধ হয় না, অথচ আধ্যাত্মিক প্রমাণ দ্বারা অনায়াসেই সিদ্ধ হয়।

দেশ-ঘটিত এমন কতক-গুলি তত্ত্ব আছে যাহা কাল-সম্বন্ধেও খাটে; আবার দেশ-ঘটিত এমনও কতক-গুলি তত্ত্ব আছে যাহা কাল-সম্বন্ধে আদবেই খাটে না। মধ্য ভাগ অতিক্রম না করিয়া অন্ত-ভাগে পৌঁছানো যায় না—এ তত্ত্বটি দেশ কাল উভয়েতেই খাটে; যেমন বলা যাইতে পারে যে, দুই ক্রোশ অতিবাহন না করিয়া চারি ক্রোশে পৌঁছানো যায় না, তেমনি বলা যাইতে পারে যে, দুই ঘণ্টা অতিক্রম না করিয়া চারি ঘণ্টায় পৌঁছানো যায় না। কিন্তু যদি বলা যায় যে, অগ্র-পশ্চাৎ পরিবর্ত্তিত হইলেই পার্শ্ব পরিবর্ত্তিত হইবে, তবে এ তত্ত্বটি কেবল দেশের সম্বন্ধেই খাটে—কালের সম্বন্ধে খাটে না; দেশের সম্বন্ধেই বলিতে পারো যে, পূর্ব্ব-মুখা হইয়া দাঁড়াইলে শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব দক্ষিণ দিকে রহে, পশ্চিম-মুখা হইয়া দাঁড়াইলে সেই দক্ষিণ পার্শ্ব উত্তরদিকে ফিরিয়া যায়, অগ্রপশ্চাৎ পরিবর্ত্তিত হইলেই সেই সঙ্গে পার্শ্বও পরিবর্ত্তিত হয়। এ তত্ত্বটি কালের সম্বন্ধে এইজন্য খাটে না, যেহেতু কালের শুদ্ধ কেবল অগ্র পশ্চাৎ আছে—পার্শ্ব নাই। তেমনি আবার আত্মার একত্ব—যাহা একটি মাত্র বিন্দুর সহিত উপমেয়—তাহার পার্শ্বও নাই, অগ্রপশ্চাৎও নাই,—এই জন্য "কালের উজান বাহিয়া মূল-কারণে উঠিতে হইবে" এ প্রণালীটি আধ্যাত্মিক পরম কারণ সম্বন্ধে খাটে না। বলিলাম যে, আত্মার একত্ব একটি মাত্র বিন্দুর সহিত উপমেয়, কিন্তু পরম-কারণ-সম্বন্ধে তাহাও সম্পূর্ণ রূপে ঠিক নহে,—আকাশ-স্থিত একটি বিন্দুর পার্শ্বে আর একটি বিন্দু কল্পিত হইতে পারে—কাল-স্থিত একটি মুহূর্ত্তের পুরোভাগে আর একটি মুহূর্ত্ত কল্পিত হইতে পারে, কিন্তু পরম-কারণের একত্ব আকাশের সমস্ত বিন্দুকে এক মহাকাশের মধ্যে কবলিত করিয়া রাখিয়াছে ও কালের সমস্ত মুহূর্ত্তকে এক মহাকালের মধ্যে কবলিত করিয়া রাখিয়াছে—তাহার পার্শ্বে বা সম্মুখে দ্বিতীয়ের স্থান নাই; এই জন্য আকাশের সমস্ত বিন্দু মিলিয়া যদি একটি মাত্র বিন্দুতে সম্ভুক্ত হইয়া যায়, তবে সেইরূপ-একটি বিন্দুই পারমার্থিক অদ্বৈত ভাবের সহিত উপমেয়। আকাশের পার্শ্ব-ভেদ এবং অগ্রপশ্চাৎ-ভেদ উভয়ই আছে; কালের পার্শ্ব-ভেদ নাই কিন্তু অগ্র পশ্চাৎ ভেদ আছে; সর্ব্বময় এবং সর্ব্বাতীত পরম একত্বের পার্শ্বভেদও নাই, অগ্র পশ্চাৎ ভেদও নাই। যেমন পার্শ্ব-ঘটিত কোন তত্ত্ব কাল-রাজ্যে স্থান পাইতে পারে না, সেইরূপ অগ্র পশ্চাৎ ঘটিত কোন তত্ত্ব পরম অদ্বৈত রাজ্যে স্থান পাইতে পারে না।

আত্মার অদ্বৈত-প্রদেশ আমাদের দেশীয় দর্শন-শাস্ত্রে নিরুপাধিক শব্দে অভিহিত হইয়াছে। কাণ্ট প্রভৃতি ইউরোপীয় দার্শনিকেরা সেই প্রদেশকে Transenscendent এই শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মূল-তত্ত্ব-সকলের দৈশিক এবং কালিক প্রয়োগ (অর্থাৎ যেরূপ প্রয়োগ দেশ-কালের সম্বন্ধেই খাটে সেইরূপ প্রয়োগ) আত্মার নিরুপাধিক প্রদেশে সংলগ্ন হয় না বলিয়া অনেকে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, উক্ত নিরুপাধিক প্রদেশ মনুষ্য-জ্ঞানের একেবারেই অধিকার-বহির্ভূত। কাল-রাজ্যে পার্শ্ব-ঘটিত কোন তত্ত্বেরই প্রয়োগ সম্ভবে না—ইহা দেখিয়া আমরা অনায়াসে বলিতে পারিতাম যে, কাল-রাজ্য আমাদের জ্ঞানের অধিকার-বহির্ভূত, কিন্তু তাহা তো আমরা বলি না। তাহা যদি হইল তবে—অগ্র পশ্চাৎ ঘটিত কোন তত্ত্ব আত্মার নিরুপাধিক প্রদেশে খাটে

না—এইটি শুধু দেখিয়া কেমন করিয়া আমরা জানিব যে, আত্মার নিরুপাধিক প্রদেশ একেবারেই আমাদের জ্ঞানের অধিকার-বহির্ভূত।

কাণ্ট্ বলেন যে, যদি কার্য্য-কারণ-তত্ত্বকে উহার কালিক প্রয়োগ হইতে বিযুক্ত করিয়া ভাবা যায়, তবে কার্য্য-কারণ তত্ত্বের কিছুই আর থাকে না। মনে কর, উত্তাপ সংযোগে বরফ গলিয়া জল হইয়া যাইতেছে—কঠিন অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া তরল অবস্থায় উপনীত হইতেছে; যে শক্তির প্রভাবে কঠিন জল তরল হইতেছে—তাহা অবশ্য পূর্ব্ববর্ত্তী কঠিন অবস্থা এবং পরবর্ত্তী তরল অবস্থা এই দুই অবস্থার সন্ধিস্থলে বর্ত্তমান; কিন্তু যদি ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী পরবর্ত্তী উভয়কেই বাদ দিয়া শুদ্ধ সেই শক্তিটিকে আমরা ধরিতে যাই—তবে আমরা মনে করি বটে যে, এইবার মুষ্টি-মধ্যে একটা-কিছু পাইলাম,—কিন্তু হাত খুলিয়া দেখি—শূন্য! তৈল আর জল যখন কাচপাত্রে অবস্থিত হয়, তখন উভয়ের সন্ধিস্থল-বর্ত্তী রেখা-চক্রটি দিব্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু যদি একদিক্ হইতে তৈল এবং আর একদিক্ হইতে জল সরাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সে রেখা কোথায় থাকে? সোপাধিক কার্য্য-কারণ আমরা বুঝিতে পারি, কিন্তু নিরুপাধিক কারণকে কিরূপে আমরা জ্ঞানে উপলব্ধি করিব?

কাণ্টের ঐ প্রশ্নটির মীমাংসা কালিক যুক্তি-প্রণালী অনুসারে অসম্ভব, ইহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি; এমন কি, কাণ্ট্ আপনিই স্বীকার করিয়াছেন যে, নিরুপাধিক তত্ত্বের পক্ষে কালিক বা সাংসারিক যুক্তি-প্রণালী বৈধ প্রণালী নহে। কাণ্ট্ তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সোপাধিক যুক্তি-পথ অবলম্বন করিয়া নিরুপাধিক রাজ্যে যাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র—কেননা সে পথ একটি প্রকাণ্ড গোলোক ধাঁদা।

আমরা যাহা বলিতে চাই তাহা সংক্ষেপে এই যে, নিরুপাধিক কারণের ভাব—দূরে কোথাও নহে—আমাদের আত্মার স্বাধীনতাতেই অন্তর্নিহিত আছে, যদি বল "তাহার প্রমাণ কি" তবে তাহার উত্তর এই যে, সাধু ব্যক্তির অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম-কার্য্যই তাহার প্রমাণ; যে ব্যক্তি যত ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করে, সে ব্যক্তি ততই আত্মার অশরীরী নিরুপাধিক ভাব আপনার নিকট এবং অন্যের নিকট সপ্রমাণ করে। যদি বল যে, "কার্য্য-কারণময় জগতে স্বাধীনতা কিরূপে সম্ভবে—ইহা আমাকে বুঝাইয়া দেও," তবে তাহার উত্তর এই যে, ও-বিষয়টি বুঝা যেমন সহজ—বুঝানো তেমন সহজ নহে।

যাহা কিছু আকাশে বিস্তৃত ও কালে পরিবর্ত্তমান, তাহা যেমন-টি আমরা বুঝি, তেমনি-টি অন্যকে বুঝাইয়া দিতে পারি; যে ব্যক্তি পর্ব্বত দেখে নাই, তাহাকে পর্ব্বত আঁকিয়া দেখাইতে পারি। মেরু প্রদেশ—যেখানে ছয় মাস ছয় মাস করিয়া রাত্রিদিনের উলট্ পালট্ হয়, সেখানকার কোন অধিবাসী এখানকার রাত্রিদিনের পর্য্যায় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে একটি রেখা টানিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, এই রেখাটিকে যদি তোমাদের ষাণ্মাসিক দিন বলিয়া ধরা যায় তবে ইহার১৮০ ভাগের অর্দ্ধেকটা আমাদের দিন ও অর্দ্ধেকটা আমাদের রাত্রি। বিভিন্ন আকাশ-ব্যাপী বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধের আয়তন বিভিন্ন প্রকার, এজন্য সেই তিনের সেই সেই আয়তন নির্দ্দেশ করিলেই জিজ্ঞাসু ব্যক্তি সেই সেই বস্তুর ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে; অমুক পুষ্করিণী দীর্ঘে বিশ হাত, প্রস্থে দশ হাত, গভীরে ত্রিশ হাত,

এই কথাটি শুনিবা-মাত্র, পুষ্করিণীটির আকৃতি জিজ্ঞাসু ব্যক্তির বোধায়ত্ত হয়; বিভিন্ন কাল-ব্যাপী ঘটনার উৎপত্তি স্থিতি এবং পরিবর্ত্তন নির্দ্দেশ করিয়া লোককে তাহার ভাব বুঝানো যাইতে পারে;—প্রত্যূষে পদ্মের কলিকা বিকসিত হয়, সারা দিন তাহা সেই রূপ থাকে, রাত্রিতে তাহা মসড়িয়া যায়,—ইহা বলিবামাত্র জিজ্ঞাসু ব্যক্তি তাহার ভাব বুঝিতে পারে। কিন্তু আত্মার স্বাধীনতার না আছে দৈর্ঘ্য, না আছে প্রস্থ, না আছে বেধ, না আছে ভাব-পরিবর্ত্তন, কাজেই তাহা আপন-মনে বুঝিলেও অন্যকে বুঝাইবার উপায় নাই; তবে, কার্য্য-দ্বারা প্রকারান্তরে বুঝানো যাইতে পারে,—স্বাধীন কার্য্য দ্বারা আত্মার স্বাধীনতা বুঝানো যাইতে পারে, "ফলেন পরিচীয়তে"। এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, 'ফলেন পরিচীয়তে" যদি সত্য হয়, তবে তো মনুষ্য আপাদ-মস্তক পরাধীন,—যাহারা উদরের জ্বালায় অস্থির তাহাদের স্বাধীনতা কোথায়? ইহার উত্তর এই যে, মনুষ্য অনেক অংশে পরাধীন ইহা আমি অস্বীকার করি না; তেমনি, সে যে কতক অংশে স্বাধীন ইহা তুমিও অস্বীকার করিতে পার না; কেননা তুমি নিজেই কার্য্য-কালে তোমার নিজের স্বাধীন বিবেচনা-শক্তি অনুভব করিয়া থাক। আমি বলিতেছি ভারতবর্ষে হিমালয় আছে, তুমি কন্যাকুমারীতে দাঁড়াইয়া বলিতেছ "এই তো ভারতবর্ষ, কই কোথাও তো হিমালয় দেখিতেছি না"; আমি বলিতেছি "মনুষ্যে স্বাধীনতা আছে," তুমি মনুষ্যের ভৌতিক অংশ লক্ষ্য করিয়া বলিতেছ "কই এখানে তো স্বাধীনতার নাম-গন্ধও দেখিতেছি না।" তোমার জানা উচিত যে, ভারতবর্ষের উত্তর-প্রদেশেই হিমালয়,—দক্ষিণ-প্রদেশে নহে; মনুষ্যের আধ্যাত্মিক প্রদেশেই স্বাধীনতা—ভৌতিক প্রদেশে নহে; এবং সেই স্বাধীনতাকে কার্য্যে সপ্রমাণ করাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব।

মূল-কারণ আছেন এবিষয়ে কাহারো সংশয় থাকিতে পারে না; কেননা মূল-কারণ নাই অথচ শাখা কারণ আছে—ইহা শিরোনাস্তি শিরঃপীড়ার ন্যায় অসম্ভব। তবে—আরোহী প্রণালী দ্বারা যদি আমরা মূল-কারণ পর্য্যন্ত উঠিতে চেষ্টা করি—তাহার পূর্ব্বেই আমাদের জানা উচিত যে, তাহাতে আমরা কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। আরোহী প্রণালী অনুসারে নহে কিন্তু আধ্যাত্মিক প্রণালী অনুসারে আমরা মূল কারণের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি; সে প্রণালী এইরূপ;—স্বাধীন আত্মা পরমাত্মাকে চায়—যাহা সে চায় তাহা সে ক্রমশই পাইতে থাকে—পরমাত্মাকে যতই পায় ততই আপনার ধ্রুব অবলম্বন পায়। এ কথাটির তাৎপর্য্য এই যে,—স্বাধীন আত্মার অল্প কোন কিছুতেই আশা-পূর্ত্তি হইতে পারে না, স্বাধীন আত্মার উদ্দেশ্য মহান্ উদ্দেশ্য; ব্রহ্মার দিন তাহার নিকট এক মুহূর্ত্তও নয়, অনন্ত নীল নভোমণ্ডল তাহার ক্ষুদ্র একটি পিঞ্জরের আবরণও হইতে পারে না। পরিপূর্ণ মহান্ পুরুষ—স্বাধীন আত্মার একমাত্র উপজীবিকা। পৃথিবীর ধূলিতে লয় পাইবার জন্য শরীর হইয়াছে,—স্বাধীন আত্মা তাহার জন্য হয় নাই।—স্বাধীন আত্মার ধারণা-শক্তি যেমন অগাধ—সেইরূপ তাহার লক্ষ্য মহান্—তাহার গতি অনন্ত। সমস্ত জগৎ ছাড়াইয়া পরমাত্মার ক্রোড়ে গিয়া তবে সে তৃপ্তি লাভ করে, নিরালম্ব পুরুষকে অবলম্বন করিতে পারিলে তবেই সে আপ্তকাম হয়।

যাহা এতক্ষণ ধরিয়া ব্যাখ্যাত হইল সমস্তই উপনিষদের এই দুই পংক্তি শ্লোকের মধ্যে স্পষ্ট রূপে ইঙ্গিত করা হইয়াছে;

প্রথম পংক্তি ;—যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

দ্বিতীয় পংক্তি ;—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

প্রথম পংক্তির তাৎপর্য্য এই যে, আরোহী প্রণালী দ্বারা আমরা পরব্রহ্মকে কিছুতেই নাগাল পাইতে পারি না—মনের সহিত বাক্য তাঁহাকে না পাইয়া তাঁহা হইতে নিরস্ত হয়।

দ্বিতীয় পংক্তির তাৎপর্য্য এই যে, আধ্যাত্মিক প্রণালী অনুসারে যখন আমরা তাঁহার নিরুপাধিক আনন্দকে উপলব্ধি করি, তখন আর আমাদের ভয় থাকে না। আত্মার অভ্যন্তর স্থিত মুক্তির রাজ্য কার্য্য কারণ-শৃঙ্খলার অতীত—তাহাই নিরুপাধিক আনন্দের দ্বার ;—সেইখানেই আমরা আনন্দ স্বরূপের অমৃত আস্বাদন করিয়া মৃত্যুভয় হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি ;—কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ধর্ম্মসাধন দ্বারা চিত্তকে বিষয়াসক্তি হইতে নির্ম্মুক্ত করা নিতান্তই প্রয়োজন।

ধর্ম্মপ্রচারক ও মহাত্মা রামমোহন রায়।

গত কার্ত্তিক সংখ্যক ধর্ম্মপ্রচারকে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। তাহার প্রত্যুত্তরের জন্য আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের অবতারণা নয়। কিন্তু তিনি রামমোহন রায়কে যেরূপ বুঝিয়াছেন এবং তাঁহার যে সমস্ত কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা দেখিলে আপাততঃ অনেকেরই ভ্রম হইবে যে রামমোহন রায় একজন অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক ছিলেন এবং হিন্দুশাস্ত্রের সকল প্রকার মতে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। এই ভ্রমটী দূর করা আমাদের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

আমাদের প্রথম কথা এই এখনকার আলোকে রামমোহন রায়কে বুঝা যায় না। এখন যেরূপ জনসমাজ ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে কিছু এরূপ ছিল না। তখন শিক্ষার অবস্থা অতি শোচনীয়। প্রায় সাধারণেই অশিক্ষিত ছিল। কতকগুলি লোক বিষয়কার্য্যে উপযোগি হইবার জন্য সামান্যরূপ পারসীক ভাষা শিক্ষা করিত। আর অল্প সংখ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কেবল বিধি ব্যবস্থা দিবার জন্য কএকখানি নব্য স্মৃতি এবং কেহ কেহ বা নব্য ন্যায়শাস্ত্র পড়িতেন। কিন্তু অগাধ শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মধ্যে এরূপ লোক তখন বিরল ছিল। তৎকালে রামমোহন রায়ের সহিত সাধারণের যেরূপ বিচার হইয়াছিল সেই সমস্ত আলোচনা করিলে ইহার অনেকটা প্রমাণ পাওয়া যায়। এইরূপ জনসমাজ রামমোহন রায়ের যুদ্ধক্ষেত্র। তাঁহার লক্ষ্য ক্রিয়াকাণ্ড উচ্ছেদ করিয়া একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু শাস্ত্রবিচার না করিলে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হয় না। এই জন্য তিনি এই অগাধ শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার প্রধান লক্ষ্য একেশ্বরবাদ স্থাপন। এই প্রসঙ্গে তিনি তর্কের মুখে প্রতিপোষক বাক্য শাস্ত্রের মধ্যে যেখানে যাহা পাইয়াছেন তাহাই উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু সেই সমস্ত শাস্ত্রীয় বচন পাঠমাত্রেই বোধ হইবে যে হিন্দুশাস্ত্রের সকল কথাতেই তিনি বিশ্বাস করিতেন। বাস্তব তাহা নহে। যে সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ একেশ্বরপর প্রতিপক্ষের অবগতির জন্য তাহা উদ্ধৃত করিতে গিয়া তাহার সঙ্গে এমন অনেক শাস্ত্রীয় কথা বাহির করিয়াছেন যে গুলি পড়িলে আপাততই বোধ হয় তিনি জীব ব্রহ্মের একত্ব মানিতেন। প্রাচীন কল্পের পঞ্চযজ্ঞাদি সকল

করিতেন। কিন্তু বস্তুত তাহাই কি ঠিক্। এস্থলে একটী কথা বলা বিশেষ আবশ্যক। যখন তাঁহার সহিত সর্ব্বসাধারণের ঘোরতর শাস্ত্রীয় বিচার হয় তখন তিনি আপনাকে কুত্রাপি ব্যক্ত করেন নাই। যা কিছু ব্যক্ত করিয়াছেন সমস্তই শাস্ত্র। এইগুলি ধরিয়া বিচার করিলে তাঁহাকে অবশ্যই ঘোর বৈদান্তিক বোধ হইবে। কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহার আপনাকে ব্যক্ত করা আবশ্যক হইয়াছিল। তাহা আলোচনা করিলে তিনি যে কি ছিলেন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তিনি লর্ড বেণ্টিকের সময় যখন শিক্ষা-সমিতিকে পত্র লিখেন তাহাতে স্পষ্টই বলিয়াছেন বেদান্ত দর্শন এদেশের যথেষ্ট অপকার করিয়াছে। তাঁহার অভিপ্রায় এই যাহাতে সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য আনে সে ধর্ম্ম জনসমাজের উপযোগি নহে কিন্তু যে ধর্ম্ম লোকের কর্ম্মঠ ভাব বর্দ্ধিত করিবে তাহাই সামাজিক ধর্ম্ম হওয়া আবশ্যক। এখন দেখ বেদান্ত ধর্ম্ম পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে বলিতেছেন কেহই কাহার নয়, সকলই মায়া, এই যে জগৎ দেখিতেছ ইহারও বাস্তব সত্তা নাই। বেদান্তের এই সমস্ত ভাব লোকের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিলে সামান্য উদরান্ন সংগ্রহের নিমিত্তও কি কাহারও প্রবৃত্তি হয়? এখন দেখ রামমোহন রায়ের এই পত্রখানি আলোচনা করিলে কখনই বোধ হয় না যে তিনি বৈদান্তিক ছিলেন। তবে তুমি বলিতে পার যদি তিনি তাহাই না হইলেন তবে বিচার-মুখে পুনঃপুনঃ বেদান্তবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন কেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি এখনকার আলোকে রামমোহন রায়কে বিচার করিলে চলিবে না। তিনি যে সময়ে জন্মিয়া ছিলেন তখন যদিও শাস্ত্রের গভীর আলোচনা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল কিন্তু শাস্ত্রের উপর লোকের শ্রদ্ধা কিছুমাত্র লুপ্ত হয় নাই। তখন গৃহে গৃহে পুষ্প চন্দনে শাস্ত্র পূজিত হইত। আর এতদ্দেশে বেদান্তের ন্যায় একেশ্বরপ্রতিপাদক দ্বিতীয় গ্রন্থও নাই। সেই জন্য রামমোহন রায় লোকের সহজে বিশ্বাস হইবার জন্য তাহাই অবলম্বন করিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। ইহার সঙ্গে অবশ্য এমন সকল বৈদান্তিক মত উদ্ধৃত করিয়া ছিলেন যেগুলি বাদ দিয়া বলা তাঁহার পক্ষে কালোচিত নয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তজ্জন্য কিছুমাত্র ইতস্তত করেন নাই। তাঁহার প্রধান লক্ষ্য যেন তেন প্রকারেণ কর্ম্মকাণ্ডের উচ্ছেদ ও একেশ্বরবাদ প্রচার। তিনি তাহাই করিয়াছিলেন। বাস্তব তিনি বৈদান্তিক নন এবং শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মীও নন।

এস্থলে আর একটু কথা বলি। কি ধর্ম্ম-সংস্কারক কি সমাজসংস্কারক সকলেরই সংস্কার কার্য্যে দেশকালের অপেক্ষা রাখা আবশ্যক। নচেৎ তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। এখন বুঝিয়া দেখ রামমোহন রায়ের সময় জনসমাজের অবস্থা কিরূপ। কেবল অজ্ঞানতার অন্ধকার ও শাস্ত্রে কেবল একটা অন্ধ ভক্তি। সেই অবস্থায় রামমোহন রায় যদি শাস্ত্রের কোন কোন অংশ বাদসাদ দিয়া নিজের হৃদয়ানুগত ও শাস্ত্রের মর্ম্মানুগত কথা তর্কমুখে আনিতেন তাহা হইলে লোকে তাহা গ্রহণ করিতে পারিত না। এই জন্য তিনি সে দিকে যান নাই। তিনি প্রমাণস্থলে এমন একটি শ্লোক তুলিয়াছেন হয়ত তাহার তৃতীয়াংশ জ্ঞানাস্ত্রে টেঁকে না, আর এক দেশ টেঁকে। কিন্তু স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য তাহাকে সমস্তটাই উদ্ধৃত করিতে হইল। জনসমাজের তাৎকালিক অবস্থা ধরিয়া বুঝিলে ইহাতে কিছুই দোষ দুষ্ট হইবে না। [illegible]

কি তাহা না হইলে চলিবে না। মনে কর হিন্দুস্থানে আমার জন্ম আমি জাতিতে হিন্দু। তুমি যদি বাইবল দিয়া আমার নিকট সত্যটি বুঝাইতে চাও সত্যপ্রিয়তা থাকিলেও তদ্দ্বারা আমার উপকার হইবে না। কারণ বিশ্বজনীন সত্য আমার নিকট যে পরিচ্ছদে আইল তাহা আমার পুরুষ-পরম্পরায় অপরিচিত। উহাতে এমন সকল কথা ও এমন সকল ভাব আছে তাহা অবশ্য সত্যের অগ্নিপরীক্ষায় টেঁকিয়াছে কিন্তু তাহার পরিচ্ছদ আমার অপরিচিত বলিয়া তাহা আমার প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারিল না। সুতরাং তদ্দ্বারা আমার কোন কাজই হইল না। কিন্তু যাই সেই সত্য আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম গ্রন্থের মধ্য দিয়া আইল অমনি তাহা আমার প্রাণকে স্পর্শ করিল। কারণ জাতীয় কথা ও জাতীয় ভাব আমাদের পুরুষপরম্পরায় পরিচিত। ফল কথা সত্যটি কেবল শিক্ষার জন্য নয় ইহা দিনরাত ব্যবহারে আনিবার জন্য। সুতরাং যাহা আমার প্রাণকে স্পর্শ না করে আমি কোন্ বলে তাহাকে জীবনের সহিত মিশ্রিত করিব। এই জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের এত আদর। এই সমস্ত ঋষিবাক্য আমাদের সত্য সাধনের অনুকূল। চন্দ্রশেখর বাবু অন্যান্য সমাজের তুলনা দিয়া বলিয়াছেন কালে আদি ব্রাহ্মসমাজেও বেদবাক্য ও ঋষিবাক্যে আদর থাকিবে না। কিন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি হিন্দুর কণ্ঠে হিন্দুর ভাবে পুষ্ট হইয়া যত কাল জীবিত থাকিব, পরম পুরুষার্থ মুক্তি যদি আমাদের প্রার্থনীয় হয় তবে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থে নিবদ্ধ বেদবাক্য ও ঋষিবাক্যে কদাচ আমাদের অনাদর হইবে না। তবে চন্দ্রশেখর বাবু যদি চান যে, পূর্ব্বকালের সমস্ত যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান—সমগ্র কর্ম্মকাণ্ড, অথবা ষড় দর্শনের পরস্পর-বিরোধী তুমুল বাদানুবাদ—সমগ্র জ্ঞান-কাণ্ড, আবার আসিয়া ভারতকে অধিকার করুক,—শঙ্কর ভাষ্য, রামানুজের ভাষ্য, ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়দিগের ভাষ্য, আবার কোমর বাঁধিয়া রণস্থলে অবতীর্ণ হউক, এবং তাহার সহিত আধুনিক ভাষ্যকারেরাও সংগ্রামে মাতিয়া উঠুন্—তাহা হইলে তিনি হিন্দু-ধর্ম্মে নূতন জীবন প্রদান করিতে গিয়া করিবেন যাহা তাহা আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, এই বাক্যটি সপ্রমাণ করিবেন

"শ্রুতির্বিভিন্না স্মৃতয়োবিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।

ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-নীতি।

প্রথম অধ্যায়।

রিপু সংযম।

চতুর্থ প্রস্তাব।

মোহ।

আমাদিগের আত্মা এই অস্থিচর্ম্মময় শরীরে বদ্ধ থাকা নিমিত্ত যে সকল পার্থিব বস্তুতে আমাদিগের অনুরাগের উৎপত্তি হয় সেই অনুরাগ নিয়মিত করিয়া, ধর্ম্মানুসারে তাহার ব্যবহার করিয়া আমরা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিব, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। কিন্তু ঈশ্বরের এই অভিপ্রায় উল্লঙ্ঘন করিয়া আমরা যখন কোন পার্থিব বস্তু বা বিষয়ের প্রতি অযথা ও অপরিমিত অনুরাগ প্রদর্শন করি, সেই অনুরাগের আতিশয্যে অন্ধ হইয়া পড়ি এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানশূন্য হই, তখন আমরা সেই ঈশ্বর-প্রদত্ত অনুরাগকে মোহে পরিণত করিয়া ফেলি। পার্থিব সুখের প্রতি অনুরাগ দূষণীয় নহে, কিন্তু সেই অনুরাগ অপরিমিত হইয়া পড়িলে তাহা দ্বারা অভিভূত

হইয়া যখন আমরা ধর্ম্মের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করি তখন আমরা সুখ-ভোগ-লালসা-জনিত মোহ-পরবশ হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হই। ধন সম্পদের প্রতি অনুরাগ দূষণীয় নহে। কিন্তু সেই অনুরাগ অত্যন্ত বর্দ্ধিতাকার ধারণ করিলে তাহা দ্বারা অন্যরূপে পরিচালিত হইয়া আমরা যখন অধর্ম্মাচরণ করি তখন আমরা ধন-সম্পদ-লালসা-জনিত মোহপরবশ হইয়া শোচনীয় দুর্গতিগ্রস্ত হই। স্ত্রী পুত্র পরিবার প্রভৃতির প্রতি অনুরাগ দূষণীয় নহে; কিন্তু যখন আমরা সেই অনুরাগে আমাদিগকে এতদূর আবদ্ধ হইতে দিই যে তাহার জন্য আমরা আমাদিগের আত্মার মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিশূন্য হইয়া পড়ি তখন আমরা সাংসারিক সম্বন্ধজনিত মোহপরবশ হইয়া আধ্যাত্মিক অধোগতি প্রাপ্ত হই। পার্থিব জীবনের প্রতি অনুরাগ দূষণীয় নহে, কিন্তু সেই অনুরাগে যখন আমরা এতদূর আবদ্ধ হই যে তজ্জন্য অন্যায় ও ধর্ম্ম-বিরোধী কার্য্যে প্রবৃত্ত হই তখন পার্থিব জীবনের প্রতি অনুরাগ-জনিত মোহাবিষ্ট হইয়া আমরা আমাদিগের পারমার্থিক ইষ্ট নাশ করিয়া থাকি। মোহ পার্থিব সুখ, পার্থিব সম্বন্ধ, পার্থিব ধনসম্পদ, ও এই পার্থিব জীবনের প্রতি ঈশ্বর-প্রদত্ত অনুরাগের বিকৃত আকার, উহার অপব্যবহার ও ব্যভিচার। অতএব এই মোহরিপু সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

পার্থিব সুখ, ধন সম্পদ, সম্বন্ধ ও জীবনের প্রতি ঈশ্বর-প্রদত্ত ধর্ম্ম-সিদ্ধ যে অনুরাগ তাহা আমাদিগের মঙ্গলের কারণ, কিন্তু ইহার বিকৃত আকার যে মোহরিপু তাহা আমাদিগের নানা অমঙ্গল ও অনর্থের মূল। মোহের অধীন হইলে মানুষ সকল প্রকার ভয়ানক পাপে প্রবৃত্ত হইতে পারে। যে ইন্দ্রিয় সুখ-বাসনা-জনিত মোহের অধীন হয় সে পরদার, ব্যভিচার প্রভৃতি ঘোর পাপে পতিত হয়; যে ধনসম্পদসম্ভোগেচ্ছা-জনিত মোহের বশীভূত হয়, সে প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য বৃত্তি প্রভৃতি অধর্ম্মাচরণ করে, যে সাংসারিক সম্বন্ধের প্রতি অনুরাগজনিত মোহে অভিভূত হয় সে ঈশ্বর ও পরকাল বিস্মৃতি রূপ মহাপাপে নিমগ্ন হয়; যে পার্থিব জীবনের প্রতি অনুরাগজনিত মোহে আক্রান্ত হয় সে আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিতে সক্ষম হয় না। মোহ-পরবশ হইলে মানুষ যে সকল পাপে পতিত হয় তাহাতে যে কেবল তাহার আধ্যাত্মিক অবনতি ও দুর্গতি সাধিত হয় তাহা নহে, আধ্যাত্মিক অবনতি ও দুর্গতির অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ যে শারীরিক ও মানসিক অবনতি ও দুর্গতি ঘটে সে তাহারও ভাগী হয়। সংক্ষেপতঃ, মোহরিপুর অধীন হইলে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন ঘোরতর অমঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান উপদেশ এই যে পার্থিব সুখ, পার্থিব ধনসম্পদ, পার্থিব সম্বন্ধ ও পার্থিব জীবনের প্রতি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য অনুসারে যেরূপ ধর্ম্মসিদ্ধ অনুরাগ প্রদর্শন করা উচিত, যেরূপ নিয়ন্ত্রিত প্রীতি রক্ষা করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ অনুরাগ সেইরূপ প্রীতি রক্ষা করিয়া চলিবেক, কখন সেই অনুরাগকে অপরিমিত আকার ধারণ করিতে দিবেক না, কখন তাহাকে অন্যরূপে চালিত করিবেক না, কখন তাহার অপব্যবহার করিয়া তাহাকে মোহে পরিণত করিয়া ফেলিবেক না; যদি তুমি তাহা কর তাহা হইতে তোমাকে ধর্ম্মচ্যুত এবং পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যভ্রষ্ট হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে দুঃসহ সন্তাপ ভোগ করিতে হইবেক। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন;

"বহু নিন্দেন্দ্রিয়ং মোহাৎ প্রতিপদ্যতে।
স দীর্ঘতমসা [illegible] যুজ্যতে॥"

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি মোহ হেতু হিত বাক্য গ্রহণ না করে, সে, দীর্ঘসূত্রী হইয়া পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং পশ্চাৎ সন্তাপে পতিত হয়।"

ব্রাহ্ম যিনি তিনি সকল পার্থিব বস্তু ও বিষয়ের প্রতি ঈশ্বর-প্রদত্ত অনুরাগ সযত্নে রক্ষা করিয়া চলেন, তিনি কখন তাহা মোহে পরিণত করিয়া ফেলেন না। তিনি পার্থিব সুখ ও ধন সম্পদের অনুরাগী হয়েন, কিন্তু তাহাদিগের জন্য তিনি কখন ধর্ম্মের পথ ত্যাগ করেন না; তিনি আত্মীয় বন্ধু পরিজনের প্রতি অনুরক্ত হয়েন, কিন্তু সেই অনুরাগে অন্ধ হইয়া কোন অন্যায় বা অধর্ম্মাচরণ করেন না; তিনি পার্থিব জীবনের প্রতি অনুরাগ রক্ষা করেন, কিন্তু সে অনুরাগে অনুরাগী হইয়া আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিতে ভুলিয়া যান না। তিনি পৃথিবীতে থাকেন, কিন্তু পৃথিবীর কিছুতেই তিনি মোহ-মুগ্ধ হয়েন না; পৃথিবীর সকল বিষয়ের যেরূপ নশ্বর ও আপাত-মনোরম প্রকৃতি তাহা তিনি ঠিক্ বুঝিতে পারেন, অতএব তাহাদিগের বাহ্য চাক্চিক্য ও শোভায় মোহান্ধ হইয়া তিনি কখন জ্ঞান হারান না। যতটুকু পৃথিবীর হওয়া আবশ্যক তিনি ততটুকু পৃথিবীর হইয়া আধ্যাত্মিক জগতের লোক হয়েন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্ম বলিয়া জগতের নিকট পরিচয় দিয়া যিনি এইরূপে মোহরিপুকে বশ করিতে না পারেন, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্ম নামের অবমাননা করেন, তিনি কখন প্রকৃত রূপে ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত হইতে পারেন না।

উদ্ধৃত।

সত্য।

সরল রেখা আঁকা সহজ নহে, সত্য বলাও সহজ ব্যাপার নহে। সত্য বলিতে গুরুতর সংযমের আবশ্যক।

দৃঢ় নির্ভর দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত তোমাকেই সত্যের অনুসরণ করিতে হইবে, সত্য তোমার অনুসরণ করিবে না। আমরা অনেক সময়ে মনে করিয়া থাকি, সত্য যে সত্য হইল সে কেবল আমি প্রচার করিলাম বলিয়া। সত্যের প্রতি আমরা অনেক সময়ে মুরুব্বিয়ানা করিয়া থাকি—আমরা তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলি, তোমার কিছু ভয় নাই, আমি তোমাকে খাড়া করিয়া তুলিব। সত্যের যেন বাস্তবিক কোন দাওয়া নাই তাই আমার অনুগ্রহের উপরে সে দাবী করিতে আসিয়াছে, এবং আমি তাহাকে আমার মহৎ আশ্রয় দিয়া যেন কৃতার্থ করিলাম এবং হৃদয়ের মধ্যে মহত্ত্বাভিমান অনুভব করিলাম। এইরূপে সত্যের চেয়ে বড় হইতে গিয়া আমরা সত্যকে দূর করিয়া দিই, মিথ্যাকে আহ্বান করিয়া আনি। আমরা ভুলিয়া যাই যে, সত্য সমস্ত জগতের আশ্রয়স্থল, এ জন্য সত্য কোন ব্যক্তিবিশেষের অনুগ্রহ বা তোষামোদের বশ নহে। আমার সুবিধামত আমি যদি সত্যকে বাঁকাইতে পারিতাম ত সত্য কি সহজ হইতে পারিত! কিন্তু আমি সত্যের কাছে বাঁকিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে পারি, সত্য তাহার অটল সরল সুন্দর মহিমায় দাঁড়াইয়া থাকে—সত্য আমার মুখ তাকাইলে চলে না, কারণ সকলেই তাহার মুখ তাকাইয়া আছে।

এই জন্যই সত্যের এত বল! সত্য আমার প্রতি নির্ভর করে না বলিয়াই আমি সত্যের প্রতি নির্ভর করিতে পারি। সত্যকে যদি আবশ্যকমত বাঁকান যাইতে পারিত তবে আমরা সিধা থাকিতাম কি করিয়া! সত্য যদি কথায় কথায় স্থান পরিবর্তন করিত তবে আমরা দাঁড়াইতাম কিসের উপরে! সত্য যদি না থাকে তবে আমরা আছি কে বলিল!

আমরা যখন মিথ্যাপথে চলি তখন আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ি এই জন্য। তখন আমরা আত্মহত্যা করি। তখন আমরা একেবারে আমাদের মূলে আঘাত করি। আমরা যাহার উপরে দাঁড়াইয়া আছি তাহাকেই সন্দেহ করিয়া বসি। যতখানি আমাদের মিথ্যা অভ্যাস হয় ততখানি আমরা লুপ্ত হইয়া যাই। সত্যের প্রভাবে আমরা বাড়িতে থাকি, মিথ্যার বশে আমরা কমিয়া আসি। কারণ সত্যরাজ্যের সীমানা কোথাও নাই। দেশ, জাতি, সম্প্রদায়, আত্মপর প্রভৃতি যে সকল ব্যবধানকে আমরা পাষাণ প্রাচীর মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট ছিলাম, সহসা সত্যের বিদ্যুতালোকে দেখি তাহারা কোথাও নাই। তাহারা আমার কল্পনায়। তাহারা অসীম সত্যরাজ্যের কাল্পনিক সীমানা, বালুকার উপরে মানবের অঙ্গুলির চিহ্ন। তাহারা কেবল বুঝাইয়া দিতেছে আমার অধিকার সংক্ষেপ করিতেছে। মিথ্যা আমাদিগকে

এই বৃহৎ জগতের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছে। সত্যের আশ্রয়ে আমরা বিশ্বজগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ি, মিথ্যা তাহার কুঠারাঘাতে প্রতিদিন আমাদিগকে ছেদন করিতে থাকে। মিথ্যা আমাদিগকে একেবারে নিঃস্ব করিয়া দেয়, অল্পে অল্পে আমাদের সব কাড়িয়া লয়—আমাদের আশ্রয়ের স্থান, আমাদের জীবনের খাদ্য, আমাদের লজ্জা নিবারণের বস্ত্র। এমন ঘোর দারিদ্র্য জন্মাইয়া দেয় যে, পৃথিবী-সূর্য্যকে দরিদ্র দেখি, অন্নপূর্ণাকে অন্নহীনা বলিয়া বোধ হয়।

ইহার প্রমাণ কি আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই না? আমরা মিথ্যাচারীর দল আমরা প্রতিদিন প্রতি ক্ষুদ্র কাজে কি মনে করি না যে, ন্যূনাধিক প্রবঞ্চনা ব্যতীত পৃথিবীর কাজ চলিতে পারে না, খাটি সত্য ব্যবহার কেতাবে পড়িতে যত ভাল শুনায় কাজের বেলায় তত ভাল বোধ হয় না। অর্থাৎ যে নিয়মের উপর সমস্ত জগৎ নির্ভর করিয়া আছে, সে নিয়মের উপর আমি নির্ভর করিতে পারি না; মনে হয় আমার ভার সে সামলাইতে পারিবে না—চন্দ্র সূর্য্য তাহাতে গাঁথা রহিয়াছে কিন্তু আমাকে সে ধারণ করিতে পারিবে না, আমাকে সে বিনাশের পথে নিক্ষেপ করিবে। প্রতিদিন মিথ্যার জাল বয়ন করিয়া আমরা সত্যকে এমনই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছি যে, আমাদের মনে ভুল, মনে আশ্চর্য্য জন্মায়—মনে হয় জগতের গোড়ায় গলদ। এই জন্যই আমাদের ধারণা হয় যে, কেবল কৌশল করিয়াই টিকিতে হইবে। কৌশলই একমাত্র উপায়। ভাল মানুষ মনে করে আমি কৌশল করিয়া থাকিব, গুঁড়িতে সমূলে হইয়া থাকা কোন কাজের নহে; গুঁড়ি বলে আমার শিকড় নাই, কোন প্রকার কৌশল করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। দুই পা বলে মাটিকে নিতান্ত মাটি জ্ঞান করিয়া আমি আপনার উপরেই দাঁড়াইব; সে কম কৌশলের কথা নয়, কিন্তু অবশেষে যে আশ্রয় ছাড়িয়া তাহারা লম্ফ দেয়, সেই আশ্রয়ের উপরে পড়িয়াই তাহাদের অস্থি চূর্ণ হইয়া যায়।

মনুষ্যসমাজের এই অতি বৃহৎ জটিল মিথ্যা ব্যবসায়ের মধ্যে পড়িয়া সত্যকে অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে কি কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে! চক্ষের উপরে চতুর্দ্দিক হইতে ধূলাবৃষ্টি হইতেছে—আমরা সত্যকে দেখিব কি করিয়া? আমরা জন্মাবধিই গুটিপোকার মত আমাদিগকে গুটির মধ্যে আচ্ছন্ন। অতি দীর্ঘ-পুরাতন দৃঢ় মিথ্যাসূত্রে সেই গুটি রচিত। সত্যের অপেক্ষা প্রথাকে আমরা অধিক সত্য বলিয়া জানি। প্রথা আমাদের চক্ষু আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছে, আমাদের হাতে পায়ে শৃঙ্খল বাঁধিয়াছে, বলপূর্ব্বক আমাদিগকে চিন্তা করিতে নিষেধ করিতেছে, পাছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া আমরা সত্য দেখিতে পাই—বাল্যকাল হইতে আমাদিগকে মিথ্যামান, মিথ্যা মর্য্যাদার কাছে পদানত করিতেছে; মিথ্যা কথন, মিথ্যাচরণ আমাদের কর্ত্তব্যের মত করিয়া শিক্ষা দিতেছে! আমরা বুলি এক, করি এক; জানি এক, মানি এক;—স্নায়ুর বিকার ঘটিলে যেমন আমরা ইচ্ছা করি এক রূপ অথচ আমাদের অঙ্গ অন্যরূপে চালিত হয়—তেমনি বিকৃত শিক্ষায় আমরা সত্যের আদেশ পালন করিতে চাই, অথচ মিথ্যার বশে পড়িয়া অন্যরূপে চালিত হই। প্রথা বলে অন্যায়াচরণ কর পাপাচরণ কর তাহাতে হানি নাই, কিন্তু আমার বিরুদ্ধাচরণ করিও না, তাহা হইলে তোমার মানহানি হইবে, তোমার মর্য্যাদা নষ্ট হইবে—অতি পুরাতন মান, অতি প্রাচীন মর্য্যাদা, সত্য তাহার কাছে কিছুই নয়। এই সকল সহ্য করিতে না পারিয়া মাঝে মাঝে মহৎলোকেরা আসিয়া মান মর্য্যাদা কুলশীল চিরন্তন প্রথা, সমাজের সহস্র মিথ্যাপাশ সবলে ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসেন, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে শত শত ক্রীতদাস ... করে। কেবল প্রথার প্রিয় সন্তান গুরুজন, শৃঙ্খলের আলিঙ্গনে পড়িয়া জড় শৃঙ্খলের উপরে দাঁড়াইয়া প্রেম জানাইয়া বিমল অনন্ত মুক্ত আকাশকে যাহারা বিভীষিকার স্বরূপে দেখে, তাহারাই ভগ্ন কারাপ্রাচীরের পার্শ্বে বসিয়া ছিন্ন শৃঙ্খল বক্ষে লইয়া মুক্তিদাতাকে গালি দেয় ও ভগ্নাবশেষের স্তূপের মধ্যে পুনরায় আপনার অন্ধকার বাসগহ্বর খনন করিতে থাকে।

এই সমাজ-ধাঁদার মধ্যে পড়িয়া আমি সত্যের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিতে চাই। যেমন নানা রূপে বিচলিত হইলেও চুম্বক-শলাকা সবল ভাবে উত্তরের দিকে মুখ রাখে সত্যের সহিত আত্মার যে একটি সরল চুম্বকাকর্ষণ যোগ আছে, সেইটি চিরদিন অক্ষুণ্ণভাবে যেন রক্ষা করিতে পারি! ভয় হয় পাছে সংসারের সহস্র মিথ্যার অবিশ্রাম সংস্পর্শে আত্মার সেই সহজ চুম্বকশক্তি নষ্ট হইয়া যায়! যেন এই দৃঢ় পণ থাকে যে, সত্যানুরাগের প্রভাবে চারিদিকের জটিলতা সকল ছিন্ন করিয়া সমাজকে সরল করিতে হইবে। মানুষের চলিবার পথ নিষ্কণ্টক করিতে হইবে। সংশয় ভয় ভাবনা অবিশ্বাস দূর করিয়া দিয়া দুর্ব্বলকে বলিষ্ঠ করিতে হইবে।

"আমাদের জাতি যেমন সত্যকে অবহেলা করে এমন আর কোন জাতি করে কি না জানি না! আমরা মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া অনুভব করি না। মিথ্যা

তাহা আর শুনিতে পাই না, তাহা নিঃশব্দতারই আকার ধারণ করে। এই কারণে পুরাতন সত্য সকলে শুনিতে পায় না, এই কারণে পুরাতন সত্য সকলে বলিতে পারে না। মহাপুরুষেরাই পুরাতন সত্য বলিতে পারেন—বুদ্ধ এবং চৈতন্যেরাই পুরাতন সত্য বলিতে পারেন। সত্য তাঁহাদের কাছে চিরদিন নূতন থাকে কারণ সত্য তাঁহাদের যথার্থ প্রিয়ধন। আমরা যাহাকে ভাল বাসি সে কি আমাদের কাছে কখনও পুরাতন হয়! তাহাকে কি প্রতি নিমেষেই নূতন করিয়া অনুভব করি না? প্রথম সাক্ষাতেও নেত্র যেমন অসীম তৃপ্তি অথবা অপরিতৃপ্তির সহিত তাহার মুখের প্রতি আবদ্ধ থাকিতে চায়, দশ বৎসর সহবাসের পরেও কি নেত্র সেই প্রথম আগ্রহের সহিত তাহাকেই চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে থাকে না? সত্য মহাপুরুষদের পক্ষে সেইরূপ চিরনূতন প্রিয়বস্তু! আমার কি তেমন সত্যপ্রেম আছে যে, আজ এই পুরাতন যুগে, মানব-সভ্যতা প্রাদুর্ভাবের কত সহস্র বৎসর পরে পুরাতন সত্যকে নূতন করিয়া মানব-হৃদয়ে জাগ্রত করিতে পারিব!

যাহারা সহজেই সত্য বলিতে পারে তাহাদের সে কি অসাধারণ ক্ষমতা! যাহারা হিসাব করিয়া পরম পারিপাট্যের সহিত সত্য রচনা করিতে থাকে, সত্য তাহাদের মুখে বাধিয়া যায়, তাহারা ভরসা করিয়া পরিপূর্ণ সত্য বলিতে পারে না। রামপ্রসাদ ঈশ্বরের আবদারভক্ত হইয়া যেরূপ আত্মীয় অন্তরঙ্গের ন্যায় ঈশ্বরের সহিত মান অভিমান করিয়াছেন, আর কেহ কি দুঃসাহসিকতার ভর করিয়া সেরূপ পারে! অন্য কেহ হইলে এমন এক জায়গায় এমন একটা শব্দ প্রয়োগ, এমন একটা ভাবের গলদ্ করিত, যে তৎক্ষণাৎ সে ধরা পড়িত। অনুভব করিয়া বলিলে সত্য কেমন সহজে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইয়া ধরা দেয় তাহার একটা দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়িতেছে। প্রাচীন ঋষি সরল হৃদয়ে যে প্রার্থনা উচ্চারণ করিয়াছিলেন "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়, আবিরাবীর্ম্মএধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।" অপরূপ নিয়মে হীরক যেমন সহজেই হীরক হইয়া উঠে, এই প্রার্থনা তেমনি সহজেই ঋষিহৃদয়ে উজ্জ্বল আকার ধারণ করিয়া উদিত হইয়াছিল; আজ যদি কেহ হিসাব করিয়া এই প্রার্থনার ভাব-সংশোধন করিতে বসেন, তাহা হইলে আমাদের হৃদয়ে আঘাত লাগে, হয়ত তাহাতে এই প্রার্থনা-নিহিত সত্যের সহজ উজ্জ্বলতা ম্লান হইয়া যায়। "রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর" প্রার্থনার এই অংশটুকু পরিবর্ত্তন করিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন "দয়াময়, তোমার যে অপার করুণা, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।" এইরূপে ঋষিদিগের এই প্রাচীন প্রার্থনার কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া তাহাতে একটি নূতন ভাব জোড়া দিয়া লাগান হইয়াছে—কিন্তু এ কি বাস্তবিক সংশোধন হইল? সরল-হৃদয় ঋষি কি মিথ্যা বলিয়াছেন? এই প্রার্থনায় ঈশ্বরকে যে রুদ্র বলা হইয়াছে তাহা স্বাভাবিক ঋষির মুখ দিয়া অতি সহজে এই সম্বোধন বাহির হইয়াছে। অসত্য, অন্ধকার, মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইয়াই ঋষি ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার মনের এই বিশ্বাস ব্যক্ত হইতেছে যে, সত্য আছে, জ্যোতি আছে, অমৃত আছে। এই বিশ্বাসে ভর করিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন "রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ"—এমন আশ্বাসবাণী আর কি হইতে পারে, এমন মাভৈঃ ধ্বনি শুনিতেছি আমাদের আর ভয় কি! যে ঋষি অসত্যের মধ্যে সত্য, অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতি, মৃত্যুর মধ্যে অমৃত দেখিয়াছেন, তিনিই রুদ্রের দক্ষিণ মুখ দেখিয়াছেন, এবং সেই প্রসন্নতা প্রচার করিতেছেন, তিনি বলিতেছেন ভয়ের মধ্যে অভয়, শাসনের মধ্যে প্রেম বিরাজ করিতেছে। এখানে "দয়াময়" বলিলে এত কথা ব্যক্ত হয় না, সে কেবল একটা কথার কথা হয় মাত্র। তাহাতে রুদ্র ভাবের মধ্যেও প্রসন্নতা, আপাতপ্রতীয়মান অমঙ্গল অংশের মধ্যেও সরল হৃদয়ে মঙ্গল স্বরূপের প্রতি দৃঢ় নির্ভর এমন সুন্দররূপে ব্যক্ত হয় না। মহর্ষি এতশত ভাবিয়া বলেন নাই, ঈশ্বরের প্রসন্ন দক্ষিণমুখ দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়াই তিনি নির্ভয়ে ঈশ্বরকে রুদ্র বলিতে পারিয়াছেন, তাঁহার মুখ দিয়া সত্য অবাধে বাহির হইয়াছে আর আমরা বিস্তর তর্ক করিয়া যুক্তি করিয়া তাহার একটি কথা পরিবর্ত্তন করিলাম, তাহার সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতা নষ্ট হইয়া গেল।

ইহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে, সত্য বলা সহজ নয়। ইস্কুলের পড়ার মত মুখস্থ করিয়া সত্য বলা যায় না! সত্যের প্রতি ভালবাসা আগে সাধনা করিতে হইবে, ভালবাসার দ্বারা সত্যকে বশ করিতে হইবে, সংসারের সহস্র কুটিলতার মধ্যে হৃদয়কে সরল রাখিতে হইবে তার পরে সত্য বলা সহজ হইবে। কেবল যদি লোভ ক্রোধ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি সকল আমাদের সত্যপথের বাধা হইত, তাহা হইলেও আমাদের তত ভাবনার কারণ ছিল না। কিন্তু আমাদের অনেক সুপ্রবৃত্তিও আমাদিগকে সত্যপথ হইতে বিচলিত করিবার জন্য আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে থাকে। আমাদের আত্মানুরাগ, দেশানুরাগ, লোকানু-

রাগ অনেক সময়ে আমাদিগকে সত্যভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে থাকে, এই জন্যই সত্যানুরাগকে এই সকল অনুরাগের উপরে শিরোধার্য্য করা আবশ্যক।

আমার আর সকল কথা লোকের বিরক্তিজনক পুরাতন ঠেকিতে পারে কিন্তু আমার একটি কথা পুরাতন হইলেও বোধ করি অনেকের কর্ণে অত্যন্ত নূতন ঠেকিতেছে। আমি বলিতেছি, সত্য কথা বল, সত্যাচরণ কর, কারণ দেশের উন্নতি তাহাতেই হইবে। এ কথা সচরাচর শুনা যায় না। কথাটা এত অল্প, এত শীঘ্র ফুরাইয়া যায়, এবং এমন প্রাচীন ফেযানের যে, কাহারো বলিয়া সুখ হয় না, শুনিতে প্রবৃত্তি হয় না, ইহাতে সুগভীর চিন্তাশীলতা বা গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায় না, ইহাতে এমন উদ্দীপনা উত্তেজনা নাই যাহাতে করতালি আকর্ষণ করিতে পারে। দেশহিতৈষিরা কেহ বলেন দেশের উন্নতির জন্য জিম্ন্যাষ্টিক কর, কেহ বলেন সভা কর, আন্দোলন কর, ভারত-সঙ্গীত গান কর, কেহ বলেন মিথ্যা বল মিথ্যা প্রচার কর কিন্তু কেহ বলিতেছেন না সত্য কথা বল ও সত্যানুষ্ঠান কর। উপরিউক্ত সকল কটার মধ্যে এইটেই সকলের চেয়ে বলা সহজ এবং সকলের চেয়ে করা শক্ত, এইটেরই সকলের চেয়ে আবশ্যক বেশী, এবং সকলের চেয়ে অধিক উপেক্ষিত। সত্য সকলের গোড়ায় এবং সত্য সকলের শেষে, আরম্ভে সত্যবীজ রোপন করিলে শেষে সত্য ফল পাওয়া যায়, মিথ্যার যাহার আরম্ভ মিথ্যায় তাহার শেষ। আমরা যে ভীত সঙ্কুচিত সংশয়গ্রস্ত ক্ষুদ্র ধূলিবিহারী কীটাণু হইয়াছি ইংরেজের মিথ্যা নিন্দা করিলে আমরা বড় হইব না, আপনাদের মিথ্যা প্রশংসা করিলেও আমরা মস্ত হইব না। আমরা যে পরস্পরকে ক্রমাগত সন্দেহ করি, অবিশ্বাস করি, দ্বেষ করি, মিলিয়া কাজ করিতে পারি না, পরের স্তুতি পাইবার জন্য হাঁ করিয়া থাকি, কথায় কথায় আমাদের দল ভাঙ্গিয়া যায়, কাজ আরম্ভ করিতে সংশয় হয়, কাজ চালাইতে উৎসাহ থাকে না, আমরা যে খুঁটিনাটি লইয়া থাকি, খুঁটিনাটি লইয়া মান অভিমান করি, মুখ্য ভুলিয়া গিয়া গৌণ লইয়া অশিক্ষিতা মুখরার ন্যায় বিবাদ করিতে থাকি, আড়ালে পরস্পরের নিন্দা করি, সম্মুখে দোষারোপ করিতে অত্যন্ত চক্ষুলজ্জা হয়, তাহার কারণ আমরা মিথ্যাচারী, সত্যের প্রভাবে সরল ও সরলমুহি, উদার উৎসাহী ও বিশ্বাসপরায়ণ নহি। আমরা যে আগাগোড়া কল চালিতেছি, তাহার গোড়া নাই, নানাবিধ অনুষ্ঠান করিতেছি কিন্তু তাহার মূলে সত্য নাই, এই জন্য ফল লাভ হইতেছে না। যেমন, এই রাগিণীতে যে গান গাওনা কেন একটা বাঁধা সুর অবলম্বন করিতে হইবে, সেই এক সুরের প্রভাবে গানের সকল সুরের মধ্যে ঐক্য হয়, নানা বিভিন্ন সুর এক উদ্দেশ্য সাধন করিতে থাকে, কেহ কাহাকেও অতিক্রম করে না, তেমনি আমরা যে কাজ করি না কেন সত্যকে তাহার মূল সুর ধরিতে হইবে। আমরা সেই মূল সুর ভুলিয়াছি বলিয়াই এত কলরব হইতেছে, ঐক্য ও শৃঙ্খলার এত অভাব দেখা যাইতেছে। এত বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও সকলে কোলাহলই উত্তেজিত করিতেছেন, কেহ মূল সুরের প্রতি লক্ষ্য করিতে বলিতেছেন না, তাহার কারণ ইহার প্রতি সকলের তেমন দৃঢ় আস্থা নাই—ইহাকে তাঁহারা অলঙ্কারের হিসাবে দেখেন নিতান্ত আবশ্যকের হিসাবে দেখেন না। পেট্রিয়টেরা দেশের উন্নতির জন্য নানা উপায় দেখিতেছেন, নানা কৌশল খেলিতেছেন। এ দিকে মিথ্যা নীরবে আপনার কার্য্য করিতেছে, সে ধীরে ধীরে আমাদের চরিত্রের মূল শিথিল করিয়া দিতেছে, সে আমাদের পেট্রিয়টদিগের কোলাহলময় ব্যস্ততাকে কিছুমাত্র খাতির করিতেছে না। পেট্রিয়টেরা পদ্মার তীরে দুর্গ নির্ম্মাণে মত্ত হইয়াছেন, কিন্তু মায়াবিনী পদ্মা তাহার অবিশ্রাম খরস্রোতে তলে তলে তটভূমি জীর্ণ করিতেছে। তাই মাঝে মাঝে দেখিতে পাই আমাদের পেট্রিয়টদিগের বিস্তৃত আয়োজন সকল সহসা এক-রাত্রের মধ্যে স্বপ্নের মত অন্তর্ধান করে। যেখানে জাতীয় চরিত্রের মূল শিথিল হইয়া গিয়াছে, সেখানে যে পাঁচ জন পেট্রিয়টে মিলিয়া জোড়াতাড়া, তালি, ঠেকো প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া কৌশল খেলাইয়া স্থায়ী কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন এমন আমার বিশ্বাস হয় না। অনন্তের অমোঘ নিয়মকে কৌশলের দ্বারা ঠেলিবে কে? যেখানে সত্য সিংহাসনচ্যুত হওয়াতে অরাজকতা ঘটিয়াছে, সেখানে চাতুরী আসিয়া কি করিবে! হায়, দেশ উদ্ধারের জন্য সত্যকে কেহই আবশ্যক বিবেচনা করিতেছেন না! চিরনবীন চির-বলিষ্ঠ সত্যকে বুদ্ধিমানেরা অতি প্রাচীন বলিয়া অব-হেলা করিতেছেন! কিন্তু যাঁহারা জীবন নূতন আরম্ভ করিয়াছেন, যৌবনের পূত হুতাশন যাঁহাদের হৃদয়কে উদ্দীপ্ত ও উজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করিতেছে যাহার সহস্র শিখা দীপ্ত তেজে মহত্ত্বের দিকেই অবিশ্রাম অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে, যাঁহারা বিষয়ের মিথ্যাজালে জড়িত হন নাই, মিথ্যা যাঁহাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় অভ্যস্ত হইয়া যায় নাই, তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করুন প্রার্থনা করুন যেন সত্যপথে চিরদিন অটল থাকিতে পারেন, তাহা হইলে অমর যৌবন লাভ করিয়া তাঁহারা পৃথিবীর কাজ করিতে পারিবেন। মিথ্যাপরায়ণ বিজ্ঞ-

তার সঙ্গে সঙ্গেই জরাগ্রস্ত বার্দ্ধক্য আমাদের প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করে, আমাদের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায়, আমাদের প্রাণের দৃঢ় সূত্র সকল শিথিল হইয়া পড়ে, সংশয় ও অবিশ্বাসের প্রভাবে মাংস কুঞ্চিত হইয়া যায়। আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে বাহির হইব যে, মিথ্যার জয় দেখিলেও আমরা সত্যকে বিশ্বাস করিব, মিথ্যার বল দেখিলেও আমরা সত্যকে আশ্রয় করিব, মিথ্যার চক্রান্ত ভেদ করিবার উদ্দেশে মিথ্যা অস্ত্র ব্যবহার করিব না। আমরা জানি শাস্ত্রেও মিথ্যা আছে, চিরন্তন প্রথার মধ্যেও মিথ্যা আছে, আমরা জানি অনেক সময়ে আমাদের হিতৈষী আত্মীয়েরা মিথ্যাকেই আমাদের যথার্থ হিতজ্ঞান করিয়া জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ আমাদিগকে মিথ্যা উপদেশ দিয়া থাকেন। সত্যানুরাগ হৃদয়ের মধ্যে অটল রাখিয়া এই সকল মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। সত্যানুরাগ সত্ত্বেও আমরা ভ্রমে পড়িব, কিন্তু সেই ভ্রম সংশোধন হইবে, সেই ভ্রমই আমাদিগকে পুনরায় সত্যপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র প্রথানুরাগ বা শাস্ত্রানুরাগ বশতঃ যখন ভ্রমে পড়ি তখন সে ভ্রম হইতে আর আমাদের উদ্ধার নাই, তখন ভ্রমকে আমরা আলিঙ্গন করি, মিথ্যাকে প্রিয় বলিয়া বরণ করি, মিথ্যা প্রাচীন ও পূজনীয় হইয়া উঠে, পূর্ব্ব পুরুষ হইতে উত্তর পুরুষে সযত্নে সংক্রামিত হইতে থাকে, এইরূপ সমাদর পাইয়া বিনাশের বীজ মিথ্যা আপন আশ্রয়ের স্তরে স্তরে শিকড় বিস্তার করিতে থাকে অবশেষে সেই জীর্ণ জর্জ্জর মন্দিরকে সঙ্গে করিয়া ভূমিসাৎ হয়। আমাদের এই দুর্দ্দশাপন্ন ভারতবর্ষ সেই ভূমিসাৎ জীর্ণ মন্দিরের ভগ্নস্তূপ। কালক্রমে বন্ধন-জর্জ্জর সত্য এই ভারতবর্ষে এমনি হীনদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে গুরু, শাস্ত্র এবং প্রথাই এখানে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিল, স্বর্গীয় স্বাধীন সত্যকে গুরু, শাস্ত্র এবং প্রথার দাসত্বে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। মিথ্যা উপায়ের দ্বারা সত্য প্রচার করিবার ও সহস্র মিথ্যা অনুশাসন দিয়া সত্যকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। বুদ্ধিমানেরা বলিয়া থাকেন, মিথ্যার সাহায্য না লইলে সাধারণের নিকটে সত্য গ্রাহ্য হয় না, এবং মিথ্যা বিভীষিকা না দেখাইলে লোকেরা সত্য পালন করিতে পারে না। মিথ্যার প্রতি এমনি দৃঢ় বিশ্বাস। ইতিহাসে পড়া যায় বিলাসী সভ্য জাতি যখনি অসভ্য জাতিকে আত্মরক্ষার্থ আপন ভৃত্যশ্রেণীতে নিযুক্ত করিত, তখনি অসভ্যেরা নিজের বল বুঝিতে পারিয়া মনিব হইয়া দাঁড়াইত। তেমনি সত্যকে উদ্ধার জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করাতে ক্রমে মিথ্যাই মনিব হইয়া দাঁড়াইল—সত্যকে মিথ্যার দাস হইতে হইল। সত্যের এইরূপ অবমান দশায় শত সহস্র মিথ্যা আসিয়া আমাদের গৃহমধ্যে ও পরিবারের ভিতরে আশ্রয় লইল কেহ তাহাদিগকে রোধ করিবার রহিল না। তাহার ফল এই হইল সত্যকে দাস করিয়া আমরা মিথ্যার দাসত্বে রত হইলাম, দাসত্ব হইতে গুরুতর দাসত্বে উত্তরোত্তর নামিতে লাগিলাম, আজ আর উত্থান শক্তি নাই—আজ পঙ্গুদেহে পথপার্শ্বে বসিয়া ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া কাতর স্বরে বলিতেছি "দেও বাবা ভীখ্ দেও।"

বালক, চৈত্র।

নব-বর্ষের গান।

ভৈরোঁ। ঝাঁপতাল।

আমারেও কর মার্জ্জনা।
আমারেও দেহ নাথ অমৃতের কণা।
গৃহ ছেড়ে পথে এসে, বসে আছি ম্লান বেশে,
আমারো হৃদয়ে কর আসন রচনা।
জানি আমি, আমি তব মলিন সন্তান,
আমারেও দিতে হবে পদতলে স্থান।
আপনি ডুবেছি পাপে কাঁদিতেছি মনস্তাপে
শুনগো আমারো এই মরম-বেদনা।

ললিত। আড়াঠেকা।

বর্ষ গেল, বৃথা গেল, কিছুই করিনি হায়,
আপন শূন্যতা লয়ে, জীবন বহিয়া যায়।
তবুত আমার কাছে, নব রবি উদিয়াছে,
তবুত জীবন ঢালি বহিছে নবীন বায়।
বহিছে বিমল উষা তোমার আশীষ বাণী,
তোমার করুণা-সুধা হৃদয়ে দিতেছে আনি।
রেখেছ জগৎ-পুরে, মোরেত ফেলনি দূরে,
অসীম আশ্বাসে তাই পুলকে শিহরে কায়।

টৌড়ি-ভৈরবী। আড়াঠেকা।

ফিরোনা ফিরোনা আজি, এসেছ দুয়ারে,
শূন্য হাতে কোথা যাও শূন্য সংসারে।
আজ তাঁরে যাও দেখে, হৃদয়ে আনগো ডেকে,
অমৃত ভরিয়া লও মরম মাঝারে।
শুষ্ক প্রাণ শুষ্ক রেখে কার পানে চাও—
শূন্য দুটো কথা শুনে কোথা চলে যাও।
তোমার কথা তাঁরে বলে তাঁর কথা শুনে
চলে যাও, তাঁর কাছে রেখে আপনারে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বর্ষ-শেষ ব্রাহ্মসমাজ।
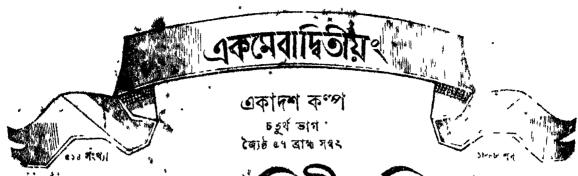
পৃথিবী আত্মার পালন ও পোষণ-ক্ষেত্র। কৃষক বীজকে অঙ্কুরিত করিবার জন্য যেমন প্রথমে ক্ষুদ্রায়তন ভূমিখণ্ডে তাহাকে বপন করে; তৎপরে জলবায়ু আলোক প্রদানে তাহাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া ক্ষেত্রান্তরে রোপণ করিয়া থাকে, করুণাময় পরমেশ্বর তেমনই পৃথিবীরূপ উর্ব্বর ক্ষেত্রে মানব আত্মাকে রক্ষা করিয়া এখানকার জ্ঞান ধর্ম্ম প্রীতি পবিত্রতায় শিক্ষিত ও উন্নত করিয়া ক্রমে তাহাকে লোকলোকান্তরের উপযুক্ত করিয়া লন। কৃষক যেমন মৃত্তিকার মধ্যে বীজ নিহিত করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত নহে, যতকাল না তাহা অঙ্কুরিত হইয়া ক্ষুদ্র বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, ততদিনই যথানিয়মে বারিসেচন ও বাতাতপ প্রদান বিষয়ে সুব্যবস্থা করিয়া থাকে, সেইরূপ অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বর বিশাল সংসারের মধ্যে ক্ষুদ্রায়তন দেহাভ্যন্তরে অমর আত্মাকে নিহিত করিয়া দিয়া এমনই অনুকূল বিষয়-ব্যাপারের ভিতরে এমন ভাবে তাহাকে সংস্থাপন করিয়াছেন, যে সে সুকুজ্জ্বল জ্ঞানের আলোক, প্রেমের সুস্নিগ্ধ ছায়ায় আ-স্বস্থ পরিপুষ্ট হইয়া ক্রমে পরলোকের উপযুক্ত হয়। কৃষিকার্য্যে কৃষকের যত্ন চেষ্টা থাকিলেও যেমন সুবৃষ্টির অপেক্ষা থাকে তেমনি উন্নতিশীল স্বাধীন আত্মার স্বায় উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য তাহার আত্ম-চেষ্টা আত্মবল থাকিলেও তাহার সার্ব্বভৌমিক উন্নতির নিমিত্ত দেব-প্রসাদের নিতান্ত প্রয়োজন। ঈশ্বর সেই জন্য তাঁহার অতুলন জ্ঞান প্রেম-ছটা প্রকৃতি-পটে নিয়তই বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, দুর্লভ প্রসাদবারি অকাতরে মানব আত্মার উপরে অজস্রধারে প্রতি-নিয়তই বর্ষণ করিতেছেন, জ্ঞান প্রেম দয়া ধর্ম্ম প্রতিক্ষণই বিতরণ করিতেছেন, এবং তাহার অনন্ত উন্নতিসাধনের পরমোৎকৃষ্ট আদর্শরূপে আপনাকে তাহার হৃদয়াকাশে নিয়তই প্রকাশ করিতেছেন। বৃক্ষবাটিকা যেরূপ বৃক্ষের পূর্ণবিকাশের স্থান নহে, কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইলেই যেমন তাহা ক্ষেত্রান্তরে নীত ও রোপিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে ফলফুলে শোভিত হইয়া দিক্‌বিতান আলোকিত করে, সেইরূপ মানব আত্মার পূর্ণ উন্মেষ ক্ষেত্র এই পৃথিবী নহে। পৃথিবীর শিক্ষাসাধন জ্ঞান প্রেম আত্মাকে প্রীতি পবিত্রতা, শান্তি সদ্ভাবের ফলফুলে চিরশোভিত করিতে পারে না। সে এখানে যথো

চিত উন্নত ও বর্দ্ধিত হইলে আবার উচ্চতর শিক্ষা ও মহত্তর উন্নতি সাধনের জন্য লোকান্তরে নীত হয়।

পার্থিব কীট পতঙ্গ যেমন বর্দ্ধন-উন্মুখ বৃক্ষলতার শ্রী সৌন্দর্য্য বিনাশ করে তেমনি এখানকার পাপ তাপ উন্নতিশীল আত্মার শ্রীসৌষ্ঠব বিরূপ ও বিকৃত করিয়া দেয়। তাহারদের উপদ্রব অত্যাচারে আত্মা এখানে হতবল হইয়া পড়ে, তাহার স্ফূর্ত্তি উদ্যম তিরোহিত হইয়া যায়। আকাশ হইতে চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোতি, সূর্য্যের মঙ্গল কিরণ মেঘের সুস্নিগ্ধ বারিধারা প্রাপ্ত হইলে যেমন বৃক্ষলতা প্রাণ পায়, তেমনি অন্তরাকাশ হইতে জ্ঞান প্রেম সত্য মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বরের অমৃত-জ্যোতি প্রেম ধারা আত্মাতে পতিত হইলে তবে তাহার পাপতাপ মোহ-কুজ্ঝটিকা অন্তরিত হয়। তাহার উন্নতি-পথের বিঘ্ন-বিপত্তি সকল বিদূরিত হইয়া যায়। তখনই সে নবতর কল্যাণতর লোকের জন্য এখানে উপযুক্ত হইবার বলশক্তি লাভ করে।

কৃষক যেমন ক্ষুদ্র বৃক্ষবাটিকার নবজাত বৃক্ষকে বদ্ধমূল হইতে দেয় না, ফলতঃ যাহাতে তাহার শিকড় সকল মৃত্তিকার গভীর প্রদেশে প্রবেশ না করে তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকে; তেমনি যাহাতে আমারদের আত্মা এই সংকীর্ণ সংসারে নিমগ্ন হইয়া না পড়ে, পার্থিব সুখে আমারদের আত্মা আকৃষ্ট না হয়, স্ত্রী-পুত্র পরিবারের মায়ার শতবন্ধনে জড়িত হইয়া না যায়, অনন্ত উন্নত ধামের যাত্রী হইয়া এককালে পৃথিবীতেই আশা ভরসা দৃঢ়বদ্ধ করিয়া না ফেলে, তজ্জন্য করুণাময় ঈশ্বর সর্ব্বদাই স্নেহদৃষ্টিতে আমাদিগকে রাখিতেছেন। সেই কারণেই বিপথগামী হইলে কখন ভয়মূর্ত্তি দেখাইয়া আমাদিগকে সতর্ক ও সাবধান করিতেছেন, কখন দুঃখের কঠিন কশাঘাতে আমাদিগকে সৎপথে আনয়ন করিতেছেন। কখন বা প্রেমের আলিঙ্গন দিয়া আমারদের আত্মার শতগুণ বল বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছেন। কখন বা হৃদয়বিমোহন প্রেমের প্রতিমা স্নেহের পুত্তলিকা সকলকে অন্তরিত করিয়া দিয়া, আমাদের মোহ-অন্ধকার বিনষ্ট করত জাগ্রত করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সম্পাদনে আমারদিগকে দৃঢ়ব্রত করিয়া তুলিতেছে। দেশ কালের মধ্যে থাকিয়া ঘটনাপটে যখন তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহের অভিনয় দেখিতে পাই, তখনই বুঝিতে পারি যে আমরা সংসারের জীব নহি, বিনশ্বর পার্থিব পদার্থপুঞ্জ আমারদের চিরতৃপ্তি-প্রদ উপাদান নহে, আমারদের তৃপ্তি-স্থল ঈশ্বর, আমারদের প্রাণাধার পরব্রহ্ম। তখন বুঝিতে পারি যাহা কিছু তিনি প্রেরণ করেন, তাহাই আমারদের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য। তখন আমরা কেবলমাত্র তাঁহাকেই আমারদের সর্ব্বস্ব ও ঐহিক পারত্রিক সুখ সম্পত্তির কারণ জানিয়া নির্ভয় হই। সংসার আমারদের সর্ব্বস্ব নহে, আমরা ব্রহ্মধামের যাত্রী, অনন্তকাল শত শত বার বিশ্বের মধ্য দিয়া আমারদিগকে তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। পৃথিবী সেই পথের একটি সামান্য পান্থ-নিবাস মাত্র। তখনই নিরাশার মধ্যে আশা পাই, শোকের মধ্যে সান্ত্বনা লাভ করি, সংসার-প্রহেলিকার গূঢ় মর্ম্ম অবধারণে সমর্থ হই এবং ভয় বিপদের মধ্যে তাঁহার অভয় হস্ত দেখিতে পাইয়া লৌহবর্ম্মে হৃদয়কে আবৃত করি। হা! ঈশ্বরের কি করুণা! তিনি দীন হীন ক্ষুদ্র আত্মাকে কত উপায়ে যে আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন তাহা কে বলিবে।

বৃক্ষের মূল যেমন ভূপৃষ্ঠে, আত্মার মূল তেমনই ঊর্দ্ধদেশে। আত্মা উত্তান-পাদ

ঈশ্বর হইতে ইহার উৎপত্তি, আবার ঈশ্বরের দিকেই ইহার গতি, আত্মা ভূলোক হইতে দেবলোকে, দেবলোক হইতে উচ্চতর লোকে ক্রমাগতই বিমলতর পবিত্রতর হইয়া নির্ম্মল শাশ্বত সুখ উপভোগের জন্য সেই সুখের অনন্ত প্রস্রবণের প্রতি ধাবিত হইতেছে। মানব আত্মা সেই অনির্ব্বচনীয় সুখের ভিখারী বলিয়াই সাংসারিক সুখে তাহার এত অতৃপ্তি, তাহার ক্ষুৎপিপাসা অধিক বলিয়াই পার্থিব অনিত্য সুখে তাহার শান্তি নাই আরাম নাই। যখনই ভ্রমান্ধ হইয়া সংসার-মরীচিকায় তৃপ্তি লাভ করিতে যায়, তখনই প্রতারিত হয়।

ধমনীর গতি চেষ্টায় ত্রুটি হইলে যেমন রক্তের চালাচলি বিশুদ্ধ হয় না অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ঈশ্বরের স্নেহ প্রেমের প্রতি উদাসীন হইলে তেমনি আত্মার উচ্ছেদ-দশা উপস্থিত হইয়া থাকে। আমরা স্বাধীন জীব হইলেও আমারদের মানসিক বল এতদূর অধিক নহে, যাহাতে পাপ প্রলোভনের প্রতি আক্রমণে বিজয় লাভ করিতে পারি। জ্ঞানের ক্ষীণ আলোকে সকল সময়ে আমরা আমারদের গন্তব্য পথ স্থির করিতে পারি না। রিপুকুলের উত্তেজনায় অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকা আমারদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। সেই জন্যই তাঁহার এই প্রেমরাজ্যে পাপ তাপ বিবাদ কলহ অসূয়া পরনিন্দার দাবানল আমরা নিজেই প্রজ্বলিত করিয়া দিয়া দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছি।

সম্বৎসর কাল চলিয়া যায়, এই রজনী মাত্র অবশিষ্ট আছে। আমরা এক্ষণে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান। অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হৃদয় নিরাশায় পূর্ণ হইতেছে। এমন কত সময় বৃথা অতিবাহিত করিয়াছি; যখন তাঁহার দিকে আসিতে চেষ্টা করিলে সহজেই আসিতে পারিতাম, এমন কত সময় আমোদ প্রমোদে কাটাইয়া দিয়াছি যখন তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া আত্মাকে মধুময় করিতে পারিতাম, ও তাঁহার প্রীতিকর ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া মনুষ্যজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইতাম। যখন প্রেয়ের আহ্বানে মুগ্ধ হইয়া তাহার পথ সরণ করিয়াছিলাম, তখন জানিতাম না যে শ্রেয় হইতে এতদূর অন্তরে পতিত হইব ও আপনার উপর এত অধিক পাপ-মলা সঞ্চয় করিব। সাম্পারথ যে রূপে এক পথ হইতে অন্য পথে গমন করে, তাহা যেমন আরোহী অনেক দূর গমন না করিয়া বুঝিতে পারে না, তেমনি আমরা সরল শ্রেয়-পথকে অতিক্রম করিয়া এখন যে কেমন করিয়া প্রেয়ের পথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তাহা নির্ণয় করিতে পারি না। যখন বুঝিলাম যে সেই পুণ্য-পথ হইতে বহুদূর অন্তরে আসিয়া পড়িয়াছি তখন ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন আর প্রত্যাবর্ত্তনের উপায় দেখিতে পাই না, তাঁহার অমোঘ সাহায্য বিনা পরিত্রাণের আর পথান্তর দেখিতে পাই না।

ভবিষ্যতের কি কোন আশা নাই, সে পথ কি নিতান্তই অন্ধকারাচ্ছন্ন? অতীতের পাপ তাপ কি ধ্বংস হইবার নহে? আমারদের মৃতবৎ আত্মার কি মৃতসঞ্জীবন ঔষধ কোথাও নাই? আমারদের আত্মা অনন্ত উন্নত ধামের যাত্রী হইয়া অসহায় অবস্থায় এই মহা প্রান্তরে নিপতিত থাকিয়া কি চিরকাল রোদন করিবে, চিরবন্দী ভাবে কি এখানে দুঃসহ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিবে? না, কখনই না। সেই পাপতাপহারী বিপদকাণ্ডারী আমারদের নিকটে, সেই স্নেহময়ী মাতা, করুণাময় পিতা, যাত্রীবৎসল নেতা আমারদের সম্মুখে। জ্ঞান-

উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে সকলে দর্শন কর, স্থির হৃদয়ে তাঁহার আশাপূর্ণ স্নেহের আহ্বান শ্রবণ কর। তিনি বলিতেছেন "বৎস! নিরাশ হইও না, এই যে আমি তোমার সম্মুখে; কৃত অপরাধ জন্য আন্তরিক অনুতপ্ত হইয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ কর, "আমি তোমাদের পাপ-মলা প্রক্ষালিত করিয়া অমৃত পথে লইয়া যাইব।" আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, আইস আমরা সকলে তাঁহার অমোঘ সাহায্য প্রার্থনা করি।

হে পরমাত্মন্! তুমি যে অমর আত্মার উন্নতি সাধনের গুরুভার যত টুকু আমারদের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলে, দেখ আমরা তাহাকে পাপের পঙ্কিল হ্রদে ডুবাইয়া বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় তোমার সিংহাসনের সম্মুখে কম্পিতকলেবরে দণ্ডায়মান হইয়াছি। তুমি সহস্র দণ্ড দাও অম্লানবদনে সহ্য করিব, কিন্তু তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না। তোমা হইতে পলায়ন করিয়া আর কোথায় গিয়া রক্ষা পাইব। গিরিগুহা অরণ্য প্রান্তর নগর গ্রাম সকল স্থানেই তোমার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বিদ্রোহী প্রজা যেমন রাজার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া অভয় প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ আমরা পাপে মলিন শোকে জর্জরিত হইয়া তোমার পদতলে অমর আত্মাকে আনিয়া ধারণ করিতেছি, তুমি তোমার প্রসাদ-বারি সিঞ্চনে তাহার পাপ-মলা ধৌত বিধৌত করিয়া দাও। তুমি তোমার অমৃতময় ক্রোড়ে তাহাকে স্থান দান কর, ধর্ম্মের অভেদ্য কবচে তাহাকে আবৃত করিয়া দাও। তুমি যে আমারদের আশ্রয়, আর আমরা যে তোমার আশ্রিত, তুমি যে আমারদের পিতা, আমরা যে তোমার দীন সন্তান, তুমি যে আমারদের ইহলোকের ঐশ্বর্য্য পরলোকের সম্বল, আমরা যে তোমার চির আশ্রিত ও তোমার দ্বারের চিরভিখারী। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, আর কতকাল তোমা হইতে দূরে থাকিব। তুমি যদি কৃপা করিয়া আমারদিগকে দর্শন দিয়াছ আমারদিগকে তোমার সন্নিহিত কর। যাহাতে শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নিরন্তর তোমার দিকে অগ্রসর হইতে পারি, বর্ষের পর নববর্ষের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে আমারদের আত্মা নবতর কল্যাণতর বেশে তোমার নিকটবর্ত্তী হইতে পারে, কৃপা করিয়া আমারদিগকে এরূপ ধর্ম্মবল ও শুভবুদ্ধি প্রদান কর। তোমার নিকটে যোড়করে এই প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

নব-বর্ষ।

দেখিতে দেখিতে নববর্ষের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আরক্তিম সূর্য্য পূর্ব্বদিকে দণ্ডায়মান হইল, আর আমাদের অন্তরে বাহিরে উৎসব-মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে—আমাদের আরাধ্য দেবতা মধ্যস্থলে জ্যোতির্ম্ময় মহিমায় আসীন রহিয়াছেন নিখিল দেবতারা তাঁহার উপাসনা করিতেছেন—আমরাও তাঁহার উপাসনার জন্য এখানে প্রেম ভক্তি সহকারে সম্মিলিত হইয়াছি। তাঁহারই আদেশে প্রত্যেক মাস, প্রত্যেক বৎসর, নূতন নূতন সজ্জায় সজ্জিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্য সমাধা করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছে—বৎসরের এই প্রথম প্রাতঃকালের বিমল কিরণ বৃথা চলিয়া না যায়—এই মুখ্য সময়টিকে আইস আমরা কায়মনোবাক্যে আমাদের [illegible] দেবতার আরাধনায় উৎসর্গ করি—[illegible] বিশুদ্ধ মনে উৎসর্গ করি যেন সম্বৎসর [illegible]

আমরা তাঁহার ফল ভোগ করিতে পারি। প্রাতঃকালের প্রথম জ্যোতির জন্য সরোবরের পদ্ম কেমন লালায়িত হয়, বৎসরের প্রথম মঙ্গল-কিরণের জন্য আমরা সেইরূপ তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয়ে এখানে সম্মিলিত হইয়াছি—এই সময়ে আইস আমরা আমাদের দেবতার দেবতা প্রভুর প্রভু জীবনের জীবন পরমাত্মাকে ভক্তি-ভরে প্রণাম করিয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হই, আজ তিনি আমাদিগকে বৎসরের প্রথম অমৃত ফল বিতরণ করিবার জন্য এখানে আহ্বান করিয়াছেন, আজ আমাদের কত না আনন্দ। পবিত্র সঙ্গীত-ধ্বনিতে হৃদয় শান্ত হইয়া আত্মার দিব্য চক্ষু বিকসিত হইয়াছে—পরমাত্মাকে আমরা দেখিতেছি—স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ; তিনি অধোতে তিনি ঊর্দ্ধে তিনি পশ্চাতে তিনি সম্মুখে তিনি দক্ষিণে তিনি উত্তরে, ঈশানো ভূতভব্যস্য তিনি ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা স এবাদ্য স উ শ্বঃ তিনি অদ্যও যেমন কল্যও তেমনি, সমস্ত ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তাঁহারই প্রেমের সুদীর্ঘ নিশ্বাস, সমস্ত আকাশ তাঁহারই প্রাণের জীবন্ত উচ্ছ্বাস। হে পরমাত্মন্! তোমার প্রসাদে বসন্ত ঋতু তরুলতার মর্ম্মে মর্ম্মে রস সিঞ্চন করে, গ্রীষ্ম ঋতু সন্ধ্যা-সমীরণে মাধুর্য্য সঞ্চার করে, বর্ষা-ঋতু তপ্ত মেদিনীকে শীতল করে, শরৎ ঋতু দিক্ দিগন্তের মলিন মুখ উজ্জ্বল করে, শীত ঋতু ধরণীকে শস্যশালিনী করে, কিন্তু তোমার প্রেম-সুধার কণামাত্র আমাদের মৃত-শরীরে যেরূপ প্রাণ সঞ্চার করে, আমাদের শুষ্ক হৃদয়কে যেরূপ সরস করে আমাদের আত্মাতে যেরূপ অক্ষয় জীবনের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দেয়, জগতে কোথাও তাহার তুলনা নাই। তোমার প্রেম নিখিল জনের নিখিল মঙ্গল—সেই প্রেমের প্রসাদ-বিন্দু আমাদের সম্মুখে [illegible] হইবে এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া আমরা এখানে সমাগত হইয়াছি—তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

দর্শন-সংহিতা।*

উপক্রমণিকা

তত্ত্বজ্ঞান-শব্দে কিরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

এই গ্রন্থের আগাগোড়া যে-কোন স্থানে তত্ত্বজ্ঞান-শব্দের উল্লেখ আছে, সেখানে দর্শন বিজ্ঞান বলিতে সচরাচর যাহা বুঝায় তাহাই বুঝিতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞান বা দর্শন কাহাকে বলে তাহা পরে আপনা হইতেই প্রকাশ পাইবে—সে জন্য কোন চিন্তা নাই। পূর্ব্বাহ্নে কেবল এই কথাটি বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, তত্ত্বজ্ঞান শব্দের যেরূপ অর্থ এখানে ধরা হইতেছে, তাহার ভিতর ভৌতিক বিজ্ঞান কি গণিত-বিজ্ঞান এ দুয়ের কোনটিই স্থান পাইতে পারে না—উভয়ই তাহার অধিকার-বহির্ভূত।

তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে কোন্ দুইটি বিষয় প্রয়োজনীয়।

তত্ত্ব-জ্ঞান-শাস্ত্রের দুইটি হওয়া চাই—(১) সত্য হওয়া চাই এবং (২) যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হওয়া চাই। তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্র যদি সত্য না হয় তবে তাহাতে লোকের বিশ্বাস জন্মিবে কদাচ; যদি তাহা যুক্তি-দ্বারা প্রমাণীকৃত না হয়, তবে সেরূপ শাস্ত্র তত্ত্বজিজ্ঞাসুকে অধ্যয়ন করিতে দেওয়া, আর, ক্ষুধা-

---

* অধ্যাপক ফেরিয়ারের কৃত Institutes of Metaphisics.

র্ত্তকে কাঁচা মাংস ভক্ষণ করিতে দেওয়া, সমান,—তাহা পলাধঃকরণ হওয়াই ভার। সত্য তত্ত্বজ্ঞানের চরম লক্ষ্য; এই জন্য তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্র সত্য হওয়া চাই। তেমনি আবার, জ্ঞানের বিকাশ তত্ত্বজ্ঞানের উপস্থিত লক্ষ্য,—তাহা বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচালনার উপর নির্ভর করে। বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা—অর্থাৎ যেখানকার মূলতত্ত্ব হইতে চরম সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত যুক্তির যতগুলি অবয়ব আছে, সমস্তেরই অবধারণ এবং শৃঙ্খলাবন্ধন; এই জন্য তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্র যুক্তি-যুক্ত হওয়া চাই। অতএব তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃত আদর্শ ধরিতে গেলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, তত্ত্বজ্ঞান যুক্তি-যুক্ত সত্যের একটি সমষ্টি।

ঐ দুই প্রয়োজনীয় বিষয়ের কোনটি অধিক বলবৎ।

উপরে যে দুইটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের কথা বলা হইল (কি না (১) সত্য হওয়া চাই, (২) যুক্তিযুক্ত হওয়া চাই) তাহার মধ্যে শেষোক্তটি অপেক্ষাকৃত বলবৎ। তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে সত্য হওয়া যতই কেন আবশ্যক হউক না—যুক্তি-যুক্ত হওয়া তাহা অপেক্ষাও অধিক আবশ্যক; কারণ, সত্যের নাগাল পাওয়া মনুষ্যের ভাগ্যে হয়-তো কোন কালেই ঘটিবে না, কিন্তু বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচালনা স্পষ্টই তাহার অধিকারায়ত্ত, এবং তাহা তাহার ক্ষমতার ভিতর। যেখানে দুইটি বিষয় অনুধাবনা করিয়া ধরিবার কথা, সেখানে, যে-টি নিশ্চিত আমাদের আয়ত্ত-সুলভ সেটিকে ছাড়িয়া—যে টি অনিশ্চিত (হয় তো বা একেবারেই অপ্রাপ্য) সেটিতে হস্ত-প্রসারণ করা নিতান্তই যুক্তি-বিরুদ্ধ। এ ছাড়া, স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন মনুষ্যের যেমন একটি গুরুতর উদ্দেশ্য, এমন আর কিছুই নহে।

ঐ দুয়ের সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রের বিভিন্ন মূল্য।

এইরূপ বিবেচনায় বিভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্রের বিভিন্ন মূল্য বাঁধিয়া দেয়। তাহার মূল্য সর্ব্বোচ্চ যাহাতে উপরি-উক্ত উভয় গুণ একাধারে বর্ত্তমান—অর্থাৎ যাহা সত্যও বটে—যুক্তিযুক্তও বটে। কিন্তু, যে তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্র সত্য হইয়াও যুক্তিহীন, তাহা অপেক্ষা, যাহা সত্য না হইয়াও যুক্তিযুক্ত তাহার মূল্য অধিক।

যুক্তিহীন শাস্ত্রের কোন মূল্য নাই যেহেতু তাহা তত্ত্বজ্ঞানের সংজ্ঞা-বিরুদ্ধ।

যুক্তিহীন তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্রের কোন মূল্য নাই; কারণ যুক্তির পথ দিয়া সত্য প্রাপ্তির নামই তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানের সংজ্ঞাই ঐ। যে শাস্ত্র সত্যে উপনীত হয়—কিন্তু যুক্তির পথ দিয়া নহে, তাহা মূলেই তত্ত্বজ্ঞান নহে; তাহার কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নাই। শুদ্ধ কেবল কথায় বিশ্বাস করিয়া কোন মনুষ্যই অপর মনুষ্যের নিকট হইতে সত্য গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে। যুক্তিহীন সত্যের গ্রহণ, আর দোকানদারের কথায় বিশ্বাস করিয়া জিনিস্ কেনা, উভয়ই সমান। যে শাস্ত্র সত্য হইয়াও যুক্তিহীন তাহার সম্বন্ধে ভাল'র মধ্যে কেবল এই এক কথা বলা যাইতে পারে যে, যে শাস্ত্র দুয়ের বা'র (অর্থাৎ না সত্য—না যুক্তিযুক্ত) তাহা অপেক্ষা উহা ভাল।

যুক্তিহীন-শাস্ত্র সত্য হইলেও তাহার নিশ্চয়তা নাই।

আবার, যুক্তিহীন তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্র যদি সত্যও হয়, তথাপি তাহা সত্যের কোন নিদর্শন স্বীয় গাত্রে ধারণ করে না। তাহা সত্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহা নিশ্চিত নহে। কারণ নিশ্চয়তা কিছু আর অমনি হয় না,—বলবৎ প্রমাণের উপর—শক্ত অকাট্য যুক্তির উপর—নিশ্চয়তা নির্ভর করে। অতএব যুক্তিহীন তত্ত্বজ্ঞানের সহিত নিশ্চয়তার কোন সংশ্রব নাই।

মনঃসংযমনের পক্ষেও ওরূপ শাস্ত্র কাজে লাগে না।

আরো এই,—বিজ্ঞান যে, অমনি বুদ্ধি

পরিবর্ত্তনের উপায়-স্বরূপ—সে অংশে উহা আংশিক সত্য-সকলের স্বতন্ত্র কোন মূল্য নাই, "স্বতন্ত্র" অর্থাৎ তাহাদের কোনটিকে অবশিষ্টগুলির মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে তাহার কোন মূল্য নাই। বুদ্ধির বিকাশ যদি বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হয়, তবে বৈজ্ঞানিক সত্য-সকলের মধ্যে যেরূপ সার্ব্বাঙ্গিক যোগ রহিয়াছে তাহারই অবধারণ এবং আলোচনা অভীষ্ট সাধনের পক্ষে বিশেষ উপকারী। কিন্তু যুক্তিহীন তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্র যতই কেন সত্য ও রীতি-সঙ্গত হউক না—তাহার বিভিন্ন অবয়ব-সমূহের মধ্যে এমন কোন মর্ম্মান্তিক বন্ধন নাই যাহাতে সকলেই সকলের সত্যা-সত্যের ভাগী হইতে পারে। অতএব মনকে সুসংযত এবং সুশিক্ষিত করা যেখানে মুখ্য সংকল্প, সেখানে যুক্তি-হীন শাস্ত্র নিতান্তই নিষ্ফল।

যুক্তিযুক্ত শাস্ত্র নাও যদি সত্য হয়—বুদ্ধির পরিচালক বলিয়াও তাহার কতকটা মূল্য আছে।

আর এক দিকে দেখা যায়, যুক্তি-যুক্ত শাস্ত্র সত্য না হইলেও উহার কিছু না কিছু মূল্য আছে। উহা বুদ্ধির পরিচালনা দ্বারা জ্ঞান উৎপাদন করে। উহা সত্যে পৌঁছিতে না পারুক—সত্য-প্রাপ্তির প্রকৃত পথ অনুসরণ করে। হইলে হইতে পারে উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি সত্য নহে, কিন্তু তথাপি সেই এক-একটি অঙ্গ অভিপ্রেত চরম বিপাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবার এক-একটি ধাপ; অথবা যে-একটি নিরবচ্ছিন্ন শৃঙ্খলার উপর চরম ফলের অভিব্যক্তি ভর করিয়া আছে, সেই শৃঙ্খলার এক-একটি কড়া। যদি কথিত শাস্ত্রের এক-একটি অবয়বকে শুদ্ধ কেবল ঐরূপ এক-একটি ধাপ কিম্বা কড়া বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও বুঝিতে পারা যায় যে, উহা নিতান্ত নিষ্ফল নহে; কেননা, একদিকে উহা যেমন বুদ্ধিবৃত্তিকে বল-সাধক কার্য্য-বিশেষে ব্যাপৃত রাখে, আর-এক দিকে তেমনি নানা চক্রান্তের মধ্য হইতে অভিপ্রেত ফল উদ্ধার করিবার যে এক পরিতোষ, যাহা [illegible] সে (এমন কি বিজ্ঞানেও) রস সঞ্চার করিতে ত্রুটি করে না, তাহাও তাহাকে প্রদান করে।

তত্ত্বজ্ঞানের সংজ্ঞার সহিত ইহার অধিকতর মিল আছে।

এরূপ শাস্ত্র (অর্থাৎ যাহা সত্য নহে কিন্তু যুক্তি-যুক্ত তাহা) পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট তত্ত্ব জ্ঞানের সংজ্ঞা পর্য্যন্ত অত উচ্চে নাগাল না পা'ক—অন্যবিধ শাস্ত্র অপেক্ষা (অর্থাৎ যাহা সত্য কিন্তু যুক্তিহীন, তাহা অপেক্ষা) উহা উক্ত সংজ্ঞার অনেকটা কাছাকাছি যায়। কারণ, "সত্য লাভ করা হইতেছে কিন্তু যুক্তির পথ দিয়া নহে" এ-টি যেমন তত্ত্বজ্ঞানের সংজ্ঞা-বিরুদ্ধ কার্য্য, "সত্যে বঞ্চিত হওয়া হইতেছে কিন্তু যুক্তির পথ দিয়া" এটি তেমন নহে। যুক্তি-পথ ভিন্ন সত্য-প্রাপ্তির আরো নানা পথ থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু যে শাস্ত্র তাহার কোনটিকে অবলম্বন করে, তাহা আর-যাহাই হউক না কেন—প্রকৃত পক্ষে তাহা তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্র নহে।

সত্য এবং যুক্তিযুক্ত দুইই হওয়া চাই।

গোড়ায় যাহা বলিয়াছি—তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্রের দুইই হওয়া চাই; উহার যেখানকার যত প্রসঙ্গ সমস্তই সত্য হওয়া চাই; আর, ধারাবাহিক অকাট্য যুক্তি-পরম্পরা দ্বারা উহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রমাণীকৃত হওয়া চাই। এই দুইটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রত্যেকেই যদিচ আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত, তথাপি উভয়ে একতানে মিলিত হইয়া গ্রন্থের আ-দ্যন্ত জুড়িয়া অকাট্য প্রমাণের একটা সুবিস্তীর্ণ সেতু প্রতিষ্ঠিত করিবে। এমন যদি কোন উচ্চ মূল্যের শাস্ত্র থাকে যাহা হইতে প্রভূত বৈজ্ঞানিক ফলের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, তবে তাহা এইরূপ শাস্ত্র।

তত্ত্বজ্ঞানের গ্রন্থাবলী অধীত হইতে পারে, বাক্যাবলী শ্রুত হইতে পারে, কিন্তু তাহার একটি অকাট্য যুক্তিযুক্ত শাস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই শেখা কিম্বা শেখানো যাইতে পারে না।

এ পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা প্রমাণীকৃত হয় নাই।

তত্ত্ববিদগণের বিরচিত শাস্ত্র-সমূহের সত্যাসত্য বিষয়ে কোন কথা না বলিয়া, এ কথা আমরা অকুতোভয়ে বলিতে পারি যে, তাঁহাদের কোনটিই যুক্তিযুক্ত নহে; যুক্তি-যুক্ত বলিতে আমরা এইরূপ বুঝি যে, তত্ত্ব-জ্ঞান-শাস্ত্রের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট অকাট্য প্রমাণের একটি নিরবচ্ছিন্ন শৃঙ্খলা প্রসারিত থাকিবে—তবেই বলিব যে, তাহা যুক্তিযুক্ত। পূর্ব্বপূর্ব্ব তত্ত্ব-পন্থীরা তত্ত্বজ্ঞা-নের পূর্ব্বোক্ত দুইটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের একটির সাধনে যতই কেন তৎপর হউন্ না, কিন্তু দুয়ের মধ্যে যেটি বেশী মর্ম্মান্তিক ও নিতান্ত না হইলেই নয়, সেইটিকেই তাঁহারা অবহেলা করিয়াছেন। আর, ইহার ফল সমস্ত পৃথিবীময় গভীর অসন্তোষের অস্ফুট ধ্বনি-রূপে গুমরিয়া গুমরিয়া জানান্ দিতেছে। নিম্ন পরিচ্ছেদের কথাগুলি ঐ অস্ফুট-ধ্বনির মর্ম্ম-নিহিত ভাবটি সম্যকরূপে না হউক—যথার্থরূপে ব্যক্ত করিতেছে।

তত্ত্বজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থা।

সকলেই এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, তত্ত্বজ্ঞান-সম্বন্ধীয় তর্ক বিতর্ক ও বাদানুবাদ যথেষ্ট আছে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান নাই। ঠিক্ কথাই। তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে কত লোকে কতই লিখিতেছে—উপর্য্যুপরি লিখিতেছে। কিন্তু আসল যুক্তিটিকে কেহই আজ পর্য্যন্ত দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিতে পারিল না। পৃথিবীর যাব-তীয় তত্ত্বজ্ঞানের পুঁথি-পাঁজি দেখিলে বোধ হয়—[illegible] বহুকাল-যাবৎ কি-

[illegible] কোন কালেই [illegible] আরো ঠিক্ হয়, কেবল তাহার টীকা ও ভাষ্যের বোঝা রাশীকৃত পড়িয়া আছে,—প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্র কোথাও নাই। মল্লি-নাথকে কালিদাস বলা—শঙ্করাচার্য্যকে বেদ-ব্যাস বলা—আর,এখনকার তত্ত্বজ্ঞানের গ্রন্থা-বলীকে তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্র বলা আবকল একই কথা। এ সকল গ্রন্থ কেবল আংশিক এবং অসম্বদ্ধ টিপ্পনী-রাশি,—দুর্ভাগ্য বশতঃ মূল গ্রন্থে কেহ যে হস্তার্পণ করিবেন তা'র জো নাই—কেননা তাহা কোন স্থানেই নাই। এই জন্যই দার্শনিক মহলে এত গোলো-যোগ; যিনিই তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি [illegible] পূর্ব্বক মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহারই তাহাতে অসন্তোষ এবং অনাস্থা জন্মিয়াছে। এমন কোন বিচারাসনের নাম-গন্ধও নাই যেখানে কোন বিবাদস্থল মীমাংসার্থে সম-র্পিত হইতে পারে। এমন একটিও গ্রন্থ নাই যেখানে ঠিকঠাক নিরপেক্ষ-ভাবে দার্শ-নিক সমস্ত মতের সংহিতা বিন্যস্ত রহিয়াছে ও যেখানে দার্শনিক তর্কবিতর্কের মূল-সূত্র গুলির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। এই জন্য তত্ত্বজ্ঞান শুধু যে কেবল একটা সংগ্রাম তাহা নহে কিন্তু এইরূপ এক অদ্ভুত সংগ্রাম যাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া অবধি,কোন যোদ্ধাই—স্বপক্ষেরই বা কি আর বিপক্ষেরই বা কি—কোন পক্ষেরই বিবাদের ভিত্তি-মূল অবগত নহে; এমন কি, যাহা লইয়া বিবাদ [illegible] তেছে তাহার কোন্ দিকটাই [illegible] করা হইতেছে, কোন্ দিকটাই বা [illegible] হইতেছে, তাহাও কাহারো [illegible] এই যে পুৎলা-বাজির যুদ্ধ [illegible] গভীরে পাতা আছে যে, [illegible] যোদ্ধা-গণের দৃষ্টি চলে না। যে কোন মত [illegible] করা হয় তাহাও [illegible] যে কোন মত অগ্রাহ্য করা হয় তাহাও [illegible]

ভাবে করা হয়, যিগুণে যে গ্রাহ্য করা হইল—আর কি দোষে যে অগ্রাহ্য করা হইল তাহা কাহারো জানাইয়া দেখা নাই। যখনই অস্ত্রাঘাত প্রয়োগ করা হয়—তা সে সত্যের পক্ষেই হউক্ আর ভ্রান্তির পক্ষেই হউক্—তাহা জ্ঞান-শূন্য এলোথ্যাবড়া রকমে প্রয়োগ করা হয়।

প্রথম, এরূপ হয় কেন? দ্বিতীয়, ইহার প্রতীকার হয় কিসে?

উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহাতে কিছুই বাড়াইয়া বলা হয় নাই বরং অনেক কমাইয়া বলা হইয়াছে। স্বয়ং যাঁহারা তত্ত্ববিৎ তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিই—কিন্তু যাঁহারা সংস্কৃত ঐসব দুরারাধ্য দ্বার-রক্ষকদিগের স্বর্ণ-কপাট ভিতর কিঞ্চিন্মাত্র দন্তস্ফুট করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারা আমাদের এ কথায় সহজেই প্রত্যয় যাইবেন। ইহা যখন ঠিক কথা যে, তত্ত্বজ্ঞানের অবস্থা উহা অপেক্ষা মন্দ বই ভাল নহে—তখন ইহাই জিজ্ঞাস্য যে, প্রথমতঃ এরূপ বিশৃঙ্খলা কি কারণে ঘটিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ কিরূপে উহার প্রতীকার হইতে পারে।

প্রথম,—সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বকথিত প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয়টির অভাবেতাই উহার মূল,—তত্ত্বজ্ঞান যুক্তি-দ্বারা সমর্থিত হয় না বলিয়াই এটি ঘটিয়াছে। যুক্তি-দ্বারা সমর্থন করা কাহাকে বলে তাহা কাজে না দেখাইয়া, শুধু কেবল কথায় বলিয়া, বুঝানো যাইতে পারে না। কেহ যদি কার্য্যতঃ এবং বিস্তারতঃ ইহার দৃষ্টান্ত প্রয়োগ দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে আমরা এই গ্রন্থের মুখ্য অবয়বটির প্রতি মনোনিবেশ করিতে বলি। এ বিষয়ের কোন সাধারণ বক্তব্য পাঠককে হয় তো এমন কোন কিছুই শিখাইতে পারিবে না যাহা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার জানা নাই, তাহা তাঁহার সম্মুখের পথে আলোক প্রদান না করিয়া বরং অনেক ক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে আশ পাশের পথে ঘুচির মধ্যে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইবে। আর আর কার্য্যের ন্যায় যুক্তিও—করিয়া যেমন বুঝানো যায়—বলিয়া তেমন বুঝানো যায় না। তত্ত্বজ্ঞানের অসন্তোষ-জনক অবস্থার কারণ তবে এইটিই স্থির যে, তাহা যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হয় না।

যতক্ষণ না তত্ত্বজ্ঞান যুক্তিযুক্ত হইবে ততক্ষণ তাহা হইতে কোন সুফলের প্রত্যাশা করা বৃথা।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তত্ত্বজ্ঞানকে গোড়া হইতে শক্তরূপে প্রমাণ করিয়া তোলা হইতেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে তাহার আর নিষ্কৃতি নাই; ততক্ষণ পর্য্যন্ত বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে কলহের বিরাম-প্রত্যাশা দূরে থাকুক্, একজন এক কথা বলিতেছেন আর-একজন আর-এক কথা বুঝিতেছেন—এইরূপ বিপরীত অর্থ-বোধই ক্রমাগত চলিতে থাকিবে। সব নাবিক ভিন্ন ভিন্ন আদেশ অনুসারে, ভিন্ন ভিন্ন পথে, ভিন্ন ভিন্ন বায়ুর বলে, পা'ল ভরে চালাইতেছে; আর, প্রতিজনেই আর-সকলের সহিত এই বলিয়া কলহ করিতেছে "কেন তোমরা আমার সহিত এক পথে না যাও।" ইহা অপেক্ষা আরো উত্তম রহস্য এই যে, তত্ত্বজ্ঞানের এমন কোন দ্বন্দ্ব-ক্রীড়া নাই যাহাতে উভয় পক্ষ একই খেলায় প্রবৃত্ত; দুই খেলোয়াড়ের মধ্যে জয় পরাজয়ের খুবই ধূম-ধাম চলিতেছে, অথচ উভয়ের মধ্যে একজন খেলিতেছেন সতরঞ্চ—আর এক জন খেলিতেছেন পাশা,—এ জয়ই বা কিরূপ, আর এ পরাজয়ই বা কিরূপ, তাহা বুঝা-ই যাইতেছে। এইরূপ যুক্তি-ছাড়া সংগ্রামের মূল কারণ আর কিছুই নহে—তত্ত্বজ্ঞানকে গোড়া হইতে যুক্তি-দ্বারা প্রমাণ করিয়া তোলা হয় নাই, তাই বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে এমন কোন সাধারণ বিবাদ-স্থল

খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যাহা লইয়া উভয়ের মধ্যে বোঝা-পড়া চলিতে পারে।

তত্ত্বজ্ঞানের মুখ-কোষ অর্থাৎ মুকোষ।

সময় যত অগ্রসর হইয়াছে, তত্ত্বজ্ঞানের দশা তত ভালর দিকে না যাইয়া মন্দের দিকেই অবনত হইয়াছে। ইহা তো হইবেই; গোড়ায় মূলতত্ত্ব-সকলের রীতিমত অবধারণ নাই—কঠোর যুক্তি দ্বারা আট ঘাট বন্ধন করা নাই—অথচ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকে আগে আগে তাড়াইয়া লইয়া চলা হইতেছে, এরূপ করিলে সত্যের গাত্রে বস্ত্র যাহা জড়ানো আছে তাহা তো আছেই, তাহার উপর আরো বস্ত্রের পর বস্ত্র জড়াইয়া দেওয়া হয়। তত্ত্বজ্ঞানের প্রত্যেক জিজ্ঞাস্যই আর এক জিজ্ঞাস্যের আবরণ। চরম (আসল ধরিতে গেলে আদিম) জিজ্ঞাস্যটিতে উপনীত হইতে হইলে ঐ সমস্ত আবৃত-আবরক জিজ্ঞাস্য-গুলিকে সরাইয়া ফেলা আবশ্যক। বহিরাবরণটি সর্ব্বাগ্রে আমাদের সম্মুখে দেখা দেয় বটে, কিন্তু তাহাকে এবং তাহার নীচের নীচের সমস্ত আবরণ গুলিকে যে পর্য্যন্ত না আমরা সরাইয়া ফেলিতে পারি, সে পর্য্যন্ত আমরা তাহাদের কাহারো প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে পারি না। এক জিজ্ঞাসুর পর আর এক জিজ্ঞাসু যিনিই আসেন—তিনি কেবল সর্ব্বোপরিস্থ আবরণটি একটানে সরাইয়া ফেলিয়াই ক্ষান্ত হ'ন,—সমস্ত আবরণগুলিকে যে একে একে সরাইয়া ফেলা আবশ্যক, সে দিকে কাহারো ভ্রূক্ষেপ নাই; ইহার ফল এই হয় যে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তি প্রথম আবরণটির জটিলতা মোচন করা দূরে থাকুক—তাহার গাত্রে এক পোঁচ রঙ মাখাইয়া দে'ন, নৈসর্গিক আবরণের উপর স্বদত্ত একটি আবরণ চাপাইয়া রাখেন,—ইহাতে সত্যের পথ পূর্ব্বাপেক্ষা আরো জটিল হইয়া উঠে। এই কারণে এখন, এমন কোন প্রশ্নই লোকের সম্মুখে উপস্থিত হয় না যাহা নৈসর্গিক এবং কৃত্রিম নানা ছদ্মবেশে স্তরে স্তরে আবৃত নহে; আর, এই মুকোষের সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়িতেছে; লোকে সতত এতাই মনে করে যে, জড় বস্তু আছে কি না—এও একটা তত্ত্বজ্ঞানের জিজ্ঞাস্য বিষয়, অথবা কোন কালে জিজ্ঞাস্য বিষয় ছিল। এ জিজ্ঞাস্যটি আর কিছুই নয়—রাশি-রাশি মুকোষের একটা স্তবকপুঞ্জ মাত্র। সেগুলিকে না সরাইলে প্রকৃত তত্ত্বের মুখ-দর্শন পাওয়া দুর্ঘট। আর একটি অবচ্ছায়া—যাহাকে তত্ত্বজ্ঞানীরা "সম্বন্ধাতীত" এই নাম প্রদান করিয়া সুখী হ'ন—তাহাও একটি মুকোষ (এমন কি মুকোষের সমস্ত দোকানকে-দোকান বলিলেও হয়); কিন্তু ঐ শব্দটির অর্থ তাঁহারা ঠিক চা'ন কি যে বোঝেন — রাশি রাশি লাজ-লজ্জার নিপীড়নের ভিতরে বস্তুটা যে কি—এ বার্ত্তাটি কেহই লাভের দাবী করিয়া আমাদিগকে বলেন না, যাঁহারা ঐ মুকোষমধ্যে অজ্ঞাত-বার্ত্তাটিকে তাড়াইয়া গিয়া স্তূপাকৃত করেন, তাঁহারাও তাহা বলেন না; ভার বাহিয়া ভাল কথায় উহার সহিত আলাপ করেন, তাঁহারাও তাহা বলেন না। ফলে, একথা সুনিশ্চিত যে, এই দুই-সহস্র বৎসর ধরিয়া কোন মনুষ্য একটিও দার্শনিক জিজ্ঞাস্যের রক্ত-মাংসের সজীব মূর্ত্তি আজ পর্য্যন্ত দেখেন নাই।

দর্শনের দুর্গ্রহ।

এরূপ যে, কেন হয়, তাহার মীমাংসা এই;—লোকে ভাবে যে, সম্মুখে পদার্পণ করিলেই তত্ত্বজ্ঞান-পথে অগ্রসর হওয়া যায়; কিন্তু বাস্তবিক এই যে, সে পথে অগ্রসর হইতে হইলে পিছাইয়া চলা আবশ্যক। আগে আমরা মূলে না যাইয়া অন্তে পৌঁছিবার জন্যই প্রয়াস পাইয়াছি। তত্ত্বজ্ঞানীরা মূলতত্ত্ব-সকল করায়ত্ত না করিয়াই সিদ্ধান্তের

[illegible]সংসার প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহার প্রকৃত বিবরণ এই;—দার্শনিক জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় মণ্ডলাকৃতি,—কিন্তু সমুদায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষা হইলেও তাহার ন্যায় অত বড় একটা বিপুলায়তন চক্রপরিক্রিয়া মণ্ডল হইয়া উঠে না। সমুদায় চিন্তার বীজ-ধাতু, সমুদায় যুক্তির মূলতত্ত্ব, সমুদায় জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী মূল উপাদান, সত্যের সমস্ত চাবি, প্রথমে আমাদের পায়ের নীচেই মাটি-চাপা থাকে; কিন্তু তখন তাহার আবিষ্কারে আমাদের অধিকার নাই। অগ্রে আমাদিগকে সমস্ত মণ্ডলটি পরিভ্রমণ করিতে হইবে,—দর্শনের সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিশ্রান্ত-পদে পর্যটন করিতে হইবে। এই জন্য আমাদের প্রত্যেক পদক্ষেপই আমাদিগকে লক্ষ্য স্থান হইতে দূরে দূরে লইয়া যায়। কিছুকাল পরেই সত্যের বীজ ধাতু সকল—যাহা আমরা অস্ফুট আলোকে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছি—তাহা বহুদূর পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, অথচ আমরা মনে করি যে তাহা সম্মুখস্থিত দিক্-চক্রবালে ঝিকি বা ঝিক্মিক্ করিতেছে। পরিত্যক্ত গৃহদেবতার ন্যায় তাহাকে আমরা অনেক দূর ছাড়িয়া আসিয়াছি, অথচ তাহা আমরা জানি না। তবুও আমরা সম্মুখে ভর করিয়া এমন একটা পথে চলিতে থাকি—যাহা ঠিক্ পথও বটে—না-ও বটে; ঠিক্ পথ নয়, কেন না প্রত্যেক পদ-ক্ষেপেই আমরা সত্য হইতে দূরে পড়ি; ঠিক্ পথ, কারণ তাহা ভিন্ন আর আমাদের গতি নাই। যাইতে যাইতে যখন যেখানে আমাদের পা থামে, সেই স্থানেই আমাদের আতঙ্ক ধাঁদা ও ভয় দাঁড়াইয়া দেয়। অকূল দর্শন-সাগরের মধ্য-পথ পার হইতে না হইতে আমাদের মন একেবারেই দমিয়া যাইতে পারে। মণ্ডলের উপরি ভাগ হইতে অধোভাগে উত্তীর্ণ হইলে সংশয়ের ঘন-ঘটা আমাদের পথে অন্ধকার করিয়া বসিতে পারে এবং নিরাশার কালিমা আমাদের [illegible] [illegible] করিতে পারে। এখন যে আমরা পিছু ফিরিব তাহারও জো নাই। এখন আমরা [illegible] উদ্‌যাপনে প্রবৃত্ত। এখন সমস্ত বিঘ্ন-[illegible] মধ্য দিয়া ভিড় ঠেলিয়া চলা ভিন্ন [illegible] পায় নাই। ভৌতিক জগতের ন্যায় দার্শনিক জগৎ একটা গোল পদার্থ; যে সময়ে পরিব্রাজক মনে করিতেছেন যে, তিনি মনুষ্যের অধিকার ছাড়াইয়া দূরত্বের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছেন, তাহার পরক্ষণেই তিনি দেখেন যে, তিনি আপন গৃহে বিরাজমান। তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার তাঁহার সেই জন্মস্থানে আসিয়াছেন। আবার তিনি তাঁহার চির-পরিচিত পুরাতন গার্হস্থ্য দ্রব্য-সামগ্রীতে পরিবৃত। কিন্তু এখন চির-পরিচয়ের অবজ্ঞা অন্তর্দৃষ্টির অভিজ্ঞতায় পরিণত হইয়াছে; তত্ত্বজ্ঞানের পরিশ্রম তাঁহাকে সবল করিয়াছে; এবং তত্ত্ব-চিন্তার ফল তাঁহাকে বিজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে। এখন তিনি ভূমি খনন করিয়া সত্যের চাবি উদ্ধার করিবার অধিকারী; এখন তিনি জ্ঞানের বীজ-ধাতু-সকল দেখিতে এবং দেখাইতে সমর্থ। এখন তিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে নূতন এক জ্ঞান-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত দেখেন। প্রথম তিনি যে জ্যোতিতে দেখিতেন—এ জ্যোতি তাহা অপেক্ষা বহু-পরিমাণে বিশুদ্ধ এবং অক্ষুণ্ণ। এইখানেই তত্ত্বজ্ঞানে এবং সহজ জ্ঞানে কোলাকুলি হয়।

সকলের গোড়ার তত্ত্ব-গুলি সকলের শেষে বাহির হয়।

তত্ত্বজ্ঞানের যুক্তিহীন এবং সাধারণতঃ অসন্তোষ-জনক অবস্থার কারণ এই যে, কোন তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি মূলে পৌঁছান নাই; ইহারও কারণ দর্শানো যাইতে পারে—যদিও সে কারণের জন্য কোন মনুষ্যই

দায়া নহে কেন না তাহা প্রকৃতির একটি অবশ্যম্ভাবী নিয়ম; সে কারণ এই যে, প্রকৃতির গণনাতে যাহা প্রথম, [illegible]র গণনাতে তাহা চরম। [illegible] বিবেচনা একদিকে যেমন [illegible] অপবাদের দায় হইতে অব্যাহতি দেয়, আর-এক দিকে তেমনি—"আজ পর্যন্ত কেন তত্ত্বজ্ঞানের বর্ণ-পরিচয়ও সাঙ্গ হইল না,—কেনই বা যুক্তিহীন তত্ত্ব-শাস্ত্রের এত সংখ্যা-বাহুল্য—অথচ তত্ত্ব-জ্ঞানের ক-খ শিক্ষা এখনো বাকি পড়িয়া আছে?" ইহার কারণ স্পষ্টাক্ষরে প্রদর্শন করে। উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়টির মর্ম্ম আরো অধিক পরিস্ফুট হইবে।

ভাষা এবং ব্যাকরণের উদাহরণ।

যত প্রকার মূলতত্ত্ব আছে সমস্তই জ্ঞানে উদ্ভাসিত এবং স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইবার বহু-পূর্ব্বে লোকসমাজে আপনাদের প্রভাব সমর্থন করে ও বিস্তীর্ণরূপে এবং বলবৎরূপে কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। ভাষা ইহার একটি প্রধান উপমাস্থল। ব্যাকরণের মূলতত্ত্ব-গুলি ভাষার মূলে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহার সংগঠনের উপর কর্ত্তৃত্ব করে; কিন্তু ইহারা-সকলে অন্ধকারেই স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করে। ইহাদের কর্ত্তৃত্ব-বশে ভাষা যখন আকার-পরিগ্রহ করিতেছে, তখন কোন মনুষ্যেরই বুদ্ধি উহাদের গুপ্ত কার্য্যের অভিসন্ধি খুঁজিয়া পায় না। তথাপি যিনিই ব্যাকরণ-যোগ্য-রূপে ভাষা ব্যবহার করেন, তিনিই ঐ সকল মূলতত্ত্বে সম্ভূত—অথচ তিনি উহাদের অস্তিত্বের বিন্দু-বিসর্গও উপলব্ধি করেন না। উহাদের উপস্থিতি এবং [illegible] হইবার বহু-পূর্ব্বে উহাদের কার্য্য [illegible] প্রভাব অনুভূত হয়। ভাষার [illegible] সাধিত [illegible] গুলি গুপ্ত; উহার অবয়ব-[illegible] লোকের অগোচর। নির্জ্জন গ[illegible]-হিত [illegible] বৎসরের [illegible] ন্যায় অলক্ষিত ভাবে অলক্ষ্যে এক ভাষার [illegible] কাণ্ড গাত্রোত্থান করিয়া উঠে, তেমনি তাহার শাখা-প্রশাখা। আগে কেহই বীজ নিক্ষিপ্ত হইতে দেখে নাই—অভিনব অঙ্কুরোদ্গম কাহারো চক্ষে পড়ে নাই—কাহারো হস্ত আরণ্যক শিশুটির মূলে জল-সিঞ্চন করে নাই, ক্রম-বিবর্দ্ধিত দেহ-পুষ্টি ও ছায়া-বিস্তারের কোথাও কোন লিখিত নিদর্শন রক্ষিত হয় নাই—আগে এসব কিছুই হয় নাই; কিন্তু তাহার পর যখন চারিদিকের অপভাষা-গুলি মরিয়া নিঃশেষিত হইল, অকস্মাৎ যখন ভাষাটির পূর্ণ অবয়ব আবরণ-মুক্ত হইয়া স্বীয় মহিমায় সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল, তাহার পল্লবে পল্লবে যখন শূর-বীর পুরুষগণের কবিতা, তত্ত্বজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র, পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, সভ্য জগতে যখন সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য এবং দর্শনের ফল [illegible] নিপাতিত হইতে লাগিল—তখন তাহার মূলের খোঁজ পড়িল।

বেলা অনেকটা অতিবাহিত হইয়া গেলে তবে ভাষার বীজতত্ত্ব-গুলির সন্ধান মেলে ও তাহাদের ব্যাখ্যা বিবৃত হয়। এই সকল বীজ-তত্ত্বেরই প্রসাদাৎ ভাষার উৎপত্তি এবং উন্নতি, ইহারাই ভাষা-সংগঠনের মূল-নিয়ামক; অথচ এরূপ ঘটনা কিছুই বিচিত্র নহে যে, ঐ সব মূল-তত্ত্ব আলোকে উদ্ভাসিত ও ব্যাকরণে লিপিবদ্ধ হইবার বহু-পূর্ব্বে ভাষার লৌকিক ব্যবহার লুপ্তাবশিষ্ট পরিণত হইয়াছে। এমন যে আদিম [illegible] ক-খ-গ, ইহাও ভাষার উৎপত্তি এবং প্রচারের সহস্রাধিক বৎসর পরে তবে লোকের মনে ও রসনায় স্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে; অথচ ঐ অক্ষর-গুলি, বাক্যের ঐ সার-ভূত বীজ-গুলি, ভাষার উৎপত্তির গোড়াতেই ছিল।

ন্যায়-শাস্ত্রের উদাহরণ।

ন্যায়-শাস্ত্র আর-একটি দৃষ্টান্ত। [illegible]

যের প্রতি তাহার যে স্বৈর গতি, ধর্ম্ম তাহা ধারণ বা রোধ করে। ইহাই ধর্ম্মের প্রথম লক্ষণ। কিন্তু অনেকে মনের এই স্বৈর গতি নিরোধ করিবার নিমিত্ত শরীরশোষণের ব্যবস্থা করেন। যদি ইহা বল যে শরীর দুর্ব্বল হইলে মনও অনেকটা নিস্তেজ হয় এবং সে অবস্থায় তাহাকে যে দিকে ইচ্ছা নিয়োগ করা যাইতে পারে; কিন্তু বাস্তব ইহা দ্বারা ধর্ম্মবলের একটী ঘোর অবমাননা করা হয়। ধর্ম্ম স্বয়ং এই কার্য্যে অসমর্থ বলিয়া যেন একটা বাহ্য শক্তির আবশ্যকতা স্বীকার করা হয়। আর যদিও স্বীকার কর শরীরশোষণ ধর্ম্মের একটী অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য, ইহাও ঠিক নয়। কারণ ধর্ম্মের প্রভাব মনে যে গতি আনে মনের পক্ষে ইহা তো শিক্ষা অর্থাৎ অন্তঃসংস্কার, ইহা কিছুতেই যাইবার নয়। কিন্তু শরীরশোষণ প্রভৃতি উপায় মনে যে গতি আনে তাহা বাহ্য ব্যাপার মাত্র। ইহা শিক্ষাও নয়, সংস্কারও নয়। সুতরাং কারণের অভাবে কালে এই কার্য্যের নাশও আছে। সুতরাং যদিও আশু ইহা দ্বারা কোন ফল হয় কিন্তু তাহার স্থায়িতা নাই। পুরাণ পাঠে দেখা যায় কোন ঋষি দীর্ঘ কাল অনশনে শরীর শোষণ পূর্ব্বক গ্রীষ্মের উত্তাপ, বর্ষার বৃষ্টি ও দুরন্ত শীত সহ্য করিয়া মনোনিগ্রহে যত্ন করিতেছেন কিন্তু স্ত্রীসৌন্দর্য্য এক নিমেষে তাঁহার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিল। ফলত মনোনিগ্রহের ইহা যে প্রকৃত পথ নয় প্রাচীন ঋষিরা ইঙ্গিতে তাহাই বলিয়াছেন। আরও একটী কথা এই, তাহাই প্রকৃত শক্তি যাহা সহস্র সহস্র বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে [illegible] পাইতে পারে। এই জন্য [illegible] নিরোধের পক্ষে অনশনকে [illegible] নাই। তিনি ইহা দ্বারা [illegible] শিষ্যগণের বিশ্বাসভাজন হন। কিন্তু [illegible] স্থির বিশ্বাস মন নিরোধের পক্ষে ধর্ম্মবলই পর্য্যাপ্ত। আর মনুও বলিয়াছেন শরীরশোষণ মনের শিক্ষার পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায় নয়। অতএব ধর্ম্মই আমাদের মনোবৃত্তির বিক্ষেপ ভাব দূর করিবার এবং তাহাকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া বিষয়াতীতের প্রতি লইয়া যাইবার পক্ষে যথেষ্ট। ধর্ম্মের এই প্রথম লক্ষণ।

দ্বিতীয় লক্ষণ প্রেরণা। অর্থাৎ কর্ত্তব্যার্থে নিয়োগ। মনুষ্যের কি সঙ্কট অবস্থা। তাহার অতীতের কোনও পদাঙ্ক নাই, ভবিষ্যৎ নাতিপরিস্ফুট আলোকে দৃশ্যমান একটা গভীর অন্ধকার। আর তাহার বর্ত্তমানে এই বিস্তীর্ণ সংসার। সংসার যে কি প্রহেলিকা কিছুই বুঝিবার যো নাই। ইহাতে কেবলই বিচিত্রতা। প্রীতি ও বিচ্ছেদ, পাপ ও পুণ্য, হর্ষ ও বিষাদ, স্বাস্থ্য ও রোগ এইরূপ নানারূপ বিরোধি ভাব ইহাতে পর্য্যায়ক্রমে আসিতেছে ও যাইতেছে। মনুষ্য নানা প্রকার জটিল কার্য্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ। মনুষ্য-সমাজেরও আপাদমস্তক পরস্পরের বিরোধি স্বার্থে জড়িত। এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মের প্রেরণা-শক্তি তাহাকে রক্ষা করিতেছে। আমরা ধর্ম্মের উদার বক্ষে সকল স্বার্থকে সমবেত দেখি এবং তাঁহার প্রেরণা অনুসারে চলিয়া থাকি। ইহাতে স্বার্থের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ভঞ্জন হয় এবং সংসারের স্থিতিও অব্যাহত থাকে। ইহাই ধর্ম্মের প্রেরণা।

এখন ধর্ম্মকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া দুইটী ভাব পাইলাম। প্রথম ধারণা দ্বিতীয় প্রেরণা। ধারণা-গুণে মনুষ্য মনের প্রভু হয় এবং প্রেরণা-গুণে সে কর্ত্তব্যে উদ্বোধিত হইয়া থাকে। আবার ধর্ম্মের এই দুই উপাদান মনুষ্যের চরিত্রের প্রতি কারণ হইয়াছে। চরিত্র বলিতে কার্য্য বুঝায়। সুতরাং চরি-

ত্রের ভিতরও দুইটী শক্তি অলক্ষিত ভাবে রহিয়াছে। প্রথম, বুদ্ধির বহুশাখা হইতে একতর কোটিতে অধ্যবসায়। যদি তোমার বুদ্ধি বহু বিষয়ে বিক্ষিপ্ত থাকে তবে সেইরূপ অস্থিরতার অবস্থায় তোমার কার্য্য প্রবৃত্তি হইবে না। একতর কোটিতে—কোন উদ্দেশ্যে তোমার স্থির হওয়া চাই। ফলত ইহা ধর্ম্মের ধারণাগুণে হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বিচার পূর্ব্বক কার্য্য। অর্থাৎ অকার্য্য হইতে কার্য্যকে পৃথক করিয়া তাহার অনুষ্ঠান। ইহা ধর্ম্মের প্রেরণাগুণে হইয়া থাকে। এক্ষণে কথা এই, সকলে চরিত্রবান হয় না কেন। ইহার এক উত্তর স্বার্থপরতা। স্বার্থপরতায় আশুতৃপ্তি আছে। কিন্তু চরিত্রবত্তায় অনেক ত্যাগস্বীকার চাই। আবার এই ত্যাগস্বীকার যে কিরূপ কঠিন তাহা বুঝাইতে হইলে মনুষ্যপ্রকৃতির বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। জগতে দুই প্রকার ভাব আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি কঠোর আর কতকগুলি কোমল। যেগুলি আশুতৃপ্তিকর প্রবৃত্তির বিরোধী তাহা কঠোর। ইহাকে আমরা নীতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। আর যেগুলি আশুতৃপ্তিকর প্রবৃত্তির অনুকূল তাহা কোমল। ইহাকে ভোগ নামে নির্দ্দেশ করিলাম। মনুষ্যপ্রকৃতি এই দুই ভাবের ক্রীড়নক হইয়া আছে। কিন্তু যে প্রকৃতি আমূলত কঠোরতার লৌহময় ক্রোড়ে লালিত হয় সে কোমলতার অভাব সহিতে পারে। আর যে প্রকৃতি আমূলত কোমলতার প্রলেপাস্তরণে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করে তাহার পক্ষে কঠোরতা সহ্য হয় না। জগতে এই ভাবই বলবৎ। তবে কখন কখন যে ইহার ব্যভিচার দেখা যায় তাহা শিক্ষার ফল সুতরাং বিরল। এখন দেখ ত্যাগস্বীকার বলিতে কি বুঝায়? না, জগতের যে সমস্ত কোমল ভাব মনকে অধিকার করিয়া আছে, যাহা আশুতৃপ্তিকর সেই গুলির সম্বন্ধত্যাগ। ইহা অবশ্য কঠিন ব্যাপার। কারণ যে প্রকৃতি আমূলত কঠোরতা দূর হইতে দূরে পরিহার করিয়া আসিয়াছে আশুতৃপ্তিকর কোমল ভাবের বিনিময় তাহার কিছুতেই সহ্য হয় না। ফলত ইহা যদিও দুষ্কর কিন্তু অসম্ভব নহে। স্থলে এই বিরোধি ব্যাপারের মীমাংসা আছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে আমূলত একটী কথা প্রয়োগ করিয়াছি। তাহার উদ্দেশ্য এই যে বাল্যই অভ্যাসের প্রকৃত কাল। বাল্যের সংস্কার পাষাণে অঙ্কিত রেখার ন্যায় কিছুতেই যায় না। যদি বাল্যকাল হইতে কঠোর ভাবের সহিত পরিচয় হয়, তাহা হইলে যৌবনে ত্যাগস্বীকারের কিছুমাত্র যন্ত্রণা নাই। এই জন্য প্রাচীন ভারতে বাল্যেই ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা ছিল। শৈশব কাল হইতে কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি প্রবৃত্তি গুলিকে দমন করিবার জন্য গুরু-মুখাপেক্ষী ভিক্ষায়, তেজোধাতু নিরোধ ও বিলাসকল্প পরিহারের ব্যবস্থা দেখা যায় এবং আপনার স্বার্থকে তুচ্ছ করিয়া অন্যের স্বার্থকে বলবৎ করিতে দেখা যায়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় বাল্য হইতে এইরূপে পৃথিবীর কঠোর ভাব সকল আয়ত্ত করিত এবং ইহারই বলে যৌবনের উদ্দাম প্রবৃত্তির উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিত।

এখন বলিতে পার—নৈতিক কঠোরতা বাল্যে কিরূপে সহনীয় হয়। আমি এই টুকু বুঝাইবার নিমিত্ত প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যের কথা তুলিয়াছি। পূর্ব্বে ধর্ম্ম ও নীতিকে এক পর্য্যায়ে বুঝিত। তখন বাল্য হইতে কেবল যে ইহার শিক্ষা হইত তাহা নহে শিক্ষার সহিত অনুষ্ঠানও অপরিহার্য্য ছিল। অভ্যাসের বল অতি চমৎকার। আজ আমার যে কার্য্য ভাল লাগিতেছে না অভ্যাসের বলে কাল তাহাই প্রীতিকর হইয়া থাকে। বিশেষত বাল্যে এই অভ্যাস অতি সহজে হয়। একটী লতা বা শাখাকে অপরিণত অব-

ন্যায় তুমি যে দিকে ইহা নোওয়াইতে পার কিন্তু পরিণত হইলে আর পারিবে না। ফলতঃ মনুষ্যের প্রকৃতিও তদ্রূপ। মনুষ্য যখন তরুণ থাকে তখন তাহাকে যে দিকে প্রসর দিতে চাও পারিবে কিন্তু যখন যৌবনের নানাভাব আসিয়া তাহার উপর আধিপত্য করিতে থাকে, যখন সে সেই সকল ভাবে পুষ্ট হয় তখন তাহাকে সমত করা বড় সুখসাধ্য হয় না। অতএব বাল্যই কঠোরতা সহ্য হইবার প্রকৃত কাল।

কিন্তু এখনকার সমাজের অবস্থা কি শোচনীয়। অবশ্য, লোকে ইহা বুঝিয়াছে যে বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু সূক্ষ্ম বুঝিতে গেলে ধর্ম্মের শিক্ষাতে নয় অনুষ্ঠানেই কঠোরতা। বর্ত্তমানে তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়া থাকে। একে তো এইরূপ কঠোরতা শিক্ষায় উপেক্ষা তার উপর আবার ভীষণ বাল্য-বিবাহ। সুতরাং এই ভোগপ্রবণ কালে চরিত্র কিরূপে সম্ভব হইবে। আর যদি চরিত্রই না থাকে তবে পৃথিবীতে ধর্ম্মের সার্থকতা কি, উপযোগিতাই বা কি।

[illegible]বাজার ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ব্যাখ্যাত।

আমি আজ কি বলিতে আসিয়াছি। আজ সকলে এখানে আনন্দধামের চির নূতন চির পুরাতন বার্ত্তা শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আমি কে। আমি কি জানি। আমার বলিবার কি অধিকার আছে। আমি সম্বৎসরে কি কাজ করিয়াছি যে নববর্ষের [illegible] কাজে প্রবৃত্ত হইবার জন্য সকলকে [illegible] দিতে পারি, এমন কি অমৃত সঞ্চয় করিয়াছি যে, আজ নববর্ষের দিনে আপন হৃদয়ের আনন্দ অংশ সকলকে বিতরণ করিতে আসিয়াছি। আমি কাহাকেও প্রবঞ্চনা করিতে চাহি না। আমি কিছুই করি নাই, আমি এই পৃথিবীতেই ছিলাম—তবে আজ আমি আনন্দধামের বার্ত্তা কি বলিতে আসিয়াছি।

কেহ হয়ত আমাকে বলিবেন তুমি বুঝি শুনিয়া আসিয়াছ। যে সকল মহাপুরুষেরা ব্রহ্মধামে বাস করিতেছেন তুমি বুঝি তাঁহাদের কাছে কিছু শুনিয়া আসিয়াছ, মুখে মুখে সকলের কাছে তাই প্রচার করিতে চাও। তাই বা কই শুনিলাম। বিনীত হইয়া ধৈর্য্য ধরিয়া তাই বা শুনিতে পারিলাম কই। দিবারাত্র আপনার কথা শুনাইতেছি বলিয়া তাঁহাদের কথা শুনিতে আমি অবসর পাইলাম কই। তবে আমি আনন্দধামের বার্ত্তা কি বলিতে আসিয়াছি।

তবে কি সে-সকল কথা সকলেই জানে সেই কথাই আমি সকলকে জানাইতে আসিয়াছি। মনুষ্যেরা কোন্ বৃহৎ সত্য না জানে। সত্যের মহত্ত্ব, প্রেমের মহত্ত্ব, দয়ার মহত্ত্ব, এ কে না জানে। অথবা, এ কেই বা জানে। এ সকল কথা যদি জানাই হইবে তবে চিরদিন ধরিয়া বলিতে হইতেছে কেন। সত্যমেব জয়তে নানৃতং, সত্যেরই জয় হয় মিথ্যার জয় হয় না, এ কথা চির দিন শুনিতেছি তবু বুঝিতেছি না কেন? আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি, আত্মবৎ সর্ব্বজীবকে যিনি দেখেন তিনিই বাস্তবিক দেখেন—এ কথা কত দিন হইতে শুনিতেছি কিন্তু অনুভব করিতেছি না কেন? এই সকল পুরাতন কথা প্রতিদিন মানুষকে নূতন করিয়া শিখিতে হইতেছে, তবে ইহাদিগকে পুরাতন কথা জানা [illegible] কি করিয়া বলিব। [illegible] জানেন [illegible] বলুন, তুমি [illegible] অনুভব করেন তিনিই [illegible]

জানি না, আমি সম্পূর্ণ অনুভব করি না, আমি বলিতে পারিব না।

তবে আমি কি বলিব। সাধনার প্রিয়-নিকেতন, সাধুদিগের প্রিয় বিহার-ভূমি, অন্তর্যামী পরম পুরুষের চির বিরাজস্থান আত্মার যে নিভৃত নিলয়, সেই খানেই যাঁহাদের নিত্য যাতায়াত আছে, সেইখান হইতে যাঁহারা জ্যোতিষ্মান হইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর তাঁহারা কিছু বলিতে পারিবেন—আমি এইমাত্র সংসার হইতে আসিতেছি, সংসারের ধূলি লইয়া আসিতেছি, ক্ষুধা নিদ্রা নিন্দা গ্লানি বাসনা লালসা আমোদ প্রমোদ কোলাহলের আবর্ত্তের মধ্য হইতে আসিতেছি, এখনও হৃদয় ধৌত করিয়া আসি নাই, এখনও শুচি হই নাই, শান্ত হই নাই, আমি আনন্দধামের বার্ত্তা কি বলিতে পারি।

সত্য প্রচার করিবার অধিকার সকলের নাই। সত্য অনাহূত কাহারও কাছে আসে না। সত্য উপার্জ্জন করিতে হয় লাভ করিতে হয়, কৃষকেরা যেমন করিয়া ফললাভ করে শস্যলাভ করে তেমনি করিয়া সত্য লাভ করিতে হয়। সত্য স্বপ্নের মধ্যে নাই, চিন্তার মধ্যে নাই, সত্য কার্য্যের মধ্যে আছে। কারণ সত্য ঈশ্বরের সত্য, সত্য আমার সৃষ্টি নহে। ঈশ্বরের কার্য্যের মধ্যে ঈশ্বরের নিয়ম পালন করিয়া চলিলে তবে সত্য লাভ করিতে পারা যায়। তুমি যথার্থ ভালবাস, তবে ঈশ্বরের ভালবাসা বুঝিতে পারিবে; তুমি দয়া কর, ঈশ্বরের করুণা অনুভব করিতে পারিবে; তুমি সত্যাচরণ কর, ঈশ্বরের জগৎ তোমার বিরুদ্ধে কথাটি কহিবে না। সেবকের নিকটে প্রভুর সংবাদ পাওয়া যায়, ঈশ্বরের যিনি সেবক তাঁহার কাছে ঈশ্বরের সত্য পাইবে। ঈশ্বরের সেবক কে? যিনি জগতের সেবা করেন, যিনি পিতামাতার সেবা করেন, প্রতিবেশীকে সাহায্য করেন, যিনি সমস্ত জগৎকে প্রীতি করেন আর যিনি কেবল আত্মসেবা করেন তাঁহার কাছে সংশয়ের কথা শুনিবে, আনন্দের কথা শুনিবে না; তাঁহার কাছে বৃহত্ত্বের প্রতি অবিশ্বাস ও ক্ষুদ্রত্বের প্রতি বিশ্বাস, জগতের প্রতি সন্দেহ ও নিজের প্রতি প্রত্যয় শুনিতে পাইবে। তিনি বলেন, বিশ্বের যাহাতে চলে আমার তাহাতে চলে না, তিনি বলেন, প্রেম জগতের নিয়ম কিন্তু স্বার্থপরতা আমার নিয়ম।

সত্যের চির-উৎসারিত অনন্ত প্রস্রবণের সহিত যাঁহাদের হৃদয়ের যোগ আছে তাঁহারাই সত্য পাইতে পারেন। হৃদয়ের মধ্যে বৃহৎ গহ্বর খনন করিয়া যে, আমরা কিছুদিন ব্যবহারের মত সত্য ধরিয়া রাখিতে পারি তাহা পারি না। সত্যের চির-প্রবাহিত প্রস্রবণের সহিত আমাদের হৃদয়ের চিরযোগ রক্ষা করিতে হইবে। সূর্য্যের নিকট হইতে যেমন আমাদিগকে চিরদিন উত্তাপ আলোক গ্রহণ করিতে হইতেছে, কোন কালেই বলিতে পারি না, "যথেষ্ট হইয়াছে, আর আবশ্যক নাই, এখন কিছুদিন চলিয়া যাইবে, এখন কিছুদিন আমি আপন উত্তাপে উত্তপ্ত থাকিব, আপন আলোকে চারিদিক আলোকিত করিয়া রাখিব"—তেমনি দয়ার জন্য, প্রেমের জন্য, সত্যের জন্য চির দিন অনন্তের দিকে অঞ্জলি প্রসারণ করিয়া রাখিতে হইবে। বায়ু পাইবার জন্য যেমন অবিশ্রাম বায়ু-প্রবাহে বাস করিতে হইবে, আলোক পাইবার জন্য যেমন অবিচ্ছিন্ন আলোক-তরঙ্গের সহিত চক্ষুর যোগ থাকা চাই, তেমনি সত্যের জন্য চিরদিন অনন্ত সত্যের সহিত লগ্ন হইয়া থাকিতে হইবে, অসীম সত্যের মধ্যে মগ্ন হইয়া থাকিতে হইবে।

কে সত্য চাহেন। যিনি হৃদয়ের সহিত বলেন, অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যো-

তির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়। আবিরাবীর্ম্ম এধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং। অসৎ হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহা দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর। এই সংসারের চতুর্দ্দিকে এত অসত্য, যে প্রতি দিন অর্জ্জিত অশুভ সত্যের প্রতি ব্যাকুলতাও আমাদের লোপ হইয়া যাইতেছে। এই জন্য ঋষি নিতান্ত ভীত হইয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরের প্রকাশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন —বলিয়াছিলেন "হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও।" আমাদের মধ্যে কে এমন আছেন যিনি যথার্থ আগ্রহের সহিত বলিতে পারেন "আমি কোন অসত্য চাহি না।" বাস্তবিকই কি কোন অসত্যকেই আমরা প্রিয় বলিয়া বরণ করি নাই, আমাদের জীবনের অবলম্বন করি নাই, অসত্যের প্রেমে অভিভূত হইয়া কি আমরা কোন সত্যের প্রতি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিমুখ হই নাই? তবে আমরা মুখে কেবল "অসতোমা সদ্গময়" প্রার্থনা উচ্চারণ করিয়া সত্য লাভের অধিকারী হইব কিরূপে? আমাদের এখানে কে এমন আছেন যিনি হৃদয়ের সহিত বলিতে পারেন "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্" যাহার দ্বারা আমি অমৃত না হইব তাহা লইয়া আমি কি করিব! তা যদি না পারিলাম তবে মুখে "মৃত্যোর্মামৃতংগময়" উচ্চারণ করিয়া অমৃতলাভের অধিকারী হইব কি করিয়া? যাঁহারা হৃদয়ের ব্যাকুলতার সহিত একদিন বলিয়াছিলেন "অসতোমা সদ্গময়" তাঁহারাই আর একদিন বলিয়াছিলেন

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

শোন শোন অমৃতের পুত্রেরা শোন, শোন দিব্যধামবাসীগণ শোন, আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি যিনি অন্ধকারকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতেছেন।—একথা কি আমরা বলিতে পারি।

কিন্তু তবুও ত আমরা তর্ক করিতে ছাড়ি না। তবুও ত আমরা বলিয়া থাকি, অনন্তের মধ্যে সুখ নাই, প্রীতি নাই, অনন্তকে কাল্পনিক সীমার মধ্যে বদ্ধ করিয়া আয়ত্তাধীন করিলে তবে তাঁহাতে সুখ পাই, তবে তাঁহাকে প্রীতি করিতে পারি। যাঁহাকে আমি এখন অনুভব করি নাই, যাঁহাকে পাইবার জন্য হৃদয়ের মধ্যে ব্যাকুলতা অনুভব করি নাই, তাঁহাকে পাইয়া সুখ নাই একথা বলিবার অধিকার আমাদের কি আছে? যাঁহারা তাঁহাকে জানিয়াছেন, তাঁহারাই বলিয়াছেন "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি"—ভূমাই সুখস্বরূপ, অল্পে সুখ নাই। আমরা আমাদের অজ্ঞতা অনভিজ্ঞতা লইয়া সে কথার প্রতিবাদ করিতে যাই কোন্ সাহসে। একথা কে না স্বীকার করে যে, অনন্তস্বরূপকে আয়ত্তাধীন করা যায় না। কিন্তু তিনি আমাদের আয়ত্তের অতীত বলিয়াই তাঁহাতে আমাদের একমাত্র সুখ। যাহা আমরা পাই তাহাতে আমাদের স্থায়ী সুখ নাই, যাহা আমরা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি তাহা আমরা ত্যাগ করিতে চাহি, চিরদিন পাইয়া যাহাকে আমরা চিরদিন শেষ করিতে পারি না তাহাতেই আমাদের আনন্দ। অতএব কে তর্ক করিতে আসিয়াছে যে, অনন্তে সুখ নাই, সীমাতেই সুখ। হায় আমরা সত্য চাহি না, অথচ, সত্যকে লইয়া ছেলেখেলা করিতে চাই।

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

জ্যৈষ্ঠ রবিবার ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭।

আচার্য্যের উপদেশ।*

কোন না কোন সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া কোন না কোন প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশে মনুষ্যেরা একত্র সমাগত হয়। আমরা এখানে আজ কি সম্বন্ধ-সূত্রে সমাগত হইয়াছি—আমাদের প্রয়োজনই বা কি? যে সম্বন্ধ-সূত্রে এখানে আজ আমরা সমাগত হইয়াছি তাহা অতি উচ্চতর সম্বন্ধ। তাহা সেই সম্বন্ধ যাহা আত্মার সহিত আত্মারই সম্ভবে। শরীরের সহিত মনের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা আমাদের কাহারো জানিতে অবশিষ্ট নাই; শরীরে আঘাত লাগিলেই মনে আঘাত লাগে, শরীর ক্লান্ত হইলেই মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, শরীর সুস্থ হইলেই মন প্রফুল্ল হয়। শরীর এবং মনের মধ্যে এই যে সম্বন্ধ ইহাকে আমরা বলি—প্রাণের সম্বন্ধ। কিন্তু আত্মাতে আত্মাতে যে সম্বন্ধ তাহা আরো উচ্চতর সম্বন্ধ—তাহা বিশুদ্ধ প্রেমের সম্বন্ধ। প্রাণ-সূত্রে যেমন মন শরীরে আবদ্ধ হয়, বিশুদ্ধ প্রেম সূত্রে সেইরূপ আত্মা আত্মাতে আবদ্ধ হয়। পুষ্প যেমন বৃক্ষের বন্ধন ছাড়াইয়া উঠিয়া ঊর্দ্ধে বিকসিত হয়, আত্মা সেইরূপ প্রাণের বন্ধন ছাড়াইয়া উঠিতে পারিলেই জয়যুক্ত হয়, তখনই তাহা স্বকীয় মহিমায় বিকসিত হয়—তখনই তাহা হইতে বিশুদ্ধ জ্ঞানের দীপ্তি এবং বিশুদ্ধ প্রেমের লাবণ্য ফুটিয়া বাহির হয়। আত্মার প্রতি মনুষ্যের ভালবাসা স্বভাবসিদ্ধ। মনুষ্য মনুষ্যের শরীর-মন দেখিতে চায় না—আত্মা দেখিতে চায়; নশ্বর শরীরের উপর অবিনশ্বর আত্মাকে জয়-যুক্ত দেখিতে চায়। যে মনুষ্যকে আমরা দেখি যে, তাঁহার নশ্বর শরীর অবিনশ্বর আত্মাকে শৃঙ্খল-বদ্ধ করিয়া পথে ঘাটে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে, তাঁহার প্রতি আমরা ধিক্কার বর্ষণ করি; কিন্তু যাঁহাকে দেখি যে, তাঁহার অবিনশ্বর আত্মা শরীর-মনকে বিশুদ্ধ প্রেমে বশীভূত করিয়া চালাইতেছে—তাঁহার প্রতি আমরা আন্তরিক ভক্তির সহিত মস্তক অবনত না করিয়া থাকিতে পারি না; আত্মার প্রতি মনুষ্যের এইরূপ আন্তরিক ভালবাসা।

* এই উপদেশ শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবে পঠিত হইয়াছিল। সং

সেইরূপ বিশুদ্ধ প্রেমের টান। মনে মনে আমরা বিশুদ্ধ প্রেমের পক্ষপাতী হইলেও অনেক সময় আমরা পথ ভুলিয়া প্রাণের মায়াজালে জড়াইয়া পড়ি। বিশুদ্ধ প্রেম এক সময়ে আমাদিগকে বলিয়াছিল যে শত্রুকে ক্ষমা করিবে, কিন্তু এখন আমরা দৈহিক প্রাণের অধিকারে আসিয়াছি—তাহাকে আমাদের ভয় করিয়া চলিতে হইতেছে; প্রেম বলিয়াছে ক্ষমা করিতে—কিন্তু প্রাণ চায় বিনাশ করিতে—এখন আর আমরা প্রেমের কথায় কর্ণপাত করিতে পারি না। শত্রু-বিনাশ দ্বারা যখন প্রাণ পরিতুষ্ট হইল, তখন আমরা কাঁদিতে বসিলাম "হায়! প্রেমের কথা না শুনিলাম কেন!" পৃথিবীতে প্রেম অপেক্ষা প্রাণের আদর অধিক। মন এবং শরীরের মধ্যে প্রাণের যেরূপ প্রবল বন্ধন—পৃথিবীতে আত্মায় আত্মায় সেরূপ প্রেম-বন্ধন খুঁজিয়া পাওয়া ভার। কিন্তু প্রাণের বন্ধন বালির বাঁধ—প্রেমের বন্ধন অসীম জগতের ভিত্তিমূল। প্রাণের বন্ধন মনুষ্যের ইহ জীবনকেও ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারে না—বিশুদ্ধ প্রেমের বন্ধন মনুষ্যের ঐহিক এবং পারত্রিক সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া আপনার প্রভাব সমর্থন করে। প্রাণ এবং প্রেমের মধ্যে সাদৃশ্য এই যে, প্রাণ-ধারণ যেমন শরীরের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, প্রেম-ধারণ সেইরূপ আত্মার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়; আর, স্বাস্থ্য যেমন প্রাণের অনুকূল, ধর্ম্ম সেইরূপ বিশুদ্ধ প্রেমের অনুকূল; আবার, অস্বাস্থ্য যেমন প্রাণের প্রতিকূল, অধর্ম্ম সেইরূপ প্রেমের প্রতিকূল। প্রভেদ এই যে, প্রাণ কেবল শরীরেরই সঙ্গের সঙ্গী—আত্মার নহে, এ জন্য তাহা অস্থায়ী; বিশুদ্ধ প্রেম আত্মার সঙ্গের সঙ্গী—এ জন্য তাহা চিরস্থায়ী। রোগের ঔষধ অনেক আছে; কিন্তু মৃত্যুর কেবল এক ঔষধ—বিশুদ্ধ প্রেম। বিশুদ্ধ প্রেম সাক্ষাৎ অমৃত—তাহাতে আত্মা সুস্নিগ্ধ সুপ্রশান্ত সুপ্রসন্ন ও অটল বল-শালী হয়—এরূপ হয় যে, মৃত্যু—ভয়ে তাহার নিকটে আসিতে পারে না। বিশুদ্ধ প্রেমের অভাবে আত্মার যে কি হীন-দশা হয় তাহা আর বক্তব্য নহে,—তখন আত্মা কামে কলুষিত ক্রোধে অন্ধ, লোভে লালায়িত এবং মোহে অভিভূত হইয়া, সর্ব্বদাই উন্মত্ত—সর্ব্বদাই অপ্রসন্ন—সর্ব্বদাই মলিন—সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়—শান্তির মুখ এক মুহূর্ত্তও দেখিতে পায় না।

অতএব বিশুদ্ধ প্রেমের সম্বন্ধ-সূত্রে আমরা যে আজ এই পবিত্র স্থানে সমাগত হইয়াছি ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য। এখন আমাদের কি প্রয়োজন—কি কর্ত্তব্য কার্য্য—তাহার প্রতি একবার প্রণিধান করি।

বিশুদ্ধ প্রেমের সম্বন্ধ-সূত্রেই আমরা এখানে সমাগত হইয়াছি, বিশুদ্ধ প্রেমের চরিতার্থতা-সাধনই আমাদের প্রয়োজন। প্রতিজনে একবার আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন "তুমি কি চাও—কঠোর কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলায় বদ্ধ থাকিতে চাও—না তাহা হইতে মুক্তি-লাভ করিতে চাও?" পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গেরা কেমন বেশ-দেখি প্রকৃতির ক্রোড়ে নিরুদ্বেগে শয়ান আছে—আমরা কেন তাহা পারি না? আমাদের শৈশবাবস্থায় আমরা তো বেশ্ ছিলাম—তখন মাতা ভিন্ন আর কাহাকেও জানিতাম না, তখন অগ্নি এবং কর্দ্দম—সর্প এবং রজ্জু—আমাদের কাছে সমান ছিল, আমাদের কোন ভয় ছিল না, আশঙ্কা ছিল না, ভাবনা ছিল না। তখন তো আমরা প্রকৃতির ক্রোড়ে দিব্য নির্ভয়ে শয়ান ছিলাম—এখন কেন আমরা প্রকৃতিকে এত ভয় করিতেছি—প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবার

কোথায় অন্বেষণ করিতেছি? শিশুর অবস্থা অন্য কি ছিল? এ কথার মীমাংসা এইরূপ,—এ কূলের সহিত ও-কূলের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু মাঝ-গঙ্গার সহিত উভয়ের কাহারো সাদৃশ্য নাই,—শিশুর সহিত [illegible]র সাদৃশ্য আছে কিন্তু [illegible]-কর্ত্তার সহিত উভয়ের কাহারো সাদৃশ্য নাই; শিশুর সরল প্রেমের সহিত বিশুদ্ধ জ্ঞান-প্রেমের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু মাঝ-পথের শুষ্ক বিজ্ঞানের সহিত উভয়ের কাহারো সাদৃশ্য নাই। শিশু কার্য্য-কারণের অন্তস্থলে বাস করিতেছে অথচ কার্য্য-কারণের কোন তর্কই রাখে না—অলিতর্কে চন্দ্র ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করে—প্রজ্বলিত অগ্নিকে মুষ্টিগত করিতে যায়। বিশুদ্ধ-প্রেমও কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলাকে অগ্রাহ্য করে—প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করে; তাই বিশুদ্ধ-প্রীতি শাস্ত্রে অহেতুকী বলিয়া উক্ত হইয়াছে,—অহেতুকী অর্থাৎ কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার অতীত; শিশুর অকৃত্রিম সরল-হৃদয়ের সহিত বিশুদ্ধ প্রেমের এইরূপ সাদৃশ্য; কিন্তু উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যও যেমন—প্রভেদও তেমনি; বীজ মৃত্তিকা-গর্ব্বে অন্ধকারে আবৃত—শস্য আলোকে উদ্ভাসিত; শিশুর অমায়িকতা অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন; বিশুদ্ধ প্রীতির অমায়িকতা জ্ঞানজ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্। শিশুর অমায়িকতা এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান-প্রেমের অমায়িকতা এই দুই কূলের মধ্যস্থলে বিজ্ঞানের নদী প্রবাহিত হইতেছে। শিশুর যত বয়োবৃদ্ধি হয় ততই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে। অগ্নিতে দুই একবার তাহার অঙ্গুলি দগ্ধ হইলেই আর সে অগ্নির দিকে অগ্রসর হয় না। অগত্যা তাহাকে কার্য্য-কারণের আধিপত্যে গ্রীবা নত করিতে হয়। কিন্তু মনুষ্য এমন পাত্র নহে যে, সে কার্য্য-কারণের কঠোর আধিপত্য চূর্ণ করিয়া সর্ব্ব করিবে; মনুষ্যের উন্নত গ্রীবা কিছুতেই নত হইবার নহে। মনুষ্য-প্রকৃতি-রূপী দুর্দান্ত অশ্বকে বিজ্ঞান-রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া আপনার অভীষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে। মনুষ্যই বা প্রকৃতিকে জ্ঞানায়ত্ত করে কেন—পশুরাই বা তাহা না করে কেন? সমুদ্র-পোতের নাবিক-গর্ভে যাহারা কারারুদ্ধ থাকে, তাহারা সমুদ্রের তরঙ্গ দ্বারা চালিত হয় অথচ সমুদ্র দেখিতে পায় না, কিন্তু যে ব্যক্তি সমুদ্রতীরে দণ্ডায়মান থাকে সে ব্যক্তি সমুদ্রের তরঙ্গ দ্বারা অবিচলিত অথচ সমুদ্রকে দিগ্দিগন্তরে প্রসারিত দেখিতে পায়। পশু পক্ষীরা প্রকৃতির গর্ভে বিলীন আছে, তাই তাহারা প্রকৃতিকে জ্ঞানায়ত্ত করিতে পারে না,—মনুষ্য প্রকৃতির অতীত প্রদেশে দণ্ডায়মান আছে তাই সে প্রকৃতিকে জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে সমর্থ। বিজ্ঞান-দ্বারা মনুষ্য জগতের কার্য্য কারণ-শৃঙ্খলা দেখিতে পায়—কিন্তু যে কূলে দাঁড়াইয়া মনুষ্য প্রকৃতির এই তরঙ্গ-লীলা অবলোকন করে, সে কূল প্রকৃতির অতীত—বিজ্ঞানের অগম্য; সে কূল বিশুদ্ধ-প্রেমের এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানের গম্য। বিজ্ঞান মনুষ্যের দাস বই নহে—কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞান-প্রেম মনুষ্যের পরম প্রীতিভাজন বন্ধু। যেমন দাসবর্গের সঙ্গে—তেমনি বিজ্ঞানের সঙ্গে—মনুষ্যের সহেতুক সম্বন্ধ,—আর, যেমন হৃদয়ের বন্ধুর সঙ্গে—তেমনি বিশুদ্ধ জ্ঞান-প্রেমের সঙ্গে—মনুষ্যের অহেতুক সম্বন্ধ। দাস কি জন্য? না সেবার জন্য; বিজ্ঞান কি জন্য? না জাহাজ চালাইবার জন্য—ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য—সেতু নির্ম্মাণের জন্য—এক কথায় সেবার জন্য। বিশুদ্ধ-জ্ঞান-প্রেম কি জন্য? এখানে কি-জন্য-জিজ্ঞাসার কোন অর্থ নাই—এখানে জ্ঞান জ্ঞানেরই জন্য—

প্রেম প্রেমেরই জন্য—আর কিছুরই জন্য নহে। বিশুদ্ধ জ্ঞান-প্রেমের উপর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনুষ্যের কোন আপাত-প্রয়োজনীয় কার্য্যসিদ্ধি নির্ভর করে না, কিন্তু তাহার উপর অত্যন্ত একটি গুরুতর বিষয় নির্ভর করে—মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নির্ভর করে,—তাহারই গুণে মনুষ্য, মনুষ্য হয়, তাহা যাহার নাই সে—মনুষ্যই নহে। পশু-পক্ষীরা প্রকৃতিকে চিনিতে পারে নাই, তাই তাহারা প্রকৃতির রাজ্যে নিরুদ্বেগে বিচরণ করিতেছে—কল্য কি আহার করিবে, অদ্য তাহা ভাবে না। কিন্তু মনুষ্য প্রকৃতিকে বিলক্ষণ চিনিয়াছে—তাই সে প্রকৃতির অধিকারে বাস করিয়া কিছুতেই সন্তোষ লাভ করিতে পারে না,—প্রকৃতির অতীত প্রদেশে আপনার একটা বাস স্থানের আয়োজন না করিয়া কিছুতেই নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে পারে না। আমরা প্রকৃতির অতীত প্রদেশের লোক—তাই আমরা প্রকৃতির কঠোর শৃঙ্খলায় প্রপীড়িত হইয়া দিবানিশি ক্রন্দন করিতেছি। আচার্য্য বলেন "সমানে বৃক্ষে পুরুষোনিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ" —জীব শরীরাভ্যন্তরে নিমগ্ন হইয়া নিতান্ত অসহায় ও মুহ্যমান হইয়া—শোক করিতে থাকে; "জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ," যখন সে আপনার সম্ভজনীয় প্রভুকে এবং তাঁহার মহিমাকে দেখে, তখন সে শোক হইতে মুক্ত হয়। আমাদের চিরন্তন মুক্তিদাতা আজ এখানে আমাদিগকে দেখা দিবেন—তাঁহাকে দেখিয়া আমরা বীতশোক হইব—তাই আমরা এই শান্তি-মন্দিরে সমাগত হইয়াছি। আমার পরম আশ্রয় পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া আমরা নির্ভয়ে বিচরণ করিব—ইহাই আমাদের প্রয়োজন।

হে পরমাত্মন্। আজ তোমার আরাধনার জন্য আমরা এই পবিত্র মন্দিরে সমাগত হইয়াছি, তোমার মৃতসঞ্জীবনী শক্তিতে তুমি আমাদিগকে জীবন দান কর। যাহার আলোকে ভক্তজনেরা তোমার দর্শন পাইয়া আনন্দ-সাগরে নিলীন হয় আমাদের অভ্যন্তরে সেই চক্ষু ফুটাইয়া দেও; যাহার গুণে দীন-হীন মর্ত্ত্য মানব তোমার মহিমায় মহীয়ান হইয়া অমর পদবী তুচ্ছ করে, সেই প্রেম তুমি আমাদের হৃদয়াভ্যন্তরে উদ্দীপন কর; আমরা সকলে একাত্মা হইয়া এক মনে তোমার চরণে প্রণিপাত করিতেছি তুমি আমাদের পূজা গ্রহণ করিয়া আমাদের হৃদয়ের চিরাভিলাষ পূর্ণ কর—তোমার অমোঘ শান্তি-বারিতে আমাদের সমস্ত পাপ-তাপ প্রক্ষালিত করিয়া আমাদের আত্মাকে তোমার সহবাসের উপযুক্ত কর,—আমরা তোমার শরণাপন্ন হইতেছি—তোমার বিমল সুখজ্যোতিতে তুমি আমাদের সমস্ত অন্ধকার দূর করিয়া দেও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

দর্শন-সংহিতা।

মূলতত্ত্ব-সকল যদিও তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যন্তরে কার্য্য করে তথাপি তাহারা অলক্ষিত।

এমন-যে শ্রদ্ধেয় শাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞান তাহার কেন এরূপ দশা যে, এই অপরাহ্ণ-কালেও সে তাহার মূলতত্ত্ব-সকলের বিশদ ব্যাখ্যায় বঞ্চিত, এখন হইতে—অন্ততঃ কতক পরিমাণে—বুঝিতে পারা যাইবে। ঐ মূলতত্ত্বগুলি মূলস্থিত তাই উহাদের আবিষ্কারে এত বিলম্ব। কিন্তু যদিও তত্ত্বজ্ঞানের কোন রীতিমত শাস্ত্র নাই, তা' বলিয়া আমরা এরূপ মনে করিতে পারি না যে, উহার মূলতত্ত্ব-সকল এ-যাবৎ কাল শক্তিহীন সত্তাহীন এবং সাড়া-শব্দ-হীন হইয়া চুপ করিয়া পড়িয়াছিল; উল্টা

আদুরে অঙ্কুর মাত্রের ন্যায়, উহারা ব্যাপ্ত প্রভৃতি করিয়া বড় বড় জ্ঞানীদিগের মনে শাখা-পত্র-ফল-ফুলে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সত্যের ঐ-সব বীজ-ধাতু কোন কালে ঘুমাইয়া ছিল না বটে, কিন্তু এটা ঠিক যে, উহাদের কার্য্য উহারা অতি সংগোপনে এবং নিঃশব্দে সমাধা করিয়া আসিতেছে। আশ্চর্য্য দৃঢ়তার সহিত উহারা দৃষ্টি-পথ অতিক্রম করিয়া কোটরে নিলীন হইয়া যায়; এজন্য, কে-যে উহারা—তাহা কেহই জানে না; উহাদের পরিচয় প্রদান করা তত্ত্বজ্ঞান-বিষয়ক জল্পনার কর্ম্ম নহে, তাহা এমনি একটি যুক্তি-যুক্ত গ্রন্থকে অপেক্ষা করে—যাহা সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞান*। তত্ত্বজ্ঞান এবং তাহার মূলতত্ত্ব-সকলের ঐতি-ক্রমণিক ব্যাখ্যা-সকল—অল্পই হউক আর অধিকই হউক—কিছু-না-কিছু অসম্পূর্ণ হইবেই। তত্ত্বজ্ঞানের মূল-প্রশ্ন-সকলের মধ্যে যে-গুলি অপেক্ষাকৃত গুরুতর এই অনুক্রমণিকার ভিতরেই আর-একটু এগিয়ে তাহাদের আলোচনা এবং বিলি-ব্যবস্থা করা যাইবে। এখানে এই একটি কথা সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, তত্ত্বজ্ঞানের বীজ-ধাতু মূলতত্ত্ব, অথবা প্রারম্ভ-সূত্র বলিতে আমরা প্রধানতঃ বুঝি—উহার এক [illegible] উত্থান-মার্গ, উহার লক্ষ্য বা প্রয়োজন, জগতে উহা কিসের জন্য আসিয়াছে, কি-উহাকে করিতে হয়—কেন করিতে হয়—কি প্রকারেই বা তাহা কৃত হয়। এ-সকল বিষয় যদিচ প্রকৃতির পর্য্যায়ে প্রথম, তথাপি জ্ঞানের পর্য্যায়ে চরম। উহারা দর্শন-সোপানের গোড়ার পইটা, তথাপি লোকে অনেক কালের পর অতি কষ্টে তবে উহাদের সন্ধান পাইয়াছে। উহারা তত্ত্ব-জ্ঞানের যুগাদি-সঞ্চিত বীজ—আদিম ভূস্তর, তথাপি এখনো পর্য্যন্ত আলোকে উদ্ধৃত হয় নাই। তত্ত্ব-জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি—প্রয়োজন কি—ইহার একটি প্রগাঢ় [illegible]-বোধে পূর্ব্বকালের দার্শনিকদিগের মন পরিব্যাপ্ত ছিল; ইহাতে আর সন্দেহ নাই। সকল জ্ঞানের এবং সকল সত্তার মূলতত্ত্ব-গুলির একটা অপরিস্ফুট আবির্ভাব তাঁহাদের মনে দেখা দিয়াছিল। কিন্তু তাহা তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে বিজলি খেলিয়া বেড়াইয়াছিল মাত্র—সুস্পষ্ট আকার-ধারণে সমর্থ হয় নাই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর মুখাকৃতির ন্যায় তাহা তাঁহাদের সম্মুখে ধরা না দিয়া, পশ্চাৎ হইতে তাঁহাদিগকে কি যেন এক ঘোরালো অলৌকিক সত্তার সম্ভ্রমে ছায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

এজন্য তত্ত্বজ্ঞান কোথাও আদ্যোপান্ত প্রমাণ করিয়া তোলা দৃষ্ট হয় না।

এ জন্য কোন স্থানেই এরূপ দেখা যায় না যে, তত্ত্বজ্ঞান আদ্যোপান্ত জ্যোতির্ম্ময় বিজ্ঞানের একটি ব্যূহ, অথবা প্রমাণীকৃত সত্যের একটি ব্যাপার। তত্ত্বজ্ঞান আপনার কার্য্য কি তাহাই আগে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করুক, ও কিরূপে সে-কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে তাহার উপায় স্থিররূপে অবধারণ করুক, তবে তো সে ওরূপ হইবে। তাহা যতক্ষণ না হইতেছে—যতক্ষণ না সে আপনার মূলতত্ত্ব-সকল আপনি করায়ত্ত করিতেছে, এবং তাহাতে-করিয়া তাহাদের কার্য্যের প্রসর ও প্রকরণ-পদ্ধতি সমস্তই আপনার চক্ষের সমক্ষে যুক্তি-পূর্ব্বক ধরিয়া পাইতেছে, যতক্ষণ সে আপনার মূলতত্ত্ব-সকলের কাছে আপনি নত-শির ও হত-জ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ওরূপ অভিজ্ঞতা-লাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিবার নহে। মৌলিক সত্য সকল—তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার আদিম প্রবর্ত্তক-সকল—তত্ত্ব-জ্ঞানের মূর্ত্তি-সংগঠনে তলে তলে সহায়তা করিলেই যে, সব হইল, তাহা নহে। তাহাদের প্রভাব, যাহা এ-যাবৎ কাল ভিতরে

ভিতরে সংগোপনে কার্য্য করিয়া আসিতেছে, তাহা প্রকাশে পরিস্ফুট হওয়া চাই, তাহা হইলেই তত্ত্বজ্ঞান আপনার অস্তিত্বের নিগূঢ় মর্ম্ম বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়া, কি কার্য্যের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছে তাহা সম্যক্ অবগত হইয়া, এবং নিখিল বৈজ্ঞানিক দিগ্বিজয়ের অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া, বাহির হইতে পারে। কিন্তু দার্শনিক আলোচনা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ধরিয়া অভীষ্ট পথে লাগিয়া না থাকিলে, তদ্রূপ সুখজনক পরিণামটি ঘটিতে সম্পন্ন হইবার নহে; কারণ, কালে যাহা প্রথম, জ্ঞানে তাহা চরম। এজন্য, এ-যাবৎ কাল তত্ত্বজ্ঞান কেবল এইরূপ সব মতামতেরই ক্রীড়া হইয়া আসিতেছে যাহার কোনটিই গোড়া হইতে প্রমাণ করিয়া তোলা নাই। সে-সকল মতামত দেখিলে মনে হয় বটে যে, তাহাদের অপেক্ষা স্পষ্ট সত্য আর কিছুই হইতে পারে না, কিন্তু তথাপি তাহারা বোধগম্য নামের যোগ্য নহে; কেননা, হয় প্রবল যুক্তি-দ্বারা সমর্থিত হউক, নয় জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী সত্য হউক, দুয়ের না এটি—না ও-টি—এরূপ হইলে বিজ্ঞান-মহলে কোন কিছুই বোধগম্য শব্দের বাচ্য হইতে পারে না।

অবশ্যম্ভাবী-সত্যের প্রত্যাখ্যান তত্ত্বজ্ঞানের আর একটি প্রতিবন্ধ-কারণ।

যুক্তি-হীনতার প্রসঙ্গাধীন তত্ত্বজ্ঞানের যেরূপ অসম্পূর্ণতা প্রদর্শিত হইল, তাহার কারণ-প্রদর্শন-ছলে আরো এই বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন কাল হইতে একটা পরাক্রম-শালী প্রবৃত্তি তত্ত্বজ্ঞানের বৈধ প্রবর্ত্তনের প্রতিহন্তা হইয়া আসিতেছে। সে প্রবৃত্তিটা সম্প্রতি কোন-কোন মহলে প্রকট-ভাব ধারণ করিয়া এইরূপ এক প্রতিজ্ঞা-আকারে দেখা দিয়াছে যে, জ্ঞানের নিতান্ত অবশ্যম্ভাবী তত্ত্ব-গুলিকে যতদূর সাধ্য অল্পের মধ্যে সঙ্কুচিত করিতে হইবে,—ইহাদিগকে একেবারেই উড়াইয়া দেওয়া না হৌক্—অন্ততঃ উহাদিগকে বিশুদ্ধ গণিতের মধ্যে আটক করিয়া রাখিতে হইবে—তাহার বাহিরে যাইতে দেওয়া হইবে না। একথাটি অতি সরল; কিন্তু যেমন আর আর প্রশ্নের সম্বন্ধে তেমনি ইহারও সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, কতকগুলি সাধারণ মন্তব্যের দ্বারা উহার সমুচিত মীমাংসা হইতে পারে না—উহার রীতিমত মীমাংসা করিতে হইলে বিবাদের সামগ্রী গুলিকে (অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী সত্য-গুলিকে) সাক্ষাতে আনিয়া উপস্থিত করা চাই। এ গুলি পরে যথাস্থানে আসিবে। সম্প্রতি, তাহাদের সপক্ষে বাক্য বাদানুবাদ অথবা তাহাদের সবিস্তর পরিচয়-প্রদর্শন, পরিহর্ত্তব্য; কেননা, এখন কেবল দার্শনিক আলোচনার গতি-রোধক কারণ-গুলি দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য; কেবল, জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী সত্য-সকলের প্রতি হত-শ্রদ্ধা নাকি ঐ কারণ-গুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান দলভুক্ত, এই জন্যই এখানে তাহাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা।

অবশ্যম্ভাবী সত্য কাহাকে বলে।

যাহা হউক, অবশ্যম্ভাবী সত্য কাহাকে বলে তাহার ব্যাখ্যা উপলক্ষে দুই একটি মন্তব্য এখানে প্রকাশ করিতে হানি নাই। তাহাকেই আমরা বলি জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী সত্য বা অবশ্যম্ভাবী নিয়ম, যাহার বিরোধী পক্ষ অভাবনীয়, স্ববিরোধী—বা আত্মহত্যা, অর্থ-শূন্য, অসম্ভব; আরো সংক্ষেপে, সেই সত্যই অবশ্যম্ভাবী যাহার সংস্থাপন-কার্য্যে প্রকৃতির স্বতন্ত্রতা ছিল না। প্রকৃতি এরূপ নিয়ম সংস্থাপন করিলেও করিতে পারিত যে, পৃথিবী সূর্য্যকে নহে কিন্তু সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিবে, অন্ততঃ এরূপ কল্পনাতে

স্ববিরোধী কিছুই লক্ষিত হয় না। দুই পক্ষই সমান সম্ভবায়ত্ত ছিল। কিন্তু প্রকৃতি কোন অবস্থাতেই নিম্নলিখিত এ নিয়মটি সংস্থাপন করিতে পারিত না যে, কোন একটি স্থান দুইটি-মাত্র সরল রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবে; কেননা, সরল রেখা-দ্বয় যদি কোন একটি স্থানকে পরিবেষ্টন করে, তবে তাহাতে কেবল ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, উভয়ের—হয় একটি—নয় দুইটিই—বক্র-রেখা; এইরূপে, অবশ্যম্ভাবী সত্যের বিরোধী পক্ষ আপনিই আপনাকে খণ্ডন করে।

প্রতিপক্ষের স্ব-বিঘাত অবশ্যম্ভাবী সত্যের নিদর্শন-চিহ্ন।

তত্ত্ব-সিদ্ধির এই-যে একটি নিয়ম যে, তত্ত্ব স্বপক্ষের সংস্থাপক এবং প্রতিপক্ষের প্রতিষেধক, * ইহাই অবশ্যম্ভাবী সত্যের নিদর্শন-চিহ্ন। এ নিয়মটিকে সচরাচর যেরূপ অধিকার দেওয়া হইয়া থাকে, উহাকে তাহার আর-এক ধাপ উপরে লইয়া গিয়া আরো ভাল করিয়া প্রদর্শন করা যাইতে পারে। নিয়মটি এই যে, যে যাহা—সে তাহাই হইবে। ক যে—সে ক। যিনি অবশ্যম্ভাবী সত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাস করেন—সুতরাং ক যে, ক, ইহা মানিতে চান না, মনে কর তিনি বলিতেছেন "না তাহা নহে, যে যাহা—সে তাহা না হইতেও পারে," ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, তবে তোমার এ যে কথা যে, "যে যাহা—সে তাহা না হইতেও পারে," এ কথাটি যাহা—উহা তাহা না হউক, তোমার কথাটি একেবারেই উলটিয়া যাক্; তাহা হইলে দাঁড়াইবে যে, তোমার কথার মূলার্থ এবং ফলিতার্থ উভয়ে পরস্পরের বিপরীত; সুতরাং উভয়ের একটিকে গ্রহণ করিতে গেলে আর-একটিকে পরিত্যাগ করিতে হয়। কোন্‌টিকে গ্রহণ করিব? তোমার কথার অর্থ প্রথমে ছিল, "যে যাহা—সে তাহা না হইতেও পারে" এখন তাহা উল্টাইয়া গিয়া এই দাঁড়াইতেছে "যে যাহা—সে তাহা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না" এই দুই বিপরীত অর্থের মধ্যে তুমি আমাকে একটি ছাড়িয়া আর একটি গ্রহণ করিতে বলিতেছ—তোমার অভিপ্রেত প্রথম অর্থটিই গ্রহণ করিতে বলিতেছ। কিন্তু সেইটিই যে ঠিক্ অর্থ তাহার প্রমাণ কি? যে যাহা সে-যদি তাহা না হইতেও পারে, তবে তোমার কথা যাহা—সে যে তাহাই—তাহার প্রমাণ কি? তাহার একটা প্রমাণ আমাকে দেখাও—নাহিলে আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারি না।" মানুষটি চুপ। তিনি প্রমাণ দর্শাইতে পারেন না। যখনই তিনি তাঁহার ঐ কথাটি তোলেন, তখনই তিনি বিনা-প্রমাণে অগত্যা মানিয়া লন যে, ও কথা যাহা—উহা তাহাই। এইটিই আমরা চাই। তত্ত্ব-সিদ্ধির নিয়ম আপনিই আপনাকে প্রতিপন্ন করিতেছে। উহা অস্বীকৃত হইলেও স্বীকৃত হয়; কারণ, যিনি অস্বীকার করেন তাঁহাকে ইহা মানিতেই হয় যে, তিনি অস্বীকার করিতেছেন, অথবা যাহা একই কথা—তাঁহাকে মানিতেই হয় যে, তিনি যাহা বলিতেছেন তাহাই বলিতেছেন, এবং তাহার সঙ্গে ইহাও মানিতে হয় যে, তাহার প্রতিপক্ষ বচন (অর্থাৎ তিনি

---

* [illegible] শাস্ত্রে তত্ত্বের [illegible] লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে—"সৎ সদিতি গৃহ্যমানং যথাভূতং অবিপরীতং তত্ত্বং [illegible] অসৎ চ অসদিতি গৃহ্যমানং যথাভূতং অবিপরীতং তত্ত্বং ভবতি।" সৎকে সৎ বলিয়া গ্রহণ করা হইলে, তাহা তত্ত্ব-শব্দের বাচ্য হয়; আর, অসৎকে অসৎ বলিয়া গ্রহণ করা হইলে, তাহা তত্ত্ব-শব্দের বাচ্য হয়। তত্ত্ব স্বপক্ষের সংস্থাপক—এ নিয়মটিকে ইংরাজীতে বলে Law of identity। Identity ([illegible]) এবং তত্ত্ব বলে একই। তত্ত্ব প্রতিপক্ষের নিষেধক—এ নিয়মটিকে বলে Law of contradiction. এই নিয়মানুসারে সৎকে অসৎ বলা কিম্বা অসৎকে সৎ বলা স্ববিরোধী, এক কথায় তত্ত্বের বিপর্যায় স্ববিরোধী।

যদিচ স্থল-বিশেষে এবং তাৎপর্য্য-বিশেষে স্বীকৃত হইয়া থাকে তথাপি—তাহাদের দশা যতদূর মন্দ হইতে পারে তাহা হইয়াছে। তাহাদের মধ্য-হইতে এক টি দল বাছিয়া লইয়া তাহাদের উপরেই কেবল পূর্ব্ব-প্রদর্শিত প্রতিপক্ষ-বিঘাতের পরীক্ষা (অর্থাৎ তাহাদের বিপরীত পক্ষ স্ববিঘাত-গর্ভ কি না তাহার পরীক্ষা) প্রয়োগ করানো হইয়াছে, অবশিষ্টগুলি যে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে অসমর্থ অথচ তাহাদিগকেও অবশ্যম্ভাবী বলিয়া ধরা হইয়াছে—আগন্তুকের কোঠায় তাহাদিগকে স্থান দিলে কি-যেন অনুচিত কার্য্য করা হইত। অবশ্যম্ভাবী সত্য-মাত্রকেই প্রতিপক্ষ-বিঘাতের পরীক্ষা উদ্‌যাপন করা চাই, তাহাতে যাহারা পিছপাও তাহারা অবশ্যম্ভাবী নামের অযোগ্য। পরীক্ষা-প্রয়োগের এই যে, বিশৃঙ্খলা বা শৈথিল্য, এটি কাণ্টের কাজ; ইহার ফল হইয়াছে—ঘোরতর গোলোযোগ। ইংলণ্ডের তত্ত্ববিদগণ কাণ্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছেন এবং কতক পরিমাণে তাহার শাখাও দেখাইয়াছেন। অবশ্যম্ভাবী সত্যের আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিয়া অবধি ইংলণ্ডের পণ্ডিতগণ এরূপ অবিচক্ষণতা সহকারে তাহাদের লইয়া তোলা-পাড়া করিয়াছেন; আগন্তুক সত্য-সকলের সহিত তাহাদিগকে মিশাইয়া এরূপ জড়িঘাণ্ট পাকাইয়াছেন, দুই শ্রেণীর সত্যের মধ্যে প্রভেদ যাহা আছে তাহা একেবারেই ভণ্ডুল করিয়া উভয়কে অনেকাংশে এরূপ অবিকল সমান অধিকার প্রদান করিয়াছেন যে, অবশ্যম্ভাবী সত্যের প্রতি তাঁহারা আদবেই যদি হস্তক্ষেপ না করিতেন, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানের ভাবী মঙ্গলের পথ এখনকার অপেক্ষা অনেক পরিমাণে নিষ্কণ্টক হইত।*

তত্ত্বজ্ঞানের [illegible] অবস্থার কিরূপ প্রতিকার হয়।

দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য এই, যেমন করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের বর্তমান অসন্তোষ-জনক অবস্থার

কাণ্টের মতে এরূপ এক শ্রেণীর সিদ্ধান্ত আছে যাহার বিশেষণ-পদের অর্থ পূর্ব্ব হইতেই তাহার বিশেষ্য-পদে অন্তর্ভূত রহিয়াছে; যেমন এই একটি সিদ্ধান্ত যে, পিণ্ড-মাত্রই বিস্তারবান্। এখানে বিস্তার-বত্তা লক্ষণটি পূর্ব্ব-হইতেই পিণ্ডে অন্তর্ভূত রহিয়াছে; কারণ, যাহাকে বলে বিস্তৃত পদার্থ তাহাকেই বলে পিণ্ড; "পিণ্ড" এই শব্দের উল্লেখ মাত্রেই বুঝায় যে, তাহা বিস্তার-বান্; সুতরাং পিণ্ডকে বিস্তারবান্ বলা বাড়ার ভাগ—তেলা মাথায় তেল দেওয়া মাত্র। এইরূপ যত সিদ্ধান্ত—যাহা নূতন কিছুই বলে না, বিশেষ্য-পদ যাহা বলিয়া চুকিয়াছে—বিশেষণকে দিয়া তাহাই পুনরুক্তি করায় মাত্র, কাণ্ট্ তাহাদের নাম দিয়াছেন রূঢ়িক সিদ্ধান্ত। এই শ্রেণীর যাবতীয় সিদ্ধান্তই অবশ্যম্ভাবী সত্যের লক্ষণাক্রান্ত; এবং প্রতিপক্ষের স্ববিরোধিতাই ইহাদের নিদর্শন-চিহ্ন; কারণ, একবার যখন পিণ্ডের সঙ্গে বিস্তারবত্তা লক্ষণ জড়িত করা হইয়াছে, তখন "পিণ্ড বিস্তারবান্ নহে" বলাও যা, আর, পিণ্ড পিণ্ড নহে বলাও তা—উভয়ই সমান।

আর-এক শ্রেণীর সিদ্ধান্ত আছে যাহাকে কাণ্ট্ যৌগিক নামে নির্দেশ করেন। যৌগিক সিদ্ধান্তের বিশেষণ-পদের অর্থ পূর্ব্ব হইতেই তাহার বিশেষ্য-পদের অন্তর্ভূত নহে; এই জন্য এরূপ সিদ্ধান্ত কখনো কখনো বৈবর্দ্ধিক বলিয়া উক্ত হয়; বৈবর্দ্ধিক—অর্থাৎ যাহা জ্ঞানেতে নূতন সামগ্রী যোগাইয়া জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন করে। কাণ্টের মতে সিদ্ধান্ত-সকল, আবার, আর-দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—(১) আগন্তুক এবং (২) অবশ্যম্ভাবী। "স্বর্ণ দ্রব-সাধ্য" এ সিদ্ধান্তটি আগন্তুক; কেননা, দ্রব-সাধ্যতা লক্ষণ বাদ দিয়াও স্বর্ণকে ভাবা যাইতে পারে। "স্বর্ণ বিস্তারবান্" এ সিদ্ধান্তটি অবশ্যম্ভাবী; কেন না, বিস্তৃতি-লক্ষণ বাদ দিয়া স্বর্ণ ভাবিতে পারা যায় না।

এ পর্য্যন্ত প্রভেদ-টি বুঝিতে কোন কষ্ট নাই। রূঢ়িক সিদ্ধান্ত মাত্রই অবশ্যম্ভাবী, আর, আগন্তুক সিদ্ধান্ত-মাত্রই যৌগিক, এটুকু পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। কিন্তু যৌগিক অথচ অবশ্যম্ভাবী, এইরূপ এক কিম্ভূত-শ্রেণীর সিদ্ধান্তের কথা কাণ্ট যখনই বলিতে সুরু করিয়াছেন, তখনই গোলোযোগ বাধাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, ঐরূপ সিদ্ধান্ত অবশ্যম্ভাবী সত্যের (অন্ততঃ মনুষ্য-বুদ্ধি-সুলভ অবশ্যম্ভাবী সত্যের) লক্ষণাক্রান্ত, অথচ প্রতিপক্ষের স্ববিরোধিতা উহাদের নিদর্শন-চিহ্ন নহে। তবেই হইল যে, এসকল সিদ্ধান্তের বিশেষণ-পদের অর্থ কোন গতিকেই উহাদের বিশেষ্য পদের অন্তর্ভূত নহে।

* যাহা বলা হইল তাহার পোষকতায় পাঠককে আমরা কাণ্টের সেই জটিল এবং বিভ্রান্তি-জনক স্থানটি দেখিতে অনুরোধ করি যেখানে তিনি সিদ্ধান্ত সকলকে যৌগিক (Synthetical) এবং রূঢ়িক (Analytical) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উভয়ের প্রভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রস্তাবিত গ্রন্থের ব্যাখ্যাতব্য [illegible] সম্বন্ধে—এক চাই যে, গ্রন্থখানি তত্ত্বজ্ঞানের একটি সমগ্র ইতিবৃত্ত হইবে, আর চাই যে, উহা তত্ত্বজ্ঞানের একটি সমগ্র তন্ত্র হইবে। আর কিছু না হোক, অন্ততঃ এটি স্থির যে, তত্ত্বজ্ঞানের হীনাবস্থা সংশোধন-পূর্ব্বক তাহাকে ভাল অবস্থায় আনিতে হইলে এমন একটি গ্রন্থ আবশ্যক, যাহা গোড়ায়-কথিত দুইটি বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা (অর্থাৎ সত্য হইবার এবং যুক্তিযুক্ত হইবার প্রয়োজনীয়তা) আগাগোড়া মানিয়া চলিবে।

সত্য এবং যুক্তি উভয়াত্মক একটি প্রতীকার-তন্ত্র অসম্ভব নহে।

জিজ্ঞাসু ব্যক্তি যদি স্থির-চিত্তে এবং শুদ্ধান্তঃকরণে জ্ঞানের হিত-সাধনে যত্ন নিয়োগ করেন, তবে সত্য আপনার কাজ আপনিই করিবে—সে জন্য কোন চিন্তা নাই। সত্যাভাস, অর্থাৎ লৌকিক-চিত্ত-সুলভ সত্যের ভান, যদিচ নিতান্তই জ্ঞানের বিরোধী, তথাপি জ্ঞানের সহিত সত্যের এমনি এক স্বভাবসিদ্ধ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে যে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তি যদি আপনার লক্ষ্য আপনি যথার্থরূপে জ্ঞানায়ত্ত করে, এবং সে লক্ষ্যের সাধনে কৃতসঙ্কল্প হয়, তাহা হইলে শুদ্ধ কেবল ঐ স্বভাবসিদ্ধ সম্পর্কের টানে পড়িয়া জ্ঞানের সহিত সত্য সংসক্ত হইয়া যায়। জ্ঞানের সহিত সম্পর্ক সূত্রেই সত্য আমাদের প্রাপ্তি-গম্য; আর, মনুষ্যের জ্ঞান যখন আছে, তখন অবশ্য সেই জ্ঞানের যথোপযুক্ত ব্যবহারও তাহার সাধ্যায়ত্ত। অতএব তত্ত্বজ্ঞানের বিরুদ্ধে এ কথার কোন বলই খাটে না যে, জ্ঞানের যথোপযুক্ত ব্যবহার মনুষ্যের সাধ্যাতীত, অথবা সত্যের সহিত জ্ঞানের সামঞ্জস্য এবং তাদাত্ম্য সংঘটন মনুষ্যের পক্ষে অগম্য।

জ্ঞানের যথোপযুক্ত ব্যবহারের [illegible] অনুষ্ঠান-বিধি।

কিন্তু, জ্ঞানের যথোপযুক্ত ব্যবহার এইটিই হ'চ্চে কথা। অনেকেই মনে ভাবিবেন এইটিই কঠিন। এই এক-রত্তি [illegible] শিষ্ট বিষয়ের সম্বন্ধে কত না দুরূহ বিধি ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আজ পর্য্যন্ত কাহারো এক তিল জ্ঞান-বৃদ্ধি হইল না। যুক্তি-যুক্ত তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে নিম্ন-লিখিত একটি মাত্র অনুষ্ঠান-বিধি যথেষ্ট কার্য্য-দর্শী। সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানের অনুষ্ঠান বিধি এই;—কিছুই স্বীকার করিবে না—জ্ঞান যদি-না তাহাকে অবশ্যম্ভাবী সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করে; অবশ্যম্ভাবী সত্য, অর্থাৎ যাহার প্রতিপক্ষ-কল্পনা স্ববিরোধ-সূচক; আর, কিছুই অস্বীকার করিবে না—যদি তাহা স্ববিঘাত-সূচক না হয়, অথবা যাহা একই কথা—জ্ঞানের কোন একটি অবশ্যম্ভাবী সত্যের বা অবশ্যম্ভাবী নিয়মের বিরোধী না হয়। এই অনুষ্ঠান-বিধিটি দৃঢ়রূপে পালিত হউক, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানের সমস্ত কার্য্য কুশলে নির্ব্বাহিত হইবে। এই বিধিটির গুরুত্ব—বচনে নহে—কিন্তু সাধনে।

বর্ত্তমান সংহিতা-তন্ত্র সত্যবত্তা এবং যুক্তিমত্তা দুয়েতেই আপনাকে স্বত্ববান্ মনে করে কিন্তু বেশীর ভাগ যুক্তিমত্তাতে।

উপস্থিত দর্শন-সংহিতা, যাহা উপরি-উক্ত সাধারণ মন্তব্য-গুলিকে কার্য্যে পরিণত করিতে আয়াস পাইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে ভূমিকাচ্ছলে পূর্ব্বাহ্নে এইটি বলিয়া রাখা ভাল যে, যদিও এ তন্ত্র-টি—সত্যবত্তা এবং যুক্তিমত্তা—দুয়ের কোনটিতেই আপনার স্বত্ব অস্বীকার করিতে পারে না (যদি করে তবে সেরূপ মিথ্যা-বিনয় কাহারো শ্রদ্ধা-ভাজন হইবে না) তথাপি, সত্যবত্তার উপর তত নয়—যত যুক্তি-মত্তার উপর উহা আপনার স্বত্ব

পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একজন বিচক্ষণ ও ধার্ম্মিক। শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের মধ্যাবস্থায় যতগুলি শিষ্য হয় তন্মধ্যে কেশবচন্দ্রের ন্যায় পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণও একজন গণনীয় এবং জ্ঞান ও যোগ-মার্গে একজন অগ্রসর। সুতরাং তাঁহার কথা লইয়া আলোচনা করা আমরা কোন অংশেই নিরর্থক বিবেচনা করি না। তাঁহার সাধারণ সমাজের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগের প্রধান কারণ ধর্ম্মপ্রচারের প্রণালীগত প্রভেদ। আমরা তাঁহার একখানি পত্র যথাস্থানে প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে তাঁহার প্রচারপ্রণালী কতদূর সঙ্গত ইহা প্রদর্শন করা আবশ্যক হইতেছে।

বর্ত্তমানে পৃথিবী নানারূপ উপধর্ম্মে দূষিত। কি হিন্দু কি মুসলমান কি খ্রীষ্টান সকল সমাজেই উপধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব। জীবজগতের নিয়ম এই যে, যাহা যোগ্যতর তাহাই জীবিত থাকে, আর সমস্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। ধর্ম্মজগতেরও ঠিক ঐ নিয়ম। যাঁহারা বৈদিক ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন এইটী তাঁহাদের বেশ বোধগম্য হইবে। বেদে দৃষ্ট হয় এক এক বৈদিক কবির হৃদয় অল্পে অল্পে জড়রাশির আবরণ ভেদ করিবার চেষ্টা পাইতেছে, অল্পে অল্পে অনন্তের দিকে উন্মেষিত হইতেছে এবং পরিশেষে সহজ শক্তিতে উহা অনন্তে পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছে। এই টুকু দেখিলে বোধ হয় যে, যে যোগ্যতর সেই জীবিত থাকে জগতে কোন কালেই এই নিয়মের ব্যভিচার নাই। এস্থলে বুঝ, যাহার বল অধিক অর্থাৎ যাহা সত্য তাহাই জীবিত। অপরগুলি কবিতারাশির সমাধি-স্তূপে মৃত ও শায়িত থাকিয়া লোকের অতীতের ঔৎসুক্য চরিতার্থ করিতেছে। উপরে যেরূপ প্রদর্শন করিলাম এইরূপ নিয়মের বলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎপত্তি। ইহা অল্পে অল্পে সর্ব্বব্যাপী উপধর্ম্মের বক্ষ ভেদ করিয়া অনন্তের দিকে বিকসিত হইয়াছে। ইহাই এই ধর্ম্মের স্বাভাবিক উন্নতি বা বৃদ্ধি। যে ব্রাহ্ম সত্যকাম স্বধর্ম্মের এই ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন কি উপায়ে ইহা রক্ষিত হইতে পারে। এস্থলে স্পষ্ট কথায় এবং এক কথায় এই মাত্র বলা যায় যে, যে শিশু একবার মাতৃগর্ভ হইতে বহির্গত হইয়াছে তন্মধ্যে পুনঃপ্রবেশ তাহার মহাবিনাশ। সুতরাং যাহাতে ব্রাহ্মগণ পুনর্ব্বার উপধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া মহাবিনাশ প্রাপ্ত না হন সে বিষয়ে সতর্ক থাকা ব্রাহ্মের প্রথম কর্ত্তব্য।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও কিছু কর্ত্তব্য আছে। তিনি যে সত্যটী পাইবেন অবিকল তাহাই প্রচার করিবেন। বিকৃত আকারে প্রচার করা বিশেষ অনিষ্টকর। এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। জ্ঞান ও ভাব লইয়া ধর্ম্ম। মনে কর, বেদ যে ধর্ম্ম প্রসব করিয়াছে দর্শন তাহার জ্ঞান আর পুরাণ তাহার ভাব বা কবিত্ব। প্রচারের পক্ষে ধর্ম্মের এই দুই অঙ্গই বিশেষ উপযোগী। কিন্তু এদেশে এই কবিতা কিছু অনর্থের মূল হইয়াছে। আমরা ইহা অবশ্য স্বীকার করি যে, বিশুদ্ধ সত্য প্রচার করা দর্শনের ন্যায় পুরাণেরও উদ্দেশ্য কিন্তু কবিকল্পনা অজ্ঞাতসারে তাহার মূলে আঘাত করিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ ছদ্মবেশে সত্য প্রচার। এদেশে যে দেবদেবীর এত বাহুল্য ইহার কারণই এই ছদ্মবেশী সত্য। প্রাচীনতম বেদেই তাহার মূল প্রোথিত আছে। কিন্তু দর্শন বেদ হইতে যে অবিমিশ্র সত্য প্রচার করিবার চেষ্টা পাইয়াছে পুরাণ ঠিক সেরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ইহা হয় তাঁহার ভ্রান্তি, নয় ছদ্মবেশে সত্যপ্রচার তৎকালে একটা লোকের মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু আমাদের অ-

নেক স্থলে যোগটাই বলবৎ মনে হয়। আমরা নিম্নে সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিতেছি।

বেদের কাল ভারতের অতি শৈশব কাল। কিন্তু পৌরাণিক কালকে যৌবন বা বার্দ্ধক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। দেখ সেই সময়ে কি হইয়াছিল। আমরা জগৎকার্য্যে যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম দেখিয়া থাকি বেদের কাল তাহা কিছুই বুঝিত না। বায়ু বহিতেছে, সূর্য্য উঠিতেছে, স্রোত খরবেগে চলিয়াছে, এই সকল ব্যাপার দেখিয়া আদি কবিরা ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতেন এবং নিজের বাহ্যরূপ সাদৃশ্যে প্রত্যেক ঘটনায় এক সচেতন অধিষ্ঠাতার কল্পনা করিতেন। এই সকল ঘটনার মধ্যে কতকগুলি মঙ্গলকর আবার কতকগুলি অমঙ্গলকর। যাহা মঙ্গলকর উঁহাদের চক্ষে তাহাই দেবতা আর যাহা অমঙ্গলকর তাহাই অসুর। মেঘ অন্ধকারের উপায় সূর্য্য বা ইন্দ্রের আলোককে আবরণ করিত সুতরাং তাহা অমঙ্গলকর এজন্য তাহার নাম বৃত্রাসুর। এই সত্যটুকু ধরিয়া পৌরাণিক কবিরা দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুরের একটা ঘোরতর যুদ্ধ বর্ণনা করিলেন। বর্ণনার ঘটায় বোধ হয় যেন ইহা একটা বাস্তব ঘটনা। আর একটী স্থল দেখ। প্রভাতে সূর্য্য উদিত, তাহার স্বর্ণবর্ণ কিরণ প্রাভাতিক বায়ুবেগে আন্দোলিত বৃক্ষপত্র সকল স্পর্শ করিতেছে। এই দেখিয়া কবি কল্পনাবলে কিরণকে কর স্থানীয় করিয়া সূর্য্যকে হিরণ্যপাণি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু ভবিষ্যতে এই সূর্য্যই হিরণ্যপাণি অর্থাৎ বহু-সুবর্ণ-দ বলিয়া যজমান কর্ত্তৃক স্তুত হয়। আরও একটী দেখাই। বেদে সূর্য্য বিষ্ণু-নামে অভিহিত হইয়াছে *। ঐ বিষ্ণুর বিষয়ে কথিত আছে যে, তিনি পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও আকাশ এই তিন স্থলে তিন পদ নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। ঐই সূত্রটুকু ধরিয়া পৌরাণিক কবিরা বামন অবতার সৃষ্টি করিলেন। ঋষিরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া প্রথমাবস্থায় কবিত্বের আকারে যে সকল সরল কথা বলিয়াছেন অগ্রে কে ভাবিয়াছিল যে ভবিষ্যতে তাহার এইরূপ পরিণাম হইবে। ফলতঃ পৌরাণিক দেবতত্ত্বের অধিকাংশেরই মূল এই ছদ্মবেশী সত্য। এস্থলে অনেকে বলিবেন বৈদিক ঋষিরা প্রাকৃতিক ঘটনা দৃষ্টে দেবাদিব্যবহারের সাদৃশ্য পাইয়া কল্পনায় যে সকল সরল কথা বলিয়াছিলেন তাহাতে পৌরাণিক কবিদিগের বাস্তবিকই ভ্রম হইয়াছিল। এই ভ্রম হইতেই পুরাণে নানারূপ দেবতার সৃষ্টি হয়। তাঁহারা এরূপ স্থলে যেন ভ্রম বলিতে চান বলুন কিন্তু আমরা তাহা বলি না। অতি প্রাচীন কালে কুমারিল ভট্টের সহিত বৌদ্ধদিগের বিচার হয়। বৌদ্ধেরা দেবদ্বেষী। তাহারা কহিয়াছিল যে ব্রহ্মা কন্যাগামী, তাঁহার পূজা কিরূপে করা যায়। প্রত্যুত্তরে কুমারিল ভট্ট কহিয়াছিলেন ব্রহ্মার পক্ষে এ ঘটনা বাস্তব নয়। কারণ সূর্য্যের অপর নাম ব্রহ্মা বা প্রজাপতি। অরুণোদয়কালে তাঁহার আগমনে উষার জন্ম। এই জন্যই উষা তাঁহার দুহিতা। উষার সহিত তাঁহার তেজ সংযোগ হয় বলিয়া ঐ উভয়ে স্ত্রীপুরুষবৎ উপচরিত হইয়াছে†। ঘটনা বাস্তব নয় ইহা কবিকল্পনা মাত্র। এখন এই স্পষ্ট কথাটী আলোচনা করিলে এবং পুরাণের লিখনভঙ্গী পরীক্ষা করিলে বোধ হয় ছদ্মবেশে সত্যপ্রচার তখনকার একটী রোগ ছিল। ইহা রোগ বা যাই হউক কিন্তু আমরা বলি সত্যের অঙ্গে এইরূপ অলঙ্কার বড় বিপদাবহ। এইরূপ প্রক্ষেপ

* ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং।

† প্রজাপতিস্তাবৎ প্রজাপালনাধিকারাদাদিত্য এবোচ্যতে। স চারুণোদয়বেলায়ামুষসমুদ্যন্নভ্যেতি সা তদাগমনাদেবোপজায়ত ইতি তদ্দুহিতৃত্বেন ব্যপদিশ্যতে। তস্যাং অরুণ কিরণাখ্য বীজনিক্ষেপাৎ স্ত্রীপুরুষ সংযোগবদুপচারঃ।

সত্যে এক সময়ে জনসমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইয়া ছিল। পুরাণ পাঠে ইহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনও সময় এরূপ প্রশ্নও উঠিয়াছিল যে অসৎকার্য্যে ব্রহ্মাদির যদি কিছু প্রত্যবায় না হয় তবে মনুষ্যের কেন হইবে। কিন্তু গ্রন্থকারেরা বড় চতুর। তাঁহারা লোকস্থিতিভঙ্গ নিবারণের নিমিত্ত প্রত্যুত্তরে কহিয়াছিলেন তেজীয়ানদিগের ইহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। কোথাও বলিয়াছেন ব্রহ্মাদির ঐরূপ কার্য্য কেবল অসুরপ্রলোভনের নিমিত্ত। অর্থাৎ তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অসুরেরা এইরূপ পাপে লিপ্ত হইয়া উচ্ছন্নে যাইবে। কি চমৎকার প্রত্যুত্তর!

এখন বুঝা গেল সত্যের ছদ্মবেশ কতদূর দূষণীয়। যদি বল বর্ত্তমান শতাব্দীতে উচ্চ শিক্ষার প্রাচুর্ভাব। এখন ইওরোপ ও ভারতবর্ষ জ্ঞানে এক হইয়াছে। সুতরাং কোন রূপ ছদ্মবেশ সত্যকে লোকের চক্ষে আর প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে না। এ কথাও ঠিক নহে। ভারতবর্ষে কেবল এখনই যে উচ্চশিক্ষার প্রাচুর্ভাব ইহা কে বলিল। এখানে এমন একটী সময় ছিল যে, পৃথিবীর আর কোন দেশ এপর্য্যন্তও তাহার সীমায় যাইতে পারে নাই। আমরা সেই কালের উল্লেখ করিয়া বলিতেছি যে তখনও এই প্রচ্ছন্ন সত্যের অনুসন্ধান অনেকেই পান নাই। উপরে যে বৌদ্ধবিবাদের কথা তুলিয়াছি উহা দ্বারা তাহা কতকটা প্রমাণ হয়। যখন গ্রন্থবিশেষ জ্ঞানের প্রমাপক না হইয়া বুদ্ধি ও হৃদয় তাহার প্রমাপক হয় সে সময়কে অবশ্যই উচ্চ শিক্ষার কাল বলিব। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে তাহার নিদর্শন আছে। আর মনুর ধর্ম্মাধর্ম্ম-নির্ণয়-স্থল পাঠ করিলেও তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং সে সময়েও যখন অনেকেরই চক্ষে সত্যের এই ছদ্মবেশ ধরা পড়ে নাই এবং মীমাংসকদিগের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্যাখ্যাত হইলেও যখন আবহমান কাল ভ্রান্তিটাই চলিয়া আসিয়াছে, তখন মুক্তকণ্ঠে বলা যায় সত্যের অঙ্গে অলঙ্কার বড় দূষণীয়।

এই সালঙ্কার সত্যের জন্ম আলোকে কিন্তু ইহার কর্ম্ম ঘোর অন্ধকারে। সত্যের রূপে মুগ্ধ না হইলে তাহাকে সাজাইতে প্রবৃত্তি হয় না। এই মোহের মূল আলোক। আবার, আমি যেমন মুগ্ধ হইলাম এইরূপ অন্যেও হউক এই জন্য তাহার সাজসজ্জা। ফলত সত্যের এই বাহ্য সম্পদের যাহারা স্রষ্টা বাহ্য সম্পদ তাহাদিগকে মুগ্ধ করিতে পারে না কিন্তু মুগ্ধ করে পরবর্ত্তীদিগকে, তাহাও আবার অন্ধকারে। ঋষিরা কহিয়াছেন কেবল সাধকদিগের হিতের নিমিত্তই বাহ্য সজ্জার এইরূপ কল্পনা জানিবে। কিন্তু পরবর্ত্তীরা অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্যে কল্পনার কথা বিস্মৃত হন এবং অলঙ্কারকেই একটা বাস্তব সত্তা দিয়া থাকেন। এই যে আলঙ্কারিক মোহ এই টুকু অন্ধকার [illegible] হইলে স্ফূর্ত্তি পায় না। অনেক সময় এই মোহই আবার অন্ধকারের স্রষ্টা হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, স্বাধীন বুদ্ধি তত্ত্বের অনুসরণ করে ইহাই তাহার ধর্ম্ম, কিন্তু তত্ত্বের উজ্জ্বল আবরণ যখন একটা আপ্ত বাক্যের সহিত তাহার সম্মুখে দাঁড়ায় তখন বুদ্ধির আর স্বাধীনতা থাকে না। সে তদ্দণ্ডেই নির্বিচারে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং এই আলঙ্কারিক মোহই অন্ধকারের স্রষ্টা। ভারতবর্ষে দেবতত্ত্বে বিশ্বাস এই মোহ-প্রভাবেই ঘটিয়াছিল।

এখন শ্রদ্ধাস্পদ গোস্বামী মহাশয় দেখুন তিনি আধ্যাত্মিক রূপক দ্বারা অর্থাৎ কৃষ্ণকে ঈশ্বর ও রাধাকে সাধক নামে দিয়া একটা যে নূতন ধরণের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার

কত দূর অনিষ্টকারিতা। এই যে আধ্যাত্মিক রূপক ইহা কিছু নূতন নহে। গোপিকা সকল সাধক ও কৃষ্ণ ঈশ্বর এই রূপকের উল্লেখ ভাগবতের কোন কোন বৈষ্ণব টীকাকার করিয়া গিয়াছেন। আর যিনি ঈশ্বরপ্রেমে এক সময় সমস্ত ভারতবর্ষ মাতাইয়া যান সেই ধর্ম্মবীর চৈতন্য যে ঐ নন্দের নন্দন দ্বিভুজ মুরলীধরকে প্রকৃত ঈশ্বর জানিতেন তাহা নহে। তিনিও একটী আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যই হউন আর যেই হউন তাঁহারা যে আলোকে এই সালঙ্কার সত্য পাইয়াছেন ইহাতে অবশ্য তাঁহাদের কোন ক্ষতি হয় নাই, হইতেও পারে না। কারণ রূপকটী তাঁহারাই গড়িতেছেন এবং তাঁহারাই ভাঙ্গিতেছেন। প্রকৃত সত্য তাঁহাদের হৃদয়ে বিরাজমান, সুতরাং এই বাহ্য সজ্জা তাঁহাদের পক্ষে সহজেই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি সেই চৈতন্যের পর কয়জন লোক রাধাকৃষ্ণের এই আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছে? একে তো ঈশ্বরের কোন নাম নাই, তবে যে নাম দেওয়া তাহা কেবল ভাষার সাহায্য ব্যতীত ভাব প্রকাশ হয় না এই জন্য; কিন্তু তাই বলিয়া যে নামের সহিত কতকগুলা পার্থিব বিলাসের বা লীলার ভাব জড়িত তাহার কোন আধ্যাত্মিক অর্থ থাকিলেও তুমি তাহা লইতে পার না। তুমি অবশ্য কৃষ্ণকে ঈশ্বরের ও রাধাকে ভক্তের একটী ভূমিকা পরিগ্রহ করাইয়া উভয়কে নায়ক নায়িকা রূপে দেখাইলে এবং উঁহাদের বিরহ ও মিলনের সঙ্গীতও তাল মানের সহিত গান করিলে, কিন্তু ইহার ফল কি হইবে? জনসমাজের তিন ভাগ অজ্ঞ ও এক ভাগ বিজ্ঞ। যদিও বিজ্ঞেরা যবনিকার অন্তরাল দিয়া কৃষ্ণ ও রাধা কাহার ভূমিকা লইয়াছেন ইহা দেখিতে পান কিন্তু অজ্ঞেরা তাহার বিন্দু বিসর্গও পায় না। শ্রীমতী রাধা মানিনী, শ্রীকৃষ্ণের শিখিপুচ্ছখচিত বনমালাজড়িত মস্তক তাঁহার চরণের নখরুরাগে রঞ্জিত হইয়া জগতে কি যে আধ্যাত্মিক ভাব প্রচার করিতেছে সে তাহার কিছুই বুঝে না। ফলে দাঁড়াইল মর্ত্ত্যরূপী ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং মর্ত্ত্যরূপী ঈশ্বরের নানা রূপ মর্ত্ত্য লীলায় বিশ্বাস। ভাগবতের ন্যায় ভক্তিদর্শন জগতে আর আছে কি না সন্দেহ। সেই ভাগবতকার অন্যান্য বৈষ্ণব কবির ন্যায় কৃষ্ণের মর্ত্ত্য লীলা বর্ণনে লেখনীকে তাদৃশ প্রশ্রয় দেন নাই। তথাচ তিনি শুকমুখে সংশয় করিয়াছিলেন যে তিনি, জগতকে যে প্রেম ও ভক্তি শিক্ষা দিতে চলিলাম কৃষ্ণের এই মর্ত্ত্য লীলা তাহার ব্যাঘাতক হইবে কি না। ফলত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ব্যবহার আলোচনা করিলে তাঁহার এই সংশয় সঙ্গত বোধ হয়। ইহাদের অনেক গুলি আবদ্ধ কৃষ্ণলীলা তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ। ফলত এই ভারতবর্ষে কোন সম্প্রদায় দ্বারা যদি কোনও দূষিত কার্য্য হইয়া থাকে তবে তাহা এই বৈষ্ণব সম্প্রদায় দ্বারা হইয়াছে। ইহার কারণ নায়ক নায়িকা ভাবে যুগল মূর্ত্তির কল্পনা। কেবল এই বৈষ্ণব সম্প্রদায় কেন এই ছদ্মবেশী সত্য দ্বারা আর একটী সম্প্রদায়ের যে ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে এস্থলে তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যক। ইহা এতদ্দেশের প্রবল তান্ত্রিক সম্প্রদায়। বাহ্য দৃশ্যে তন্ত্র অবশ্যই একটী জঘন্য কাণ্ড। কিন্তু ইহার অধিকাংশ স্থল উজ্জ্বল সত্যে পরিপূর্ণ। অজ্ঞ লোকে আবরণ মুক্ত করিয়া তাহার তত্ত্ব উদ্ভেদ করিতে পারে না। এই জন্য তান্ত্রিকদিগের মধ্যে মদ্যপান ব্যভিচার প্রভৃতি ঘোরতর পাপ প্রশ্রয় পাইয়াছে। ইহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন যে এই তন্ত্রোক্ত সাধনার দোহাই দিয়া অনেকে দিকলোকে সর্ব্বসমক্ষে নানারূপ গর্হিত কার্য্য করিয়া থাকেন। এই জন্যই বলিয়াছি সত্যের অঙ্গে অলঙ্কার জনসমাজের সর্ব্বনাশের মূল। লোকে অগ্রে অলঙ্কারের প্রভায় মুগ্ধ হয়, অভ্যন্তরে কি যে সত্য আছে তাহার অনুসন্ধানে তাহারা আর অবসর পায় না!

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি ব্রাহ্মধর্ম্ম সমস্ত উপধর্ম্মের হৃদয় ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে। ইহার বীজমন্ত্র নিরলঙ্কার ওঙ্কার। এই ওঙ্কার সাধনাই ব্রাহ্মের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যিনি এতদ্ব্যতীত গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় অন্য বীজের পক্ষপাতী তিনি নিশ্চয় উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিবেন।

এই উপধর্ম্মের বলে ভারতের সত্যধর্ম্ম মেঘান্তরিত সূর্য্যের ন্যায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। তোমরা কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করের ন্যায় সেই সমস্ত অলঙ্কার চূর্ণ করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত সত্যটুকু লোককে বুঝাইয়া দেও ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে। গ্রীক প্রভৃতি জাতির পৌত্তলিকতার ন্যায় এই হিন্দুধর্ম্মে যে প্রকৃত পৌত্তলিকতা নাই, প্রত্যুত ইহার অস্থিমজ্জায় যে একেশ্বরবাদ ওতপ্রোত, শব্দ ও অর্থের আবরণ ভেদ করিয়া তাহা দেখাইবার চেষ্টা কর, ইহা দ্বারা এই জ্ঞানোজ্জ্বল কালে এই ধর্ম্মকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে, কিন্তু বিনয়ের সহিত কহিতেছি সত্যের অলঙ্কার পুনঃপ্রচারের কিছুতেই চেষ্টা পাইও না। কারণ এই অলঙ্কারের রম্য আলোকে কিন্তু স্ফূর্ত্তি অন্ধকারে। স্বীয় উজ্জ্বল প্রভায় সূক্ষ্মের আনন্দ লোপ করিয়া ক্রমশ স্থূলের আনন্দ আনয়ন করা ইহার গূঢ় শক্তি। এই জনাই ইহাকে অন্ধকারের স্রষ্টা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। অতএব সাবধান ভারতের বক্ষে সেই অন্ধকার আর আনিও না। ইহাতে তোমার অনিষ্ট আমার অনিষ্ট এবং সমস্ত দেশের অনিষ্ট।

প্রেরিত পত্র।

ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের প্রতি নিবেদন।

যাহা সত্য তাহাই ব্রহ্মধর্ম। ব্রাহ্মধর্ম সার্ব্বভৌমিক ধর্ম। ইহাতে দল নাই, সম্প্রদায় নাই। এই জন্য আমি যেখানে সত্য পাই এবং যাহা সত্য বুঝি তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আশঙ্কা করিতেছেন যে, আমার কার্য্যে তাঁহাদের ক্ষতি হইতেছে। অতএব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুদিগকে সুখী করিবার জন্য আমি তাঁহাদের সহিত সমস্ত বাহ্যিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান সমাজ, আদি সমাজ, হিন্দু সমাজ খৃষ্টীয় সমাজ মুসলমান সমাজ; আমি সকল সমাজের দাসানুদাস। আমার কোন সম্প্রদায় নাই অথচ সকল সম্প্রদায় আমার। যেখানে যতটুকু সত্য, সেই টুকু আমার ব্রাহ্মধর্ম। এখন হইতে এই সার সত্য, সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিব। আমার [illegible] আকার নিয়ে প্রকাশ করিলাম।

এই অসীম বিশ্বরাজ্যের সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর সত্য স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ অনন্ত স্বরূপ আনন্দ শান্তি [illegible] স্বরূপ, অজর অমর নিত্য, এক মাত্র অদ্বিতীয় পবিত্র স্বরূপ।

তিনি নিরাকার অর্থাৎ তাঁহার কোন প্রকার জড়ীয় রূপ নাই। তিনি সকলের স্রষ্টা কোন সৃষ্ট বস্তুর মত তিনি নহেন, তিনি স্বতন্ত্র কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা হয় না।

তিনি এক মাত্র অদ্বিতীয়, জগতে দুইজন ঈশ্বর নাই, তিন জনও নাই অথবা অনেক ঈশ্বর নাই।

যে কোন মনুষ্য জগদীশ্বর বলিয়া যে কোন নামে তাঁহাকে ডাকে সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকেই ডাকে। আর দ্বিতীয় যখন নাই ঈশ্বর কোথা হইতে অন্য ঈশ্বর আসিবেন?

পরমেশ্বরের কোন নির্দ্দিষ্ট নাম নাই। নানা দেশের লোকে আপন আপন ভাষায় তাঁহাকে এক একটী নাম করিয়া ডাকিয়া থাকে।

সৃষ্টিকর্তাকে লক্ষ্য করিয়া তুমি ব্রহ্ম বল, আল্লা বল, খোদা বল, হরি বল, রাম বল, কৃষ্ণ বল, কালী বল, দুর্গা বল, তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষতি নাই। কেহ কেহ বলেন লোকের মনে ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে; একথাও ঠিক নহে। কারণ হরি শব্দে সিংহ, অশ্ব, বানর, এবং পাপহরণকর্ত্তা পরমেশ্বর এই সমস্ত গুলি বুঝাইয়া থাকে। কেহ যদি ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া হরি বলিয়া গদ গদ ভাবে ডাকিতে ডাকিতে অশ্রুপাত করে তখন এমন লোক কেহ নাই যে বলিবে এ লোকটা বানর প্রভৃতি পশু গুলাকে ডাকিয়া কান্দিতেছে। বিশেষতঃ মনুষ্যের ভ্রম হইলেই বা ক্ষতি কি? আমার উদ্ধারকর্ত্তা মনুষ্য নহে। আমার দেবতা অন্তর্যামী তিনি জানিলেই হইবে। তুমি যে নামে ভগবানকে স্তুতি কর সেই নাম তোমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ। অন্যে যে নামেই ডাকুক তাহাতে আপত্তি কেন?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ঈশ্বরের জড়ীয় রূপ নাই এজন্য তাঁহাকে নিরাকার বলি। কিন্তু তাঁহার নিরাকার সচ্চিদানন্দ রূপ আছে। যাহা জ্ঞানচক্ষে দর্শন করা যায়। যেমন জ্ঞান চক্ষু আছে সেইরূপ, জ্ঞান কর্ণ, জ্ঞান নাসিকা, জ্ঞান রসনা ইত্যাদি আছে। যাহাতে শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, অনুভব হয়। জ্ঞানচক্ষে ইহলোকে পরলোকে যাহা কিছু সত্য আছে তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়। সাধন দ্বারা জ্ঞানচক্ষু বিকশিত হয়। যাহার শরীর আত্মা নির্ম্মল তাহার আপন। আপনি জ্ঞানচক্ষু বিকশিত হইতে পারে। অনেকেরই হয়। পরমেশ্বর এক তাঁহার প্রদত্ত মানবীয় ধর্ম্মও এক। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম। সত্য ধর্ম্মে দল নাই, সম্প্রদায় নাই। মনুষ্যের ভ্রম প্রমাদে দলাদলীর সৃষ্টি হয়। প্রকৃত ধর্ম্মে দল নাই।

ঈশ্বরকে প্রীতিকরা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা তাঁহার উপাসনা। তাঁহাকে আন্তরিক ভাল বাসিলে তবে তাঁহার প্রিয়কার্য্য করা যায়।

আমি যদি তাঁহাকে বাস্তবিক ভাল বাসি তাহা হইলে যে কেহ তাঁহাকে ভাল বাসেন তাঁহারা পূজা অর্চনা করেন তিনিই আমার পরমাত্মীয় [illegible]। এজন্য যেখানে [illegible] পূজা অর্চনা হয় সেই স্থানেই গমন করি, যেখানে তাঁহার নাম কীর্ত্তন সেই স্থানেই

মোহের স্বপন তুমি আমারি ভাঙ্গিলে।
এ হেন পাপীরে তুমি উদ্ধার করিলে।
তুমি মোর মুক্তি গতি, তোমাতে করিতে স্থিতি,
তোমার শরণ ল'তে তুমিই বলিলে॥

তব পথে চলে সদা তারকা তপন।
আমি যেন চলি তাহে তাদের মতন।
ওহে হৃদয়ের স্বামী, স্বাধীন না র'ব আমি,
হৃদয় সর্ব্বস্ব তুমি করহে গ্রহণ॥

স্বাধীনতা—দেখ কিবা উচ্চ অধিকার।
যার বলে দিই তাঁরে যা আছে আমার।
তাঁহার অধীন হই, তাঁহার শরণ লই,
তাঁহার আদেশ হৃদি পালি অনিবার।

নিয়তি অধীন হয় জড় সমুদয়।
জড়ের নিয়মে বদ্ধ আত্মা কভু নয়।
আপন মঙ্গল আত্মা কিবা চিনে লয়।
পবিত্র হইতে তার ইচ্ছা অতিশয়॥
আপন সম্বন্ধ বুঝে ঈশ্বরের সনে।
তাঁহাতে সংযুক্ত হয় প্রেমের বন্ধনে॥
যে দেব ভাবেতে আত্মা তাঁর পথে চলে।
যাহার প্রভাবে আত্মা তাঁর প্রেমে গলে॥
সেই দেব-ভাব তার হয় নিজ ধন।
বিনাশিতে তাহা নাহি পারে কোন জন॥
জগতের যত শক্তি আছে বিদ্যমান।
সব হ'তে আত্ম-শক্তি হয় বলীয়ান।
যবে আত্মা নিজ বলে ধায় তাঁর পানে।
বাধা বিঘ্ন পথে তার কভু নাহি মানে॥
শত শত প্রলোভনে থাকে সে অটল।
তিরস্কার লাঞ্ছনায় বাড়ে তার বল॥
এই তার স্বাধীনতা—ঈশ্বর অধীন।
থাকিয়া তাঁহার কায করে অনুদিন॥

জড় জগতের যন্ত্রী হয়েন ঈশ্বর।
তাঁহার নিয়মে রহে যত চরাচর॥
সব্বত্র আশ্রয় সেই পরম কারণ।
আশ্রয় অধিক তিনি আমাদের ধন॥
পিতা তিনি—পুত্র মোরা সবে বই নাই।
প্রেম ভক্তি যাচি তাঁরে—তাঁর কাছে যাই॥
আমরা রয়েছি তাঁর নিকটে যেমন।
জড় রাজ্য তাঁর কাছে হয় কি তেমন?
প্রেম পবিত্রতা যত করিব বর্দ্ধন।
ততই নিকটে তাঁর করিব গমন॥
আমরা অনন্তকাল তাঁর কাছে যা'ব।
তাঁহার মঙ্গল ছায়া চিরকাল পা'ব॥

প্রার্থনা।

হে নাথ! স্বাধীন, করিলে আমায়,
চাহি আমি তব হই।
দেহ মনঃ প্রাণ সঁপিয় তোমারে,
তোমার শরণ লই॥
চাহি তোমা ছাড়ি, সুদূরে পড়িয়া
বিষয়ে মগন হয়ে।
অমূল্য জীবন, করি বিসর্জ্জন,
ধন মান বৃথা লয়ে॥

করিলে স্বাধীন—এবে এই চাই,
নয়নে নয়নে রাখ।
তোমার শরণ, লইলাম হৃদি,
সতত নিকটে থাক॥
তুমি পিতা মাতা, সহায় ভরসা,
ওহে নাথ! কৃপা করি।
তরঙ্গ ভীষণ, অকূল পাথারে,
দেহ মোরে পদ তরী॥
তোমার সুন্দর প্রসন্ন আনন,
দেখাও অধীন জনে।
তব ইচ্ছা যাহা, হৌক ইষ্ট মন্দ,
পালি তাহা প্রাণ পণে॥
পবিত্র করহ, অন্তর আমার,
প্রেম সুধা তব দানে।
বিপদ সম্পদে, থাকে যেন চিত্ত,
নিয়ত তোমার পানে॥
ইতি ঊনবিংশ ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

সংবাদ।

আমরা শোকাকুল চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত বহুকাল রোগভোগের পর গত জ্যৈষ্ঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার দ্বারা এই তত্ত্ববোধিনীর পরিচালনায় এক প্রকার নষ্ট হয়। ফলতঃ বিজ্ঞান প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের বিষয় সকল এই পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া তিনি জনসমাজের যথেষ্ট উপকার করিয়া যান। তাঁহার অনেক পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠ্য। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় তাঁহার কীর্ত্তি স্তম্ভ। কি ভাষা কি বিষয় সকল প্রকারেই বঙ্গ সাহিত্য তাঁহার নিকট ঋণী। এই ধীমানের মৃত্যু-সংবাদে অনেকেই যে দুঃখিত হইবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আগামী ৯ই আষাঢ় মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭॥ টার সময়ে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের দ্বাত্রিংশ বার্ষিক উৎসব হইবেক।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চৌধুরী।
সম্পাদক।

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব

ভবানীপুর চতুস্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

৯ আষাঢ় মঙ্গলবার ১৮০৮ শক।

"যোবৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি"

যিনি মহান্ তিনি সুখ-স্বরূপ অল্প কিছুতে সুখ নাই। অন্তবৎ বিষয় সমূহের সঙ্গে আমাদের ক্ষণিক সম্বন্ধ, অনন্ত পরব্রহ্মের সহিত আমাদের চিরন্তন সম্বন্ধ। আমাদের জ্ঞানের দ্বার উদ্ঘাটিত হইলেই আমরা অনন্ত ভূমা মহান্ পুরুষকে আমাদের আত্মাতে দেখিতে পাই, তখন হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে প্রেমের উৎস আপনা হইতেই উৎসারিত হইয়া উঠে। ভূমা মহান্ পুরুষ আমাদের আত্মার একমাত্র শান্তি নিকেতন। যে পর্য্যন্ত না আমরা তাঁহাকে হৃদয়ে পাই সে পর্য্যন্ত আমাদের ব্যাকুলতা কিছুতেই শান্তি মানিতে পারে না। তিনি মহান্—দেবতাদিগের অধিপতি—ভূলোক, দ্যুলোক অন্তরীক্ষের অধীশ্বর, তথাপি আমাদের প্রতি তাঁহার প্রেমের বিরাম নাই। সংসারের প্রলোভনে পথ ভুলিয়া যখন আমরা তাঁহা হইতে বিমুখ হই তখন তাঁহার করুণা এক নিমেষের জন্যও আমাদের সঙ্গ ছাড়ে না; যখন মোহের অন্ধকারে আমাদের গতিরোধ হইয়া যায়, তখন তাঁহারই সেই করুণা জ্ঞানের আলোক ধরিয়া আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করে। ঘোরা রজনীর অবসানে অরুণচ্ছটা আবির্ভূত হইয়া যেমন পৃথিবীকে আশ্বাস-যুক্ত করে, তাঁহার করুণা সেইরূপ আমাদের সম্মুখে আসিয়া আমাদিগকে অভয় প্রদান করে। এমন অবিচলিত প্রেম আমাদের সঙ্গের সঙ্গী—ইহার কণামাত্র হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা কি আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইব না? এমন সর্ব্ব সন্তাপহারী চিরন্তন প্রেম আর কোথায় আমরা অন্বেষণ করিয়া পাইব? পরমাত্মা অনন্ত মহান্—তিনি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, প্রাসাদে বর্ত্তমান—কুটীরে বর্ত্তমান, স্বর্গে বর্ত্তমান—মর্ত্ত্যে বর্ত্তমান; অন্তবৎ বিষয়-রাজ্য হইতে মনশ্চক্ষু ফিরাইলেই আমরা তাঁহার অভয় প্রেমমূর্ত্তি দেখিতে পাইব—তাঁহার অমৃতময় সত্তা এই খানেই আমরা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পুলকিত হইব। আকাশকে আমরা কথায় বলি অসীম মহান্ কিন্তু সেই আকাশের প্রত্যেক বিন্দু যাঁহার অনন্ত মহিমায় পরিপূর্ণ তিনিই প্রকৃত অসীম, প্রকৃত মহান্। দেশ কালে আ-

বদ্ধ আমাদের এই আত্মাকে আমরা বলি স্বাধীন পুরুষ। কিন্তু সেই আত্মার যিনি অন্তরাত্মা তিনিই সনাতন স্বাধীন পুরুষ; তাঁহার চেতন-প্রসাদেই আমাদের আত্মা সচেতন হইয়াছে, তাঁহার স্বাধীনতা-প্রসাদেই আমাদের আত্মা স্বাধীন হইয়াছে; স্বাধীন হইয়া তাঁহার সহিত সহবাসের উপযুক্ত হইয়াছে। পরমাত্মার প্রতি আত্মার যে প্রীতি, তাহা বলের বশীভূত নহে—তাহা স্বাধীনতারই উচ্ছ্বাস। পরমাত্মা আমাদের জ্ঞানে চির প্রকাশমান, তিনি আমাদের হৃদয়ে চির বিরাজমান,—কিন্তু এ বার্ত্তাটি আমরা সকল সময়ে বুঝিতে পারি না; তখনই উহা আমরা বুঝিতে পারি—যখন আমাদের বুদ্ধি নির্ম্মল ও প্রশান্ত হয়, হৃদয় কলুষ-গ্লানি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পবিত্র আনন্দের আবাস হয়—এক কথায় যখন আমাদের আত্মা প্রকৃতিস্থ হয়। মোহ-মেঘ অপসারিত হইয়া গেলে আত্মাতে পরমাত্মাতে কিসের আর ব্যবধান। পরমাত্মা অসীম জগতের ব্যবধান ভেদ করিয়া আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিতেছেন—আমরা কেবল মোহের ব্যবধান ভেদ করিলেই তাঁহাকে পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারি, তবে কেন আমরা তাহাতে আলস্য করি? সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মকে আইস আমরা স্থির চিত্তে ধ্যান করি—ধ্যানের সংকীর্ণ নদী বেগবতী হইয়া যখন আনন্দের অতল-স্পর্শ সমুদ্রে বিলীন হইবে, তখন আর আমাদের কোন অভাব থাকিবে না। মনুষ্য হইয়া আমরা যদি পরমাত্মাকে না জানিলাম ও তাঁহার সহবাস-গুণে জ্ঞানময় ও প্রেমময় অন্তঃকরণ প্রাপ্ত না হইলাম, জড়ময় হইয়াই জীবন অতিবাহন করিলাম, তাহা হইলে আমাদের মনুষ্যত্বে প্রয়োজন কি ছিল? জ্ঞানের মূল্য কি জড় অপেক্ষা অধিক নহে—প্রেমের মূল্য কি মোহ অপেক্ষা অধিক নহে? জড়ের সেবাতেই নিযুক্ত করিয়া আমরা কি জ্ঞানকে জলে নিক্ষেপ করিব? মোহের সেবাতেই নিযুক্ত করিয়া আমরা কি প্রেমকে জলে নিক্ষেপ করিব? স্বর্গীয় জ্ঞান-প্রেম কি ইহারই জন্য মর্ত্তে অবতীর্ণ হইয়াছিল যে, কেবল জড় ও মোহের দাসত্ব করিয়াই জীবন অবসান করিবে? কখনই না। স্বর্গীয় জ্ঞান কি পাপধার ধূলকে তিলক করিয়া ললাটে ধারণ করিবে? পবিত্র প্রেম কি পঙ্কিল বাসনাকে অঙ্গের ভূষণ করিবে? তাহা যদি করে, তবে সে জ্ঞানকে ধিক্—সে প্রেমকে ধিক্! জ্ঞানের সেবার পাত্র যদি কেহ থাকে তবে তিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, প্রেমের সেবার পাত্র যদি কেহ থাকে তবে তিনি "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি!" অতএব আইস আমরা মোহময় সংসারের মরীচিকা পশ্চাতে ফেলিয়া জ্ঞান-প্রেমের ভূমা অমৃত-সাগরে আত্মাকে নিমগ্ন করিয়া জীবন সার্থক করি।

হে পরমাত্মন্। আমরা সুবিমল শান্তির জন্য তোমার দ্বারে উপনীত হইয়াছি; আর যে-দিকে আমরা দৃষ্টি করি, সেই দিকেই তুমুল তরঙ্গ কোলাহল মুখ ব্যাদান করিয়া উঠিতেছে, কোথায় যাইব তাহা ভাবিয়া পাই না। আমাদের দেশ পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আপাদ-মস্তক প্রপীড়িত, আমাদের অন্তঃকরণ কঠিনতর পরাধীনতায় ম্রিয়মাণ; কোথাও এমন স্থান নাই যেখানে স্বাধীনতার মুক্ত বায়ুতে ক্ষণকালের জন্য নিশ্বাস ফেলিয়া শান্তি-সুখ অনুভব করি। আমাদের আর সকল দিক রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে—তোমার প্রেম-মুখ আমাদের তৃষিত আত্মার সমক্ষে অনাবৃত কর—তাহা হইলে আমাদের সকল দুর্গতির অবসান হইবে। আমাদের এই হতভাগা দেশের কত নব্য সন্তান স্বাধীনতার মুখ দর্শন করিবার জন্য দেশ দেশান্তরে গমন

করে ; হায় ! স্বাধীনতার নিত্য নিকেতন—মুক্তির অনিরুদ্ধ আকাশ যে তুমি—তোমাকেই আমরা ভুলিয়া রহিয়াছি—আমাদের আর কি হইবে ! আমাদের জ্ঞান-চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে—স্বাধীনতা আমাদের নিকটতম প্রদেশে শত সহস্র রশ্মিতে দীপ্তি পাইলেও আমাদের কাছে তাহা তামসী নিশার অন্ধকার। তোমার প্রেমের বীজ আমাদের আত্মাতে অঙ্কুরিত হইলে তাহা হইতেই কেবল স্বাধীনতা ফলিতে পারে ইহা আমরা দেখিয়াও দেখি না। তোমার প্রেম যদি এক দণ্ডে আমাদের আত্মাতে বলের সঞ্চার করে তবে এই দণ্ডেই আমরা স্বাধীন হই। তাহা হইলেই ধর্মী-ভক্ত লোকে দেখিয়া চমকিত হয়—বাহুবল ও মোহবল অপেক্ষা আত্মার বল কত প্রতাপশালী। কিন্তু এখন আমরা তোমা হইতে দূরে পড়িয়া মোহে আচ্ছন্ন হইয়া দিনপাত করিতেছি—এখন আমাদের কোনো বলই নাই ;—দীন হীন-গতিহীনের তুমি করুণাময় প্রভু—এই কেবল আমাদের এক মাত্র ভরসা,—তুমি আমাদের প্রতি তোমার এক বিন্দু কৃপা বিতরণ কর এই কেবল আমাদের প্রার্থনা ; তোমার প্রসন্নতাই আমাদের দুর্ব্বল আত্মাতে বলাধান করিতে পারে—তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

দর্শন-সংহিতা।*

ক্ষুদ্র একটি আপত্তি এবং তাহার খণ্ডন।

এই তন্ত্রটির বিরুদ্ধে যৎসামান্য এই একটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, উহার ঐ প্রবল প্রমাণ-পদ্ধতিটি গণিত-বিজ্ঞানের নিকট হইতে ধার করিয়া পাওয়া,—তাহা গণিত-বিজ্ঞানকেই সাজে, তত্ত্ব-জ্ঞানের পক্ষে তাহা সংলগ্ন হয় না। ইহার উত্তর এই—সংলগ্ন হয় কি না তাহা কেবল "ফলেন পরিচীয়তে" ফল দ্বারাই নির্ণীত হইতে পারে। পরীক্ষাতে যদি এরূপ দাঁড়ায় যে, ঐ প্রণালী প্রবল প্রমাণ-প্রণালী তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে দিব্য উপযোগী হয়, তবে তাহার উপর আর কথা নাই ; আর, পরীক্ষায় যদি তাহা না টেঁকে, তবে তাহার সপক্ষে তর্ক করাও যেমন নিষ্ফল, তাহার বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করাও তেমনি নিষ্প্রয়োজন। বিষয়টি এমনি যে, তাহার আপনার যোগ্যতা-সমর্থন আপনাকেই করিতে হইবে,—তাহাও তর্কবিতর্ক-দ্বারা নহে কিন্তু কার্য্য-দ্বারা। তবে, লোকে এই যে একটা কথা রাষ্ট্র যে, ঐ প্রবল প্রমাণ পদ্ধতিটি তত্ত্বজ্ঞানের নিজের নহে—উহা গণিতের নিকট হইতে ধার করিয়া লওয়া—এ কথা কাজের কথা নহে ; উল্টা বরং এই

সেটি "প্রতিপক্ষের স্ববিঘাত অবশ্যম্ভাবী সত্যের নিদর্শন-চিহ্ন" এই শিরস্ক পরিচ্ছেদের অব্যবহিত পরবর্ত্তী ; সেই পরিত্যক্ত পরিচ্ছেদটি নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

সদ্য-প্রতীতি অবশ্যম্ভাবী সত্যের নিদর্শন-চিহ্ন নহে।

এখানে আর-একটি বিষয় বলিবার আছে,—বিষয়টি সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু গুরুতর; সেটি এই যে, সদ্য-প্রতীতি অবশ্যম্ভাবী সত্যের নিদর্শন নহে—যদিচ অনেকেরই সেইরূপ বিশ্বাস। গ্রন্থের মুখ্য-অবয়বে সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণ করা হইবে যে, আমাদের সমস্ত স্বাভাবিক চিন্তা ধারাবাহিক ভ্রম-সিদ্ধান্ত-পরম্পরায় পর্য্যবসিত ; সে সিদ্ধান্ত-গুলির প্রত্যেকেই স্ববিঘাতগর্ভ, অথবা যাহা একই কথা—একটি-না-একটি অবশ্যম্ভাবী সত্যের বিরোধী। কিন্তু তা' বলিয়া এরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না যে, সে সব ভ্রম-সিদ্ধান্ত উচ্চারিত হইবামাত্র অমনি তাহাদের অব্যাহতি-দোষ জাজ্বল্য হইয়া উঠিবে, অথবা জ্ঞানের যে-সকল প্রকৃত তত্ত্ব তাহাদের স্থানে বসিবার উপযুক্ত সেগুলি তদ্দণ্ডেই অবশ্যম্ভাবী বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। জ্ঞানের অনুজ্ঞা পাইতে—আগন্তুক সত্য-সকলের যত না সময় ও সাধ্য-সাধনা আবশ্যক হয়—উচ্চ অঙ্গের অবশ্যম্ভাবী সত্য-গুলির তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী সময় ও সাধ্য-সাধনা অপেক্ষিত হয়।

* গত মাসের পত্রিকায় দর্শন-সংহিতার উপক্রমণিকার একটি পরিচ্ছেদ ভুল-ক্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছে ;

খাড়া করিলাম, তাহার পোষকতায় প্রচুর শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদাহৃত হইতে পারে; তবে কি না—সে প্রমাণ-গুলি খুব-যে বিশদ ও অস্খলিত তাহা নহে (কেন না তত্ত্বজ্ঞান এ-যাবৎকাল যে-ভাবে চলিয়া আসিতেছে—তাহার কোন্‌খানটাই বা বিশদ কোন্‌খানটাই বা অস্খলিত)। এ-সব প্রমাণ এখন নহে;—যখন আমাদের কথার প্রতিবাদ করা হইবে, যখন আমাদের বিরুদ্ধে দেখানো হইবে যে—মনুষ্যের স্বাভাবিক চিন্তা সুলভ অনবধানতার সংশোধন ছাড়া আর-কোন উদ্দেশ্য তত্ত্বজ্ঞানের কোন জন্মে ছিল না থাকিতে পারে, তখন আমাদের পক্ষের সাক্ষীগণকে বিচার-ক্ষেত্রে উপস্থিত করিবার যথেষ্ঠ সময় হইবে।

তর্ক বিতর্ক ব্যতিরেকে তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না।

এই যে একটি সিদ্ধান্ত যে, লৌকিক চিন্তা-সুলভ অনবধানতার সংশোধনার্থেই তত্ত্বজ্ঞানের জন্ম-গ্রহণ, এইটি উহাকে উহার স্বেচ্ছাক্রমে নহে—কিন্তু অগত্যা—বৈতর্কিক করিয়া তুলিয়াছে। ছিদ্রান্বেষণ-ব্যাপার এড়াইতে পারিলে সে পরম সুখী হইত, কিন্তু তাহা না করিয়া সে আপনাকে কিছুতেই সামলাইতে পারে না। তাহাকে বৈতর্কিক হইতে হইবে—এই অঙ্গীকার-সূত্রেই তাহার জন্ম-পরিগ্রহ, তাহার জন্মের সার্থক্য সম্পাদন করিবার জন্যও তাহাকে বৈতর্কিক হইতে হইয়াছে; কারণ, লৌকিক চিন্তার অনবধানতা-দোষ সে যদি তর্ক দ্বারা খণ্ডন না করিবে, তবে আর কি উপায়ে সে তাহার সংশোধন করিবে?

অবজ্ঞা-দোষ হইতে তত্ত্বজ্ঞানকে মুক্তি দেওয়া হইতেছে।

তত্ত্বজ্ঞের বিরুদ্ধে পাছে এই এক অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে, তিনি মনুষ্যের সহজ বুদ্ধির সিদ্ধান্ত সকলকে নিতান্তই হেয় জ্ঞান করেন, এ জন্য এখানে বলা আবশ্যক যে, তত্ত্বজ্ঞ—পরের তত নয় যত আপনার—স্বাভাবিক চিন্তার দোষ ধরেন। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তিনি আপনাকে লইয়াই ব্যাপৃত। মুখ্য-রূপে, তিনি আপনারই চিরাভ্যস্ত অনবধানতা-দোষ সংশোধন করিতেছেন। কেবল অন্যেরাও তাঁহার ন্যায় অনবধানতা-গ্রস্ত হইতে পারে—এই ভাবিয়া তিনি গৌণ-রূপে অন্যেরও সেই দোষের সংশোধনে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সে দোষ তিনি অন্য ব্যক্তিতে দেখিতেছেন না—আপনাতেই দেখিতেছেন, এজন্য প্রধানতঃ তাহা তিনি আপনাতেই আরোপ করেন। এ কথাটি এইবার এই যা বলা হইতেছে, দ্বিতীয় বার ইহার আর উল্লেখ করা হইবে না, অতএব ইহার প্রতি ভাল করিয়া প্রণিধান করা হো'ক্। অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানীও লৌকিক চিন্তা-সুলভ দৌর্ব্বল্যে আক্রান্ত। যে দোষ তিনি দেখাইতেছেন ও যাহার সংশোধনার্থে তিনি চেষ্টা পাইতেছেন, সে দোষে তিনি যে তাঁহার প্রতিবেশীদিগের অপেক্ষা কম দোষী—তাহা নহে। তাঁহার কলহ তাঁহার প্রতিবেশীদিগের সহিত নহে কিন্তু আপনার সহিত; পাত্রটি এখানে এরূপ যে, তাহাকে (অর্থাৎ আপনাকে) সংশোধন এবং শাসন করিতে মনুষ্যের কেবল যে অধিকার আছে তাহা নহে, কিন্তু মনুষ্য তাহা করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য।

এই তন্ত্রটি মনোবিজ্ঞানের বিরোধী।

আরো এই দেখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান তন্ত্র শুদ্ধ যে কেবল লৌকিক চিন্তার বিরোধী তাহা নহে—তাহা মনোবিজ্ঞানেরও অনেকানেক মতের বিরোধী। ইহাও অনিবার্য্য। লৌকিক চিন্তার ভ্রম-সিদ্ধান্ত সকলের সংশোধনার্থে চেষ্টা না করিয়া মনোবিজ্ঞান

ইহা আরো সেই ভ্রমগুলিকে দৃঢ় করিবার জন্য—সত্যরূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য—সাধ্যানুসারে চেষ্টার ত্রুটি করে না। এজন্য লৌকিক চিন্তার উপর যেরূপ দণ্ড-প্রয়োগ হইবে, তাহার ভাগ পাইবার জন্য মনোবিজ্ঞানকেও অগত্যা আসিতে হইতেছে। এটি কোন-রূপে এড়াইতে পারিলেই ভাল হইত—কিন্তু এড়াইবার জো নাই। তত্ত্বজ্ঞান, হয় তাহার অস্তিত্বে জলাঞ্জলি দিক্, নয় লৌকিক চিন্তার ভ্রম-সংশোধন এবং মনোবিজ্ঞানের মত-খণ্ডন এই দুই কার্য্যে প্রবৃত্ত হোক্, এ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ফলে, শুদ্ধ কেবল ঘটনা-ক্রমে তত্ত্ব-জ্ঞান মনোবিজ্ঞানের শত্রুপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এটি হইয়াছে কেবল—মনোবিজ্ঞান লৌকিক মতের উৎসাহ-দাতা এবং সহকারী বলিয়া। লৌকিক চিন্তার বিপক্ষতাচরণ বিল্ক—তত্ত্বজ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী ধর্ম্ম। সে যা হোক্, চিন্তা-শূন্য লোকের স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত-সকলের অপেক্ষা মনোবিজ্ঞানের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত-সকলের খণ্ডন-কার্য্যে অধিকতর দৃঢ়তা এবং নির্দয়তা সহকারে প্রবৃত্ত হওয়া তত্ত্বজ্ঞানের কর্ত্তব্য; কারণ, পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃত সিদ্ধান্ত-গুলি শুদ্ধ কেবল উপেক্ষা এবং অনবধানতা-মূলক ভ্রান্তি-মাত্র, কিন্তু শেষোক্ত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত-গুলি সেই ভ্রান্তির গাত্রে সত্যাভাস পূর্ণ কৃত্রিম বিজ্ঞানের স্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়া তাহাকে মূর্ত্তিমতী মিথ্যা করিয়া পাকাইয়া তোলে। মনোবিজ্ঞান প্রায়শই লৌকিক চিন্তার পোষকতা-কার্য্যে রত, কিন্তু ঘটনা-গতিকে যখন সে আবার—লৌকিক চিন্তার ভ্রম-সংশোধন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, তখন (পরে দেখা যাইবে) সে তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া দূরে থাকুক্—তখন সে আর এক কাণ্ড করিয়া বসে; স্বাভাবিক ভ্রম একতো পূর্ব্ব হইতেই আছে, তাহার সহিত সে আবার তাহার নিজের সৃষ্ট নূতন একটা (কখনো বা অনেক-গুলি) স্ববিঘাত-গর্ভ সিদ্ধান্ত জড়াইয়া ব্যাপারটিকে আরো অপকৃষ্ট করিয়া তোলে।

প্রস্তাবিত তন্ত্র কেন যে, বৈতর্কিক, তাহার কারণ এ-দর্শনের পক্ষে উপরি উক্ত মন্তব্য-গুলিই যথেষ্ট। স্বেচ্ছা-ক্রমে নহে—কিন্তু অগত্যা—এই তন্ত্রটিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইতে হইয়াছে। যে দণ্ডে মনুষ্যেরা তাহাদের মনঃ সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য বিষয়-সম্বন্ধীয় ভ্রান্ত তত্ত্ব-সকল লইয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিবে, সেই দণ্ডে তত্ত্বজ্ঞান পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবে কারণ, তখন আর তাহাকে প্রয়োজন হইবে না।

তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্য পরিষ্কার রূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

অতএব তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষ্য অথবা অভিসন্ধি অথবা কার্য্য সম্বন্ধে পাছে কেহ কোন প্রকার ভুল বুঝিয়া থাকেন, তাহার প্রতিবিধানার্থে পুনর্ব্বার স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করা যাইতেছে যে, লৌকিক চিন্তার অনবধানতা-দোষ সংশোধন করাই তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য; এবং সে অনবধানতা-দোষ যেহেতু প্রায়শই মনোবিজ্ঞান কর্ত্তৃক দৃঢ়ীকৃত হইয়া থাকে—কদাচ সংশোধিত হয় না, এবম্বিধায়—আগে যাহা কেবল বুদ্ধির ভুল হইয়াই ক্ষান্ত ছিল—ক্রমে তাহা পাকিয়া উঠিয়া মূর্ত্তিমতী মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়, এজন্য মনোবিজ্ঞানের খণ্ডন তত্ত্বজ্ঞানের আর একটি কার্য্য। এই দুইটি কার্য্য তত্ত্বজ্ঞানকে সমাধা করিতে হইবে।

তত্ত্বজ্ঞানের স্থাপনাত্মক কার্য্য।

কিন্তু এ যা' বলা হইল—এ যদিও তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্যের একটি সারাংশ, তথাপি এ অংশটি কেবল খণ্ডনাত্মক; অর্থাৎ ইহাতে

কেবল পরমতেরই খণ্ডন হয়, স্বমতের সংস্থাপন হয় না। লৌকিক চিন্তার ভিতর যে-সকল অনবধানতা-মূলক ভ্রম প্রচ্ছন্ন থাকে, ও মনোবিজ্ঞান সেই-সব ভ্রমের যেরূপ পোষকতা করে, তাহার প্রতিবিধান করিতে হইলে একদিকে যেমন ভ্রমগুলিকে উচ্ছেদ করা চাই, আর এক দিকে তেমনি তাহাদের পরিত্যক্ত বসতি-স্থান একটা কিছু দিয়া পূরণ করা চাই। অবশ্য। আর, সেই যে একটা কিছু তাহা—স্বয়ং সত্য। অতএব, তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়ই বলো, কাজই বলো, সংকল্পই বলো, আর একমাত্র উদ্দেশ্যই বলো তাহা সাকল্যে বলিয়া বলিতে হইলে তত্ত্বজ্ঞানের সংজ্ঞা এইরূপ দাঁড়ায়:—কি না লৌকিক চিন্তার অবস্থা-সুলভ অনবধানতা এবং মনোবিজ্ঞানের প্রশ্রয়-পালিত ভ্রম এ দুয়ের স্থানে প্রকৃত তত্ত্ব-সকলের (অর্থাৎ জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী সত্য সকলের) সংস্থাপন—ইহারই নাম তত্ত্বজ্ঞান। এ তো দেখা যাইতেছে দিব্য সোজা কথা: তবুও অনেকে মিথ্যা ঘনাইয়া বলিতে ছাড়েন না যে, তত্ত্বজ্ঞান যে কি তাহা বুঝিয়া ওঠা তাঁহাদের সাধ্যাতীত। তত্ত্বজ্ঞান যে কি, তাহা ঐ আমরা বলিলাম। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, যুক্তির পথ দিয়া সত্যের উপলব্ধিই তত্ত্বজ্ঞান; এখন এই যাহা বলিলাম (কিনা ভ্রম খণ্ডন-পূর্ব্বক সত্যের সংস্থাপন) ইহা ঐ কথারই পুনরুক্তি—কেবল আর-একটু বিবৃত করিয়া নির্ব্বাচিত। এইটি এখানে দ্রষ্টব্য যে, তত্ত্বজ্ঞান আপনার গন্তব্য-পথে যত অধিক অগ্রসর হয়, ও তাহার পথ যত অধিক পরিষ্কৃত হয়, ততই তাহার সংজ্ঞা অধিকতর পরিস্ফুট-রূপে নির্ব্বাচন-সাধ্য হয়। তত্ত্বজ্ঞানের অঙ্কুরিতাবস্থা-সুলভ সংজ্ঞা কাজেই সর্ব্বাপেক্ষা অল্প-পরিস্ফুট; আর, এখন যে সংজ্ঞা-টি নির্ব্বাচিত হইল তাহা যে, পরিস্ফুটতার চরম সীমায় উত্তীর্ণ, তাহাও নহে। ফলে, সত্য সিদ্ধান্ত গুলিকে—অর্থাৎ জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী তত্ত্ব-গুলিকে—যে পর্য্যন্ত না রীতিমত প্রদর্শন করা হইতেছে, সে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানের সংজ্ঞা সাধারণতঃ ভিন্ন লোকের বোধগম্য হইতে পারিবে না। সে তত্ত্বগুলির প্রদর্শন উপক্রমণিকার কর্ম্ম নহে—তাহা সাক্ষাৎ সংহিতারই কাজ। যা হৌক বর্ত্তমান সংজ্ঞা দ্বারা এটা হইতে পারে—উহা-দৃষ্টে, তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য সংকল্প কি, ও বর্ত্তমান প্রয়োজন কি, লোকে তাহা জানিতে পারে; আর, লোকের মাথার ভিতর এই যে এক ভ্রান্তি-বুদ্ধি প্রবেশ করিয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞান বলিতে একরূপ মনোবিজ্ঞানই বুঝায় (যাহার উদ্দেশ্য—কে জানে কি—মিছা কেবল কতক-গুলা মনোবৃত্তি লইয়া নাড়া চাড়া আর ঐ রকমের সব হুই ভুজ্ঞান) এ দুর্ব্বুদ্ধিটি সাধ্য হইতে অপনীত হইতে পারে। কর্ম্মঠ মানুষ বেকার অবস্থায় পড়িলে তাহার যেমন হয়—কাজ খুঁজিতেছে কিন্তু পাইতেছে না—তত্ত্বজ্ঞান এ-যাবৎ কাল সেই ভাবে চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু কি কার্য্য ঠিক তাহার উপযোগী তাহা যখন সে জানিতে পারিয়া আপনার জীবিকা-লাভের একটা কিনারা করিতে পারিবে ও একটা সুনির্দিষ্ট কাজ হাতে পাইবে, তখন তাহার আধি ব্যাধি নির্ব্বাধ হইবে।

কেন তত্ত্বজ্ঞান এ কার্য্যের ভার স্কন্ধে লয়।

উপরি-উক্ত সংজ্ঞাতে যে কার্য্য নির্দিষ্ট হইল, তত্ত্বজ্ঞান কেন তাহা স্কন্ধে লয় তাহা বলিতেই হইবে—এরূপ একটা কোটি ধরিবার কিংবা তাহার উত্তর প্রদান করিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। মনুষ্যের মানস-ক্ষেত্রে ভ্রমের-স্থানে কেন সত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে—ইহার কারণ দর্শানো নিষ্প্র-

য়োজন। তবে যদি ইহার নাম কারণ-দর্শানো হয় যে, ভ্রমের স্থানে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে কেন—না যেহেতু যাহা ঘরে আসিতেছে তাহা সত্য, আর যাহা বাহির হইয়া যাইতেছে তাহা ভ্রম,—সেই যা এক কথা।

তত্ত্বজ্ঞান কিরূপে স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

তত্ত্ব-জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এবং কেন তাহা সে উদ্দেশ্যের অনুগামী হয় তাহাও বলিলাম; এখন সে উদ্দেশ্যটি করায়ত্ত করিবার মানসে তত্ত্বজ্ঞান কিরূপে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাই কেবল বলিবার অবশিষ্ট। তত্ত্বজ্ঞানের অনুষ্ঠান-বিধি যাহা ইতিপূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হইয়াছে (কিনা কিছুই স্বীকার করিবে না—যদি-না তাহা জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী সত্য হয়) সেই অনুষ্ঠান-বিধির সম্যক্ অনুবর্ত্তী হইয়া তত্ত্বজ্ঞান মনুষ্যের স্বাভাবিক-চিন্তা প্রসূত মত সকলকে স্বব্যাহতি-দোষে দোষী নিষ্পন্ন করে। ফলতঃ, লৌকিক সিদ্ধান্ত সকল যদি স্ববিরোধী না হইত, তবে তাহাদের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়ানো তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে নিতান্তই স্পর্দ্ধাসূচক হইত; কারণ, সে সিদ্ধান্ত গুলি যদি স্ববিরোধী না হইল—তবে সে-গুলি যে সত্য নহে তাহা কে বলিল? বরং সেই-গুলিরই সত্য হইবার বেশী সম্ভাবনা—যে হেতু সেগুলি জন-সাধারণের মত। এরূপ হইলে, তত্ত্বজ্ঞান বেশী কি আর করিত? হদ্দ এই করিত—এক শ্রেণীর অনুমানকে সরাইয়া তাহার স্থানে আর-এক শ্রেণীর অনুমানকে আনিয়া পত্তন করিত। অতএব লৌকিক মতের স্বব্যাহতি-দোষ শুধু যে কেবল আরোপ করিলেই হইল তাহা নহে, অবশ্যম্ভাবী সত্যের কর্ত্তৃত্ব-বলে সে কার্য্যটি করা চাই; নচেৎ তত্ত্বজ্ঞান যদি স্বেচ্ছানুসারে বিচার-নিষ্পত্তি করে, তবে তাহাতে তাহার নিতান্তই ঔদ্ধত্য এবং মূঢ়তা প্রকাশ পায়। এটি তবে স্থির যে, লৌকিক চিন্তার প্রত্যেক ভ্রম সিদ্ধান্ত জ্ঞানের একটি-না-একটি অবশ্যম্ভাবী সত্যের বিরোধী। সংহিতায় এ বৃত্তান্তটি দেখানো হইয়াছে—পেঁচাও তর্কবিতর্ক দ্বারা নহে—কিন্তু একদিকে লৌকিক ভ্রম সিদ্ধান্ত গুলি এবং আর একদিকে জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী সত্য-গুলি উভয়কে মুখামুখি দাঁড় করাইয়া। উপরি-উক্ত বিবেচনাটি নিম্ন-কৃত প্রণালী বন্ধনের মূল। এই গ্রন্থে জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী সত্য-সকল ধারাবাহিক সিদ্ধান্ত-পরম্পরা ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ বিন্যস্ত হইয়াছে; আর, প্রত্যেক সিদ্ধান্তের সঙ্গে একটি করিয়া প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে,—সে প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত লৌকিক-চিন্তা-হইতে স্ববিবাক্ত-গর্ভ ভ্রান্তি বই আর কিছুই নহে,* ইহা করিলেই দুই পক্ষের মধ্যে সংগ্রাম লাগাইয়া দেওয়া যাইতে পারে; ইহাতে লাভ এই যে, কি ব্যাপারে আমরা ব্যাপৃত হইতেছি—কিসেরই বা সপক্ষে আর কিসেরই বা বিপক্ষে আমরা যুঝিতেছি, তাহা আমাদের নিকট অপ্রকাশ থাকিতে পারিবে না। সর্ব্বত্রই এইরূপ দৃষ্ট হইবে যে, কোন একটি বিষয়-ঘটিত মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত—সেই বিষয়-ঘটিত লৌকিক সিদ্ধান্তের সহিত—সর্ব্বাংশেই হউক্ আর কিয়দংশেই হউক্ (প্রায়শই সর্ব্বাংশে) অভেদাঙ্গ; এই জন্য প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত-গুলি—এক দিকে মনোবিজ্ঞানের ভ্রমাচ্ছন্ন উপদেশ এবং আর-এক দিকে অনবধানতা-মূলক লৌকিক সিদ্ধান্ত—উভয়কেই আপনাতে একাধারে মূর্ত্তিমান করিবে। শরীরের যেমন বাম-দক্ষিণ অবয়ব-শ্রেণী, বর্ত্তমান সংহিতার তেমনি সপক্ষ-প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত-শ্রেণী।

* এখানে যাহাকে প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত বলা যাইতেছে, পুরাতন দর্শনশাস্ত্রে তাহা পূর্ব্ব-পক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্য-পদ্ধতির আরো বিবরণ।

সপক্ষ সিদ্ধান্ত-গুলি এবং তাহাদের প্রমাণ-প্রদর্শন প্রস্তাবিত গ্রন্থের মূলাংশ বা মুখ্যাংশ। ইহাই দর্শন-সংহিতা। প্রথম সিদ্ধান্তটি বিনা-প্রমাণে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক সিদ্ধান্তই কতক-গুলি ধারাবাহিক মন্তব্য এবং ব্যাখ্যান দ্বারা পরিপুষ্ট। এই সকল মন্তব্য এবং ব্যাখ্যানের উদ্দেশ্য আর কিছু নয়—মুখ্য সিদ্ধান্তের মধ্যে যাহা কিছু অস্পষ্ট এবং কঠিন বোধ হইবে (সে যে ভাবেই হউক্ আর যেনেই হউক) তাহাকে স্পষ্ট এবং সুগম করিয়া দেওয়া, আর, বৈতর্কিক এবং ঐতিহাসিক বিবরণ যেখানে যাহা আবশ্যক মনে হইবে তাহা যোগাইয়া দেওয়া। এই ভাষ্য-গুলি সংহিতার ন্যায় অতটা কড়াক্কড় হইবে না। হয় তো উহারা যতটা পূর্ণাবয়ব হইতে পারিত তাহা হয় নাই; কিন্তু সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তত্ত্বজ্ঞানের মূল কাণ্ডের যে যে গ্রন্থি-স্থান হইতে ছোটো ছোটো—কদাচিৎ বা বড় বড়—মতামতের ফ্যাকড়া বাহির হইয়াছে, ঐ ভাষ্যগুলি সেই সেই গ্রন্থি-স্থান ঠিক্ ঠাক্ দেখাইয়া দিবে। নানা কারণ-বশতঃ প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত-গুলিকে সপক্ষ সিদ্ধান্ত-গুলির ঠিক্ পরে পরে বসানো সকল সময়ে (বলিতে কি প্রায়শই) ঘটিয়া ওঠে নাই। সেগুলি মন্তব্য এবং ব্যাখ্যানের সীমাভ্যন্তরে স্থান পাইয়াছে, এবং আবশ্যক মতে তাহাদের কর্ত্তৃক বিশদীকৃত হইয়াছে। প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত-গুলি সকল-বিষয়েই সপক্ষ-সিদ্ধান্তগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী; আর, শুদ্ধ যদি কেবল তাহাদেরই প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায় তবে দেখা যাইবে যে, তাহারা সর্ব্বশুদ্ধ ধরিয়া সত্যাভাসের একটি সুসম্বদ্ধ বিগ্রহ। সে বিগ্রহটির বিরুদ্ধে আপত্তি কেবল এই যে, প্রতিপদেই তাহা একটি-না একটি সার্ব্বভৌমিক সত্য বা জ্ঞানের মূলতত্ত্ব উল্টাইয়া দেয়। কিন্তু কেহ যদি সে আপত্তি অগ্রাহ্য করেন, তবে তাঁহার মনের মত—মনোবিজ্ঞানের শাস্ত্রীয় মত এবং জনসাধারণের স্বাভাবিক মত—উভয়েরই একটা পারিপাটি-শৃঙ্খলা-বিশিষ্ট সন্দর্ভ তিনি তাঁহার সম্মুখে কাছে সুসজ্জিত পাইবেন। যদি অভিরুচি হয়—স্বচ্ছন্দে তিনি তাহাকে আলিঙ্গন করিতে পারেন ও যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানকে সমূলে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন। তিনি দেখিবেন যে, সত্য এবং ভ্রম—বিদ্যা এবং অবিদ্যা—উভয়কে ক্রমাগত পাশাপাশি সম-ব্যবধানে লইয়া চলা হইয়াছে; যাহাকে তাঁহার পছন্দ হয় তাহাকেই তিনি গ্রহণ করিতে পারেন।

এইরূপ প্রণালীর গুণ।

বুঝাই যাইতেছে—এইরূপ প্রণালীতে চলিলে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি নিম্ন-লিখিত-রূপ ফল-লাভ করিবেন। তিনি তাঁহার [illegible] বা পথের প্রত্যেক বিরাম-স্থানে—কোন্ মতটাই বা ঠিক্ আর কোন্ মতটাই বা ভুল—তাহা দেখিতে পাইবেন। দুয়ের তুলনা-গতিকে তিনি দুইকেই ভাল করিয়া বোধগম্য করিতে পারিবেন। যাহা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে বলা হইতেছে তাহা কেবল নয়, তা ছাড়া যাহা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে বলা হইতেছে, তাহাও তিনি দেখিতে পাইবেন। দার্শনিক মত এবং লৌকিক মত এ-দুয়ের পরস্পর-বিরোধিতা তাঁহার চক্ষে স্পষ্ট ধরা পড়িবে। ইহাও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, লৌকিক চিন্তা (যাহা কখনো কখনো সামান্য বুদ্ধি বলিয়া সংজ্ঞিত হয়) এবং তত্ত্বজ্ঞান, এ দুয়ের বিবাদ-ভঞ্জন খুবই ভালরূপে হইতে পারে—যদি সেই সামান্য বুদ্ধি অলঙ্ঘনীয় তত্ত্বজ্ঞানের বিচার-নিষ্পত্তি নির্ব্বিবাদে ঘাড় পাতিয়া লয়।

সত্য এবং মিথ্যা উভয়ের তুলনা না করিবার দোষ।

কোন একটি তত্ত্ব কোন একটি বিষয়ের সম্বন্ধে (বিশেষতঃ এখনকার মত এইরূপ বিষয়ের সম্বন্ধে) যদি কেবল সত্য মতটি সংস্থাপন করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে, তবে তাহা স্বকার্য্যের অর্দ্ধাংশ-মাত্র সমাধা করে, আর তাহাও পরিপাটী রূপে নহে; কারণ ভ্রান্ত মতটি প্রকাশ্যে আনীত এবং স্পষ্টরূপে খণ্ডিত না হওয়াতে তাহা জিজ্ঞাসু ব্যক্তির মন হইতে অপনীত হয় না—এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া আরো দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হয়। তাহা হইলে, দুই পক্ষের তুলনা-বিরহে, কিসে-যে উভয়ের মধ্যে অনৈক্য তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তাহা হইলে, সত্য এবং ভ্রম দুইই মনো-মধ্যে এক-সঙ্গে বর্ত্তিয়া থাকে, কিন্তু এরূপ শয্যাগত মুমূর্ষু-ভাবে বর্ত্তিয়া থাকে যে, তাহা না থাকারই সামিল। ভুল সিদ্ধান্তটি (স্পষ্টরূপে নহে কিন্তু অনির্দ্দেশ্য এবং অপরিস্ফুট রূপে) প্রতিরুদ্ধ হওয়াতে তাহার পূর্ব্বতন প্রভুত্বের অনেকটা তেজ খর্ব্ব হইয়া পড়ে, আর সত্য সিদ্ধান্তটি ভুলের মলিন সংসর্গে একে তো কলুষিত তাহাতে সে আবার ভিতরে ভিতরে আপনার পূর্ব্বতন আধিপত্য পুনর্জ্জীবিত করিবার চেষ্টায় পরিক্লান্ত হওয়াতে, সে—তাহার উজ্জ্বল-তম এবং অমোঘ-তম রশ্মি-গুলি হারা হইয়া ক্ষীণ-প্রভায় মিট মিট করিতে থাকে। সত্য মত এবং ভ্রান্ত মতের মধ্যে—দার্শনিক মত এবং লৌকিক মতের মধ্যে—এই যে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অনির্দ্দেশ্য বিবাদ, ইহাই সংশয়-বাদের এবং অব্যবস্থিত তত্ত্বচিন্তার মূল-কারণ।

সত্যাসত্যের তুলনা-শৈথিল্যই অবোধ্যতার মূল।

দর্শন-কারেরা সত্য এবং মিথ্যার মধ্যগত বিরোধ স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতে অবহেলা করাতেই সাধারণতঃ দর্শন-শাস্ত্র অবোধ্যতা দোষে জড়াইয়া পড়িয়াছে; আর এই ব্যাপারটি, দর্শন-ঘটিত যত কিছু গোলযোগ, সমস্তেরই মূল। দর্শন-শাস্ত্রের পুরাবৃত্তের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয়-লাভ হইলেই ইহা-আর কাহারো অবিদিত থাকে না যে, পূর্ব্বতন দার্শনিকেরা শিক্ষিতব্য সত্য এবং পরিবর্জ্জনীয় ভ্রম এ দুয়ের বৈলক্ষণ্য স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে অবহেলা করাতেই সমস্ত দার্শনিক ব্যাপার অবোধ্যতার আকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রীক দেশের প্রধানতম তত্ত্ববিৎ প্লেটোর "আদর্শ জগৎ" সাধারণতঃ অবোধ্য কেন? শুদ্ধ কেবল এই জন্য যে, লৌকিক মত-সকলের অন্তর্গত কোন্ মতটিকে খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি ঐ দার্শনিক তত্ত্বটির অবতারণা করিয়াছেন—তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলেন নাই। জর্ম্মান-দেশীয় তত্ত্ববিৎ স্পিনোজা'র "আধার-বস্তু" এখনো পর্য্যন্ত অর্থ-হীন রহিয়াছে কেন? ঐ একই কারণ-বশতঃ। উহা কোন্ লৌকিক ভ্রমের প্রতিদ্বন্দ্বী তাহা আমরা অবগত নহি। সুবিখ্যাত লাইব্‌নিট্‌জের "তন্মাত্র," তেমনি আবার তাঁহার "পূর্ব্বনিবদ্ধ কার্য্য-কারণ-সূত্র," এ সব রহস্যের এখনো পর্য্যন্ত চাবি মিলিতেছে না কেন—অথবা চাবি যাহা মিলিতেছে তাহা তালায় লাগিতেছে না কেন? শুদ্ধ কেবল এই জন্য যে, লৌকিক চিন্তার কোন্ ভ্রমটির পরিবর্ত্তে তিনি তাঁহার কোন্ মতটি স্থাপন করিতে অভিলাষী, তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। জর্ম্মাণ দেশীয় তত্ত্ববিৎ হেগেল্ কেন আগা-গোড়া বজ্র-সংহত পর্ব্বতের ন্যায় অভেদ্য? কি জানি—তিনি হয় তো প্রকাণ্ড একটা অজগরের ন্যায় লৌকিক একটা ভ্রমকে শরীরের ফাঁদের বশে আনিয়া পিষিয়া গুঁড়া গুঁড়া করি-

তেছেন, কিন্তু সে ভ্রমটি যে কি তাহা তিনি কোথাও প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। প্রবল পাক-চক্রের পেষণে তিনি হয় তো সে ভ্রমটির একখানিও অস্থি অবশিষ্ট রাখেন নাই—কিন্তু আমরা তাহা জানি না। তাঁহার সিদ্ধান্ত-গুলি (অবশ্য তাহাদের আপনাদের রীত্যনুযায়ী অস্পষ্ট এবং জটিল রকমে) কোন-না-কোন লৌকিক মত খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে—ইহাতে আর ভুল নাই; কিন্তু সাক্ষাৎ কল্পে (এমন কি দূর কল্পেও) দর্শনকার সে-সম্বন্ধে একটি কথাও উল্লেখ করেন নাই। তত্ত্বজ্ঞানের গতি-রোধক কারণের কথা পূর্ব্বে যাহা আমরা বলিয়াছি—ঐ প্রকার অবহেলা বা ত্রুটি তাহারই পোষকতা করিতেছে; গতি রোধক কারণ-সে এই;—প্রবর্ত্তক মূলতত্ত্ব-গুলি—গোড়ার কথা—দৃঢ় মুষ্টিতে আয়ত্ত না করা ও চক্ষু মেলিয়া ভাল করিয়া না দেখা; কি কার্য্য করিতে হইবে এবং কি উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে তাহা পরিষ্কার-রূপে না জানা। কারণ, যদি এ সব দর্শন-ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের শাস্ত্র কি তাহা জানিতেন, তবে তাহা তাঁহারা বলিতেন, তাহা শুধু নয়—তাহা তাঁহারা করিতেন। কিন্তু সে-বিষয়ে হয় তাঁহারা একেবারেই চুপ, নয় এমনি ইতস্তত করিয়া কথা বলেন যে, তাহা অপেক্ষা চুপ থাকাই ভাল ছিল। এ জন্য, যদিও তাঁহারা মহোচ্চ প্রতিভা-সম্পন্ন এবং "অবিনশ্বর বস্তু-সকলের প্রশান্ত স্রষ্টা" তথাপি অবোধ্যতা-দোষে তাঁহাদের পশ্চাদ্যস্ত অন্তিম দানের মূল্য অনেকাংশে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে; তাঁহাদের প্রকৃত কার্য্যের অর্দ্ধেক-খানি কেবল তাঁহারা হস্তে লইয়াছিলেন বলিয়া এরূপ ঘটিয়াছে। মানিলাম তাঁহারা আমাদিগকে সত্য প্রদান করিয়াছেন—নিঃসন্দেহ তাহা তাঁহারা করিয়াছেন; কিন্তু যতক্ষণ সত্যকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রমের সহিত তুলারূঢ় করা না হয়, ততক্ষণ তাহা সর্ব্বাংশে না হউক, অনেকাংশে বুদ্ধির অগম্য থাকে। উপরি-উক্ত দর্শন-কারেরা সেই প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রম-গুলিকে চক্ষের সম্মুখ হইতে সরাইয়া রাখিতে বিধিমত-প্রকারে প্রয়াস পাইয়াছেন, এই জন্য ঐ সকল এবং আর আর অনেক দর্শনকারদিগের সম্বন্ধে সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের শাস্ত্র কাহারো বোধগম্য হইবার নহে, শাস্ত্রকারের নিজের অন্য লোকে তো নহেই—তবে যদি জিজ্ঞাসু ব্যক্তি আপনার প্রদীপ আপনি খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিয়া তাহা অনুসন্ধানক্ষেত্রে সঙ্গে করিয়া আনে, এবং আপনি তাহার উপকরণ সকল গুছাইয়া ঠিক করে, তাহা-হইলেই যা। যে কোন সত্য হউক না কেন তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রমই তাহার আলোক; এ জন্য, সত্যের চিন্তার সময়ে এবং তাহার প্রদর্শনের সময়ে, তত্ত্ববিদ্গণের, এইটির প্রতি সবিশেষ সাবধান হওয়া উচিত যে, তৎকালে তাঁহারা যেন অতিমাত্র গৌরবকে আশ্রয় করিয়া ভ্রমের চিন্তা এবং প্রদর্শন হইতে সরিয়া না দাঁড়ান; প্লেটো স্পিনোজা লাইব্‌নিট্‌জ হেগেল্ প্রভৃতি মহাত্মারা নিশ্চয়ই ঐরূপ করিতে গিয়া আপনারাই আপনাদের গভীর জ্ঞান-চর্চ্চা মাটি করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য মনুষ্য-সাধারণকে বিস্তর ক্ষতি ভোগ করিতে হইতেছে; তাঁহাদের প্রদর্শন-পদ্ধতি যদি অন্যরূপ হইত, তবে তাঁহাদের সুমহৎ জ্ঞান সাধারণের প্রভূত উপকারে আসিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই তন্ত্র সত্য মিথ্যার তুলনা-সংস্থাপক।

এই জন্য এই তন্ত্র উহাঁদের ও-পথে না গিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্ন-বর্ত্তী অন্যবিধ পথ অবলম্বন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। ইহার কেবল চেষ্টা—সত্যকে বোধ-সুলভ

করা ; তাই, ভ্রমের সহিত প্রবল এবং স্পষ্ট প্রতিযোগিতার গুণে সত্যের উপরে যেরূপ আলোক নিপতিত হয়, তাহাই ইহার প্রধান নির্ভর-স্থল। ইহা প্রতিদ্বন্দ্বী মিথ্যার সাহায্যে সত্যকে পরিস্ফুট করিতে অভিলাষী। সপক্ষ এবং প্রতিপক্ষ উভয়বিধ সিদ্ধান্তের সন্নিবেশ-পদ্ধতি কতক-টা নূতন-ধরণের বটে, কিন্তু উপরিউক্ত বিবেচনা-টি তাহার মূল-প্রবর্ত্তক। অবিমিশ্র দার্শনিক ব্যাপারে ব্যাপৃত হইতে হইলে ঐ-টিই তাহার একমাত্র নিশ্চিত পদ্ধতি ; কারণ, সাধারণ বোধ লোকের পক্ষে উহা সবিশেষ উপকারী, আর উহা দার্শনিক আলোচনা-সুলভ সংশয়াত্মকতা দ্বৈধ এবং অব্যবস্থিতি সমস্তেরই অপহন্তা। অন্যবিধ পদ্ধতি যাহার সংকল্প কেবল সত্যেরই প্রদর্শন—ভ্রমের প্রতি-প্রদর্শন নহে—তাহাকে ঐ সকল প্রয়োজনীয় ব্যাপারে বঞ্চিত হইতে হয়।

ক্রমশঃ।

স্বর্গ ও নরক।

ঐ যে অশীতিপর বৃদ্ধ দেখিতেছ, আহা উহাঁর কি সুন্দর মুখ-শ্রী! বদন-মণ্ডলে কি পবিত্র ও মহৎ ভাব উপচিয়া পড়িতেছে! মুখে পূর্ণ বিমলানন্দের চিহ্ন কেমন স্পষ্ট প্রতিভাত! উহাতে বিষাদের চিহ্ন নাই, দুশ্চিন্তার কালিমা নাই, নৈরাশ্যের অন্ধকার নাই। এই বৃদ্ধ-বয়সেও ইহাঁর শরীর কি তেজঃপুঞ্জপূর্ণ! দেহের কি মনোহর কান্তি! যেন পূর্ণ স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি। ইহাঁর যেরূপ বাহ্য মহত্ত্বব্যঞ্জক সৌন্দর্য্য, আন্তরিক সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব তদপেক্ষা অধিক। ইনি সমস্ত জীবনে কখন জানিয়া শুনিয়া কোন পাপ-কার্য্যের, কোন অপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই। আজীবন অক্লান্ত ভাবে ধর্ম্মের সেবা করিয়া আসিয়াছেন। কখন কোন কর্ত্তব্য কার্য্যের অবহেলা করেন নাই। স্বীয় শক্তি ও সাধ্যানুসারে চিরকাল আত্মীয় স্বজনের স্বদেশের ও মানবজাতির কল্যাণ সাধন করিয়া আসিয়াছেন। রিপুগণ কখন ইহাঁকে বশীভূত করিতে পারে নাই, রিপুগণকে ইনি সর্ব্বদা বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। পাপ প্রলোভনে ইনি কখন প্রলুব্ধ হয়েন নাই, বিবেক-বলে ইনি শত শত প্রলোভনকে পরাজয় করিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখ ও আনন্দ লাভ করিয়াছেন। পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে বলিতে পারে যে ইনি তাহার প্রতি কখন কোন অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন কিম্বা তাহাকে কোন প্রকারে মনঃকষ্ট দিয়াছেন। ইহাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাস অতি গভীর, দৃঢ় ও অবিচলিত। ইহাঁর জীবনে কত ঘটনা হইয়াছে যাহা অবিশ্বাসীর চক্ষে বড়ই ভয়ানক, ও বিধাতা-পুরুষের ঘোরতর নির্দ্দয়তার পরিচায়ক, কিন্তু ইহাঁর এমনি বিশ্বাস বল যে ইনি সে সকল ঘটনায় ঈশ্বরের নিয়মের সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার দয়ার পরিচয় পাইয়াছেন। অতীত জীবনের কার্য্যাবলী চিন্তা করিয়া ইনি তাহাদিগের মধ্যে এমন একটীও কার্য্য দেখিতে পান না যাহার জন্য ইনি দুঃখিত বা অনুতপ্ত হইতে পারেন। বর্ত্তমান জীবনে ইনি ইহাঁর ধর্ম্মবলে, বিশ্বাস-বলে, বিবেক-বলে ও পবিত্রতা-বলে পরম সুখী, আর ভবিষ্যত্ জীবন সম্বন্ধে ইনি কিছুমাত্র চিন্তিত বা সন্দিগ্ধ নহেন—ভবিষ্যতের পারলৌকিক আধ্যাত্মিক সুখৈশ্বর্য্য ইহাঁর বিশ্বাস-চক্ষুর সম্মুখে সর্ব্বদা জ্বলন্ত-রূপে প্রকাশিত। ইনি স্বীয় জীবনের পবিত্র অতীত ভাবিয়া, পবিত্রতর বর্ত্তমান উপভোগ করিয়া এবং পবিত্রতম ভবিষ্যৎ দর্শন করিয়া পরম সুখী। ইহাঁর আত্মা সর্ব্বদাই প্রেমে উন্মত্ত, শান্তিতে অভিষিক্ত, আনন্দে উৎফুল্ল, আশায় উল্লসিত ও ঈশ্বরে অভিনিবিষ্ট। এই পৃথিবীতে ইনিই স্বর্গের প্রতিরূপ।

ব্রাহ্মসমাজ এবং ইহার অতীত ও বর্ত্তমান।

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম কাল তর্কের কাল। এতদ্দেশীয় অনেকেই এ সময়ে উপহৃত ছিল। অনেকে প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্মে তৃপ্ত না হইয়া খ্রিষ্টীয় পৌত্তলিকতা আশ্রয় করিতেছিল। সেই সময় রামমোহন রায় সকলকে প্রকৃত ধর্ম্মে স্থাপন করিবার উদ্দেশে হিন্দুসমাজে এমন তর্ক উপস্থিত করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ভ্রান্তি-নিরাস। হিন্দুশাস্ত্র হইতে সেই ভ্রম বদ্ধমূল হইয়াছিল এবং সেই শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যায় তাহা দূর হইয়া যায়। কিন্তু রামমোহন রায় হিন্দুসমাজের যে অবস্থায় উদিত হন তখন স্বাধীন মত প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল না। দেশকাল তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। তিনি মনের সকল কথা সকলের সহিত বলিতে পারিতেন না। হিন্দুর নিকট তাঁহার উপদেশদ্বার শাস্ত্র। কারণ স্বাধীন বুদ্ধি অপেক্ষা তখন শাস্ত্রেরই প্রামাণ্য অধিক ছিল। সুতরাং তিনি সেই শাস্ত্রপ্রমাণে যা কিছু বুঝাইতে পারিতেন তাহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইত। এইরূপে তিনি শাস্ত্র দ্বারা একেশ্বরবাদ সিদ্ধ করিলেন বটে কিন্তু শাস্ত্রই আবার ভবিষ্যতে বিশেষ অনর্থের মূল হইয়া উঠিল। রামমোহন রায়ের অবলম্বন প্রধানত বেদ ও বেদান্ত। নিত্যতাই বেদের প্রামাণিকতা এই বিশ্বাস তৎকালে লোকের অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট ছিল। কিন্তু রামমোহন রায়ের কার্য্য-প্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে কিছুতেই বোধ হয় না যে তিনি এই সাধারণ বিশ্বাসের অনুসরণ করিয়াছেন। তথাচ তিনি যখন দেশকালপাত্রের অনুরোধে এই বিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়া যান তখন লোকের মনে বেদের নিত্যতার উপর বিশ্বাস অটল ছিল। তাঁহার লক্ষ্য যে কোনরূপে হউক দেশব্যাপী উপধর্ম্ম নির্ম্মূল করিতে হইবে। তিনি বুঝিয়াছিলেন ধর্ম্ম উন্নত না হইলে নির্জীব হিন্দুসমাজে পুনরায় সজীবতা আসিবে না। লোকে বেদকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করুক আর নাই করুক তাহাতে কিছু আইসে যায় না। বেদ-প্রমাণে যদি একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় বর্ত্তমানে এই টুকুই পরম লাভ। সম্ভবত তিনি এই জন্য বেদের উপর কোন রূপ আঘাত করিতে নিরস্ত ছিলেন। কিন্তু এদিকে তাঁহার সহযোগী সুপণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁহার মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজে যে সকল উপদেশ দেন তাহা পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনি শঙ্করের ন্যায় বেদ ও অনুভবকে ঈশ্বরসিদ্ধির প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তাঁহার উপদেশের স্থানে স্থানে স্পষ্টাক্ষরে এই কথাও আছে যে মনুষ্য চরমে ঈশ্বরে লীন হয়*। বিদ্যাবাগীশ প্রাচীন কল্পের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। যে শিক্ষা রামমোহন রায়কে স্বাধীন বুদ্ধি দিয়াছিল কিছু দিন পূর্ব্বের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সেরূপ শিক্ষা ছিল না। ফলত তিনি যে একজন বৈদান্তিক ছিলেন সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ হয় না। এই বেদান্তবিৎ পণ্ডিত যে উপদেশ ও আলাপে লোকের মনে বেদের নিত্যতা ও বৈদান্তিক ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া যান এই বিষয়ে তাঁহার শাস্ত্র-ব্যাখ্যানই প্রমাণ। যাহাই হউক বেদ নিত্য এবং ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম বৈদান্তিক ধর্ম্ম ব্রাহ্মসমাজের প্রথম ইতিহাসে যে এই কথা পাঠ করা যায়, সম্ভবত এই টুকুই তাহার মূল।

ইহার পর শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের কাল বা ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার ও

* বিদ্যাবাগীশের ৭১২০ ব্যাখ্যান দেখ।

কার্য্যের কাল। ইহা একটী প্রসিদ্ধ কথা যে এক সময় কোনও আকস্মিক ঘটনায় ইহাঁর মনে একটা ঘোর ঔদাস্য আইসে। সেই ঔদাস্য দূর করিবার জন্য ইহাঁর ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। তিনি বিদ্বেষ ও পক্ষতাদি দোষ শূন্য হইয়া সরল মনে বহুদিন নির্জ্জনে ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করেন। ইহার ফল তাঁহার আত্মজ্ঞান। একদা এই মহামতি অচিন্ত্যের জগতের [illegible] দেহের একতা উপলব্ধি করিতেছিলেন এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিলেন যে এই জড় হইতে স্বতন্ত্র অথচ এই জড়ের দ্রষ্টা স্রষ্টা আর একটী কিছু আছে। তাহাই আত্মা। এই আত্মজ্ঞানে পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান অনুস্যূত। অতএব যে চেতন-পদার্থ আত্মজ্ঞান তাহা সুস্পষ্ট প্রতিপাদন করিল। তিনি ব্রহ্ম-স্বরূপে একরূপ নিঃসংশয় হইলেন। পরে তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ বেদান্তের আলোচনায় প্রবৃত্তি হয়। তিনি এই সকল শাস্ত্রে আপনারই হৃদিস্থিত ব্রহ্মভাবের বিকাশ দেখিতে পাইয়াছিলেন। সুতরাং তদবধি ইহার উপর তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মে। পরে এই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা হয় বলিয়া ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার সংযোগ ঘটিল। ফলত এইটী ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে একটী বিশেষ সময়। রামমোহন রায়ের প্রখর মস্তিষ্কের উপর ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি কিন্তু প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সুপ্রশস্ত হৃদয়ের উপর ইহার স্থিতি। রামমোহন রায় শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া বুদ্ধিবলে এক ব্রহ্মকে উদ্ধার করেন কিন্তু ইনি প্রাণের পিপাসা শান্তি করিবার জন্য প্রখর অনুসন্ধানে অন্তরাত্মায় পরমাত্মার দর্শন পান। এক জন জ্ঞান-প্রধান আর এক জন ভাব-প্রধান। ধর্ম্মজগতে এই দুই উপাদানই অপরিহার্য্য এবং দুইজনেরই গৌরব একই রূপ। ফলত এই সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। রামমোহন রায়ের ইচ্ছা কেবল হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার, সুতরাং তিনি কেবল শাস্ত্রীয় সূত্রে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। কিন্তু তিনি তর্কমুখে শাস্ত্রে যে সমস্ত আবর্জ্জনা আছে বেদান্তের অনুরোধে তাহা পরিষ্কার করিতে পারেন নাই। প্রধান আচার্য্য মহাশয় প্রথমত তাহারই সংস্কার আরম্ভ করেন। তাঁহার সঙ্কলিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রতি পদে প্রতি ছত্রে এই সংস্কৃত হিন্দুধর্ম্ম পাঠ করা যায়। ফলত বেদ বেদান্তই এই গ্রন্থের প্রাণ ও প্রতিষ্ঠা। রামমোহন রায়ের তর্কমুখে শাস্ত্র হইতে যে সমস্ত জ্ঞানবিরোধি মত ও বিশ্বাস আসিয়াছিল এই গ্রন্থ তাহার জীবন্ত প্রতিবাদ। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ধর্ম্মশিক্ষক স্বয়ং আত্মা। তিনি অচিন্তায় ধর্ম্মকে পান। বাহ্য ও আন্তর প্রকৃতি এই বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছিল। ইহা দ্বারা তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি হয় ধর্ম্মের উৎস স্বয়ং আত্মা। তখন তিনি জলদগম্ভীর স্বরে প্রচার করিলেন বেদ অনিত্য। যে কোন দেশের যে কোন গ্রন্থে সত্য আছে তাহাই ব্রাহ্মের শাস্ত্র। বেদের ন্যায় কোরাণ বাইবেল সকলই ব্রাহ্মের শাস্ত্র। ব্রাহ্মসমাজ এত কাল বেদ সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত মত পোষণ করিতেছিল এতদিন পরে তাহার মূল শিথিল হইয়া পড়িল।

এখন প্রশ্ন এই যে এদেশে বেদ নিত্য বা অপৌরুষেয় বলিয়া বহুকাল যাবৎ আদৃত কেন। আমাদের বোধ হয় ইহার একটু বিশিষ্ট কারণ আছে। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা

ধর্ম্মনির্ণয়স্থলে বলিয়াছেন, যিনি জ্ঞানী ও সাধু, যাঁহার পক্ষপাত ও বিদ্বেষ কিছু মাত্র নাই, তিনিই হৃদয়ে ধর্ম্মের অনুমান করিতে পারেন। আমরাও বলি এই রূপ অধিকারির নিকট ধর্ম্মানুমানে বেদের প্রামাণিকতা যৎস্বল্প। কিন্তু এরূপ অধিকার সকলের পক্ষে সুলভ নয়। এই জন্য দূরদর্শী শাস্ত্রকারেরা যথেচ্ছ পরিবর্ত্তের মুখ হইতে সৎধর্ম্ম ও সদাচারকে রক্ষা করিবার আশয়ে বেদ নিত্য বা অপৌরুষেয় বলিয়া একটা শাসন রাখিয়া যান। কেবল এই দেশেই বা কেন অন্যান্য দেশেও লোকে স্ব স্ব ধর্ম্ম-শাস্ত্রে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করে। তবে বিভেদ এই যখন কুত্রাপি কোনও ধর্ম্ম-শাস্ত্র হয় নাই তখন এই ভারতে বেদের এই মহিমা প্রচারিত হইয়াছিল। ফলত এইরূপ প্রচার একটা শাসন মাত্র। ইহার গূঢ় উদ্দেশ্য অনধিকারিদিগের জন্য ধর্ম্মের একটা ব্যবস্থা স্থাপন। নচেৎ ধর্ম্ম ও আচারে লোকের একতা না থাকিবারই সম্ভাবনা। পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের কোনও একটি আকস্মিক ঘটনায় ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় এবং তিনি বিদ্বেষ ও পক্ষপাতাদি দোষ শূন্য হইয়া সরল মনে ধর্ম্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। ইহার ফল তাঁহার আত্মজ্ঞান। অধিকারিতার পক্ষে এই টুকুই যথেষ্ট প্রমাণ। সুতরাং ধর্ম্মানুমানে তাঁহার হৃৎপ্রত্যয় পর্য্যাপ্ত ছিল। কিন্তু এইরূপ অধিকার সকলের পক্ষে সুলভ নহে। ইহা মনুষ্য-প্রকৃতির একটা অবস্থান্তর প্রাপ্তির প্রসক্তি রাখে। ফল কথা সাধন-সাপেক্ষ। এই জন্য প্রধান আচার্য্য মহাশয় বেদের নিত্যতা অস্বীকার করিয়াও স্বয়ং অটল রহিলেন কিন্তু বেদের সম্বন্ধে তাঁহার উক্তরূপ ঘোষণা গূঢ় রূপে ব্রাহ্মসমাজে একটা বিস্ময়কর পরিবর্ত্তের বীজ রোপণ করিল। ব্রাহ্মসমাজে যখন এই ঘটনা হয় তখন এদেশে জ্ঞানকরী বিদ্যা কেবল ইংরাজী। একেতো দেশীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রের চর্চ্চা প্রায়ই ছিল না। তাহার উপর আবার ইংরাজী শিক্ষা এ দেশের ধর্ম্ম ও এ দেশের আচারের উপর লোকের মনে একটা বিদ্বেষ জন্মাইতেছে। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এইরূপ যে শিক্ষা ইহাই স্বয়ং কুসংস্কার এবং ইহাই ধর্ম্মানুমানের ব্যাঘাতক হইয়া উঠিল। সুতরাং তৎকালে কেবল ইংরাজীশিক্ষার বলে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে বাইবল ও খ্রিষ্টকে ধর্ম্ম-শিক্ষকের পবিত্র অধিকার অর্পণ করিলেন। আমরা বলিয়াছি যে বেদ বেদান্তে আপনার হৃদিস্থিত ধর্ম্ম-ভাবের প্রতিবিম্ব আছে বলিয়া উহাতে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের হৃদয়ের অনুরাগ। এতদ্ব্যতীত বেদ বেদান্ত অবলম্বনে তাঁহার আরও কিছু গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। রামমোহন রায় হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুসমাজের সংস্কারক। তিনি তাঁহারই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতেছেন। সুতরাং এই লোকহিতৈষণা বৃত্তিতে অটল বলিয়া ইংরাজী শিক্ষা তাঁহার উপর কোনও আধিপত্য করিতে পারিল না। তিনি যদিও এক দিকে বেদের অনিত্যতা ঘোষণা করিলেন এবং সকল দেশের সকল শাস্ত্র—যাহাতে ঈশ্বরের সত্য আছে তাহাই ব্রাহ্মের শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিলেন, কিন্তু সেই বেদই তাঁহার জীবন ও আলোক হইয়া রহিল। তিনি এদেশে সম্যক গৃহীত হইবার জন্য এই হিন্দুশাস্ত্র বেদ বেদান্তের প্রসাদাৎ অধ্যাত্মিক ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মে হিন্দু প্রাণের সঞ্চার করিলেন। ফলত ইহাই প্রকৃত স্বদেশানুরাগ। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই এই টুকুর মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। তিনি যে বেদের ন্যায় কোরাণ বাইবল প্রভৃতি ধর্ম্ম-গ্রন্থকে—যাহাতে ঈশ্বরের সত্য আছে

সেই গ্রন্থকে ব্রাহ্মের শাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইহারই মর্ম্ম তাঁহাদের অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করিল। সুতরাং তদবধি ধর্ম্মশিক্ষার জন্য প্রধানত বাইবল অনেক ব্রাহ্মের অবলম্বনীয় হইয়া উঠিল। কিন্তু বাইবলের ধর্ম্মশিক্ষা হিন্দুর নিকট কোনও অংশে কার্য্যকরী হয় না। বাইবল যে কেন হিন্দুর ধর্ম্মশিক্ষার উপযোগী নয় তাহারও কারণ আছে। দেখ, প্রত্যেক লোকেরই সাধন ও সিদ্ধ এই দুইটী অবস্থা আছে। সিদ্ধাবস্থায় তুমি হু আল্লা বা গড্ যে নামেই ঈশ্বরকে ডাক, যে কোন ভাষায় তাঁহার স্তুতি বা বন্দনা কর তোমার প্রাণের তৃপ্তি হইবে। কারণ তখন ঈশ্বর তোমার করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায় হইয়া আছেন। নাম বা ভাষা একটা ব্যবধান ঘটাইয়া তাঁহা হইতে আর তোমাকে দূরে ফেলিতে পারে না। কিন্তু সাধনের অবস্থা ঠিক্ এরূপ নয়। তুমি অবশ্য যে কোন দেশের যে কোন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সত্যটী পাইতে পার কিন্তু তাহা হইতে জীবন পাইবে না। আবার সত্য যতক্ষণ না জীবন আনিয়া দেয় তাবৎ তাহাতে কোন বিশেষ উপকার নাই। আমরা শৈশবকাল হইতে মাতৃস্তন-দুগ্ধের ন্যায় দেশীয় ভাষা ও দেশীয় ভাবে পুষ্ট হইয়া থাকি। নানা ভাব-সংশ্রবে দেশীয় ভাষা ও ভাব আমাদের প্রাণ বা মনে অবস্থান্তর উৎপাদন করিয়া থাকে। মনে কর শান্তি শান্তিঃ শুনিলে আমরা মনে কেমন তৃপ্ত হই কিন্তু ভাবে উহারই প্রতিরূপ কোন কথা যদি বলি আমার মনে স্বর্গরাজ্য উপস্থিত হউক ইহাতে আমাদের মন কখন সেরূপ তৃপ্ত হইবে না। মনে কর এস্থলে শান্তি শব্দটী আমাদের শৈশবের স্তন-দুগ্ধ। ইহা দ্বারা আমাদের প্রাণের বল বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বিজাতীয় ভাবব্যঞ্জক স্বর্গ-রাজ্য শব্দটী আমাদের শৈশবের গোদুগ্ধ। ইহাতে অবশ্যই কিছু পুষ্টি আছে কিন্তু তাহা আমাদের প্রাণের পুষ্টি নয়। এখন দেখ সত্য কেবল শিক্ষার জন্য নয় উহা জীবনে ব্যবহার করিবার জন্য। সুতরাং দেশীয় ভাব ও ভাষার গূঢ় শক্তিই যখন প্রাণ সঞ্চার করে তখন সাধনের অবস্থায় ইহাই যে বিশেষ উপযোগী তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই। বলিতে কি, ইহা ব্যতীত সাধন হইতেই পারে না।

যাক্, এইরূপে ইয়োরোপীয় বাইবল শাস্ত্রানুশীলনে যখন ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মের আনন্দলাভে বঞ্চিত হইলেন তখন তাঁহার গতি বাহ্য কার্য্যের দিকে ফিরিল। ইহার নাম সমাজ-সংস্কার। এস্থলে আরও একটু কথা বলিতে অবশিষ্ট আছে। পাশ্চাত্য জ্ঞান তো অনেকের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে এবং ধর্ম্মশিক্ষক প্রধানত বাইবল বা খৃষ্ট। এই মণিকাঞ্চন-যোগে কেবল সমাজ নহে ব্রাহ্মধর্ম্মও খানিকটা রূপান্তর ধারণ করিল। ইহা কাহারই অবিদিত নাই যে ঐ সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজে খৃষ্ট-মহিমা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। জীবন-সমুদ্রে খৃষ্টই ধ্রুব তারা। তাঁহার রক্তমাংস পর্ব্বোপলক্ষে অনেক ব্রাহ্মের দগ্ধোদরের তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিল। জার্ডন নদী পবিত্র বলিয়া গৃহীত হইলেন। এবং খৃষ্টের মৃত্যুদিনে উপবাস একটা ধর্ম্মকার্য্য—ব্রহ্মচর্য্যার মধ্যে হইয়া উঠিল। ধর্ম্মের অঙ্গে যেমন এই পরিবর্ত্ত ব্যবহারেও আবার এই রূপ। বিধবাবিবাহ, বৈজাত্য বিবাহ, মনুষ্য-সাক্ষিক বিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-পরিচ্ছদ, জীবন-প্রণালী, এ সকলই ইয়োরোপের অনুকরণে অল্পে অল্পে আসিতে লাগিল। এইরূপে ধর্ম্মে বার আনা এবং ব্যবহারে ষোল আনা খৃষ্টান সাজিয়া ব্রাহ্মসমাজ বড় শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হইলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি স্বৎপ্রজ্ঞায় ধর্ম্মানুমানে প্রমাণ। সুতরাং ব্রাহ্ম বেদের নিত্যতা স্বীকার করিয়া উহাকে দুর্গম পথের অভ্রান্ত নেতৃত্ব দিতে পারেন না। কিন্তু এই ভারতবর্ষে আজই যে কেবল ব্রাহ্মসমাজ বেদের এই অনিত্যতা স্বীকার করিতেছে তাহা নহে, ইতিহাসে দৃষ্ট হয় অতিপূর্ব্বে বৌদ্ধেরাও ঐ রূপ করিয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধেরা বেদের অনিত্যতা স্বীকার করিলেও আমরা বৌদ্ধধর্ম্মে হিন্দুধর্ম্মেরই প্রচুর উপাদান দেখিতে পাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় যে বৌদ্ধেরা এক সময়ে বেদোক্ত ধর্ম্মে বিরক্ত হইয়া উঠে এবং যাগযজ্ঞের উচ্ছেদসাধন পূর্ব্বক বৈদিক ধর্ম্মের সংস্কারে বদ্ধ-পরিকর হয়। একটা বস্তুর দূষিত অংশ বাদ দিয়া তাহার সারাংশ গ্রহণকেই সংস্কার বলা যায়। বৌদ্ধেরা হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাই করিয়াছিল। এই জন্য প্রবাদ আছে বৌদ্ধধর্ম্ম আর কিছুই নয় উহা প্রচ্ছন্ন বেদান্ত ধর্ম্ম। এখন বুঝিয়া দেখ রামমোহন রায় হিন্দুসমাজে একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে যান নাই। হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু প্রধান আচার্য্য মহাশয় তাঁহার এই উদ্দেশ্য বুঝিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি বেদ অনিত্য ইহা ঘোষণা করিয়াও হিন্দুশাস্ত্র আশ্রয় করিয়া হিন্দু ধর্ম্মকেই সংস্কৃত আকারে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এই কারণে অদ্যাবধি এই আদি ব্রাহ্মসমাজ একেশ্বরবাদী হিন্দুদিগেরই সমাজ হইয়া আছে। এখানকার ধর্ম্ম সংস্কৃত হিন্দুধর্ম্ম এবং ব্যবহার সংস্কৃত হিন্দু ব্যবহার। কিন্তু তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহার এই গূঢ় ও গভীর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই। এই জন্য তাঁহাদিগের হস্তে পড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে নানা রূপ বিজাতীয় ভাব মিশিয়াছে এবং সমাজ-সংস্কারও এই বিজাতীয়তার হস্ত এড়াইতে পারে নাই। কিন্তু ঈশ্বর অন্ধের পথ-প্রদর্শক। তিনি গোপনে গোপনে যে কার্য্য করেন কেহই তাহার সন্ধান পায় না। এই রূপে দেখিতে দেখিতে কিছুকাল পরে আবার ব্রাহ্মসমাজের স্রোত ফিরিয়া আসিল। এখন দেখিতেছি ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকের মনে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই খৃষ্টীয় ভাবে বিদ্বেষ জন্মিয়াছে। অনেকেই এখন ধর্ম্মে হিন্দু এবং জীবনে হিন্দু। হিন্দু জ্ঞান ও হিন্দু যোগ অনেকেরই ধর্ম্ম-পিপাসা শান্ত করিতেছে। ইহার পূর্ণ বিকাশ-স্থল পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ। আমরা পূর্ব্ব-প্রস্তাবে আধ্যাত্মিক রূপকের যে টুকু অনিষ্টকারিতা তাহাই প্রদর্শন করিয়াছি কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের বিষয় বিশেষ কিছুই বলি নাই। ইনি ব্রাহ্মের মধ্যে সরলতার একটী প্রতিমা। যখন যে টুকু মুক্তির পথ বলিয়া বুঝিবেন ইনি তখনই তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাঁকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজে অনেক আন্দোলন চলিতেছে। অনেক কথা রটিতেছে। কিন্তু আশা করি অনেক কথাই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার কোন কোন মত যে দোষস্পৃষ্ট আমরা তাহা অস্বীকার করি না কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমরা দেখিতেছি তিনি প্রকৃত হিন্দু হৃদয় পাইয়াছেন। যেখানে যে ভাবে ঈশ্বরের পূজা ও ঈশ্বরের কথা হয় সেইখানে তিনি আপনার প্রাণারাম ঈশ্বরকে দেখেন এবং সেই খানেই ঈশ্বরকে প্রণাম করেন। ইহাই প্রকৃত হিন্দু হৃদয় এবং ইহাই হিন্দুর প্রকৃত যোগ ও প্রকৃত ভক্তি।

এস্থলে প্রসঙ্গত একটী ঘটনা মনে পড়িল। আমি একদা কোন খৃষ্টীয় ভজনালয়ে গিয়াছিলাম। সুপ্রসিদ্ধ বমুইচ সাহেব তথাকার আচার্য্য। বিস্ময়ের সহিত দেখিলাম একটী তিলকধারী বৃদ্ধ ধ্যানে দাঁড়াইয়া নিবিষ্ট চিত্তে উপদেশ শুনিতেছেন।

আসিবার সময় নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলাম আপনি বিধর্ম্মীর ভজনালয়ে কেন? প্রত্যুত্তরে তিনি কহিলেন ঐ বিদেশী ভক্তিমান আচার্য্য যে আমারই প্রভুর নাম করিতেছেন। আর উহাঁর হৃদয় হইতে যে ভক্তির স্রোত বাহির হইতেছে কায়মনে প্রার্থনা করি যেন ঐরূপ আমারও হয়। শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। বুঝিলাম ইহাই ভক্তিমান হিন্দুর উদার হৃদয়। বলিতে কি আজ আমরা বিজয়কৃষ্ণে সেই হৃদয়ের পরিচয় পাইলাম। তিনি একজন যথার্থতই সাধু ও ঈশ্বরভক্ত।

সত্য।

(১)

ভয়ে ভয়ে ভ্রমিতেছি মানবের মাঝে
হৃদয়ের আলোটুকু নিবে গেছে বোলে।
কে কি বলে তাই শুনে মরিতেছি লাজে;
কি হয় কি হয় ভেবে ভয়ে প্রাণ দোলে!
"আলো" "আলো" খুঁজে মরি পরের নয়নে,
"আলো" "আলো" খুঁজে খুঁজে কাঁদি পথে পথে,
অবশেষে শুয়ে পড়ি ধুলির শয়নে,
ভয় হয় একপদ অগ্রসর হ'তে।

বজ্রের আলোক দিয়ে ভাঙ্গ' অন্ধকার,
হৃদি যদি ভেঙ্গে যায় সেও তবু ভাল,
যে গৃহে জানালা নাই সেত কারাগার
ভেঙ্গে ফেল আসিবেক স্বরগের আলো!
হায় হায় কোথা সেই অখিলের জ্যোতি,
চলিব সরল পথে অশঙ্কিত-গতি!

(২)

জ্বালায়ে আঁধার শূন্যে কোটি রবি শশি
দাঁড়ায়ে রয়েছ একা অসীম সুন্দর!
সুগভীর শান্তি নেত্রে রয়েছে বিকশি
চিরস্থির শুভ্র হাসি প্রসন্ন অধর।
আনন্দে আঁধার মরে চরণ পরশি,
লাজ ভয় লাজে ভয়ে মিলাইয়া যায়;
আপন মহিমা হেরি পুলকে হরষি
চরাচর শির তুলি তোমা পানে চায়।

আমার হৃদয় দীপ আঁধার হেথায়
ধুলি হতে তুলে এরে দাও জ্বালাইয়া,
ওই ধ্রুব তারা তুমি রেখেছ যেথায়,
সেই গগনের প্রান্তে রাখ ঝুলাইয়া।
চিরদিন জেগেরবে, নিবিবে না আর—
চিরদিন দেখাইবে আঁধারের পার!

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকা গুলি আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

২। সামবেদ সংহিতা কৌথুমী শাখা।

Journal of the Asiatic society of Bengal. Vol LV, Part 11. N 11—1886.

Bibliotheca Indica. Published by the Asiatic Society of Bengal.

N. S. No 567. (Parasara smriti)
N. S. N. 568. (The Nirukta)
N. S. N. 569. (Muntakhab-ut-Tawarikh)
N. S. 570. (Zafarnamah)
N. S. 571, 572 (Akbarnamah)
N. S. 573, (Tattva chintamani)
N. S. 574 (The Asvavaidyaka)

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. Apl 1886.

Report of the Southern India Brahmo Samaj for 1885.

Theosophist—July 1886.
Fellow Worker VoL, I, No. 6.
The Hindu Reformer Vol 1. No. 12.
The Interpreter for April 1886.
ভারতী ও বালক। আষাঢ় ১৮০৮ শক।
বামাবোধিনী পত্রিকা। আষাঢ় ১২৯৩।
নব্যভারত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১২৯৩।
বান্ধব। আশ্বিন ১২৯২।
আসাম বন্ধু। মাঘ ফাল্গুন ১৮০৭।
সজ্জন তোষিণী। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ।
তত্ত্ব-মঞ্জরী ১ম ভাগ ১২ সংখ্যা ১২৯৩।

আয় ব্যয়।

কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৬।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৩০৪৪।/০
পূর্ব্বকার স্থিত ...	২৯৩২৵৩
সমষ্টি	৫৯৭৬৷৩
ব্যয় ...	২৯৬৭।৶০
স্থিত	৩০০৮৷৴৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ		২৫৯৴০
সাম্বৎসরিক দান প্রাপ্তি।		
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...		১০০৲
" ব্রহ্মসঙ্গীত বিদ্যালয়ের সাহায্য		২০৲
শ্রীযুক্ত তারকনাথ দত্ত ...		১০৲
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...		১০৲
শ্রীমতী ভুবনময়ী দেবী ...		১২৲
শ্রীযুক্ত রামসুন্দর রায়, ক্ষেতুপাড়া পাবনা		১৫৲
" সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ..		২৲
শ্রীমতী নীপময়ী দেবী ...		২৲
শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারী বড়াল ...		২৲
" " চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	পাণ্ডুয়া	৫৲
" " বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ...		১৲
" " শিবচন্দ্র দেব ...		৫৲
উঁহার বনিতা ...		১০৲
		১৯৪৲
অনেক ব্রাহ্ম ...		১৲
শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল রায়	ভাগলপুর	১৲
" " রামলাল ঘোষাল ...		১৲
" " রাধামোহন বসু	আন্দুল	১৲
" " গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	হুগলি	২৲
" " দীননাথ অধ্যেতা ...		২৲
" " অম্বিকাচরণ মৈত্র ...		২৲
পরলোক গত বাবু রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়		১৪৲
শ্রীযুক্ত বাবু মহানন্দ মুখোপাধ্যায় ...		১৲
" " আশুতোষ রায়	জব্বলপুর	১৲
" " নবগোপাল মিত্র ..		।০
শুভকর্ম্মের দান।		
রায় রমণীমোহন চৌধুরী	কৃষ্ণভাণ্ডার	১৬৲
শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল রায়	ভাগলপুর	২৲
দানাধারে প্রাপ্ত। ...		১৮/০
		২৫৬৷০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...		৪৮২৴০
পুস্তকালয় ...		২৫৮৷৵০
যন্ত্রালয় ...		১২৩৪৶৯
গচ্ছিত ..		৪৩০৷/৩
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১১২৫০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ...		১৫০৲
দাতব্য ...		১১৭৲
গবর্ণমেণ্ট সেবিংশ ব্যাঙ্ক		৩৲
সমষ্টি		৩০৪৪।/০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৬৩১৶৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৭৯১।৩
পুস্তকালয়	৬৸৬
যন্ত্রালয়	৯৪৯৷৯
গচ্ছিত	২৯৫৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৬৪।৬
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার	১৫০৲
দাতব্য	৮০৲
সমষ্টি	২৯৬৭।৶০

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৩ শ্রাবণ রবিবার সাপ্তাহিক সমাজ।

আচার্য্যের উপদেশ।

প্রাচীন ব্রহ্মবিৎ বলিয়াছেন "ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।" "এখানে তাঁহাকে জানিতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়, না জানিতে পারিলে মহান্ অনর্থ উৎপত্তি হয়।" পরমাত্মাকে না জানিলে আমরা বিনাশ পাই, জানিলে আমরা জীবন পাই; এ জানার সঙ্গে অন্যান্য জানার সঙ্গে বিস্তর প্রভেদ। এ জানা উদাসীনের ন্যায় জানা নহে, কিন্তু প্রাণের বস্তুকে প্রাণের সঙ্গ করিয়া জানা। আর আর বিদ্যা সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা আত্মার তৃপ্তি-সাধনের জন্য। "অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো-জ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" জ্যোতিষ প্রভৃতি যত প্রকার লৌকিক এবং প্রাকৃতিক বিদ্যা আছে সমস্তই অপরা বিদ্যা, যাহার দ্বারা অক্ষয় পুরুষকে জানা যায় তাহাই পরা বিদ্যা। ব্রহ্ম-বিদ্যাই জ্ঞানের অমৃত সোপান। আর আর বিদ্যা আমাদের সংসার নির্ব্বাহের অনেক সুবিধা করিয়া দিতে পারে, কিন্তু আমাদের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারে না। আমাদের আদিম নিবাস স্থানের—পরম ধাম স্থানের—সমাচার যেখানে জ্ঞানের জিজ্ঞাস্য, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সেখানে সম্মুখ-স্থিত পাকশালার সমাচার আনিয়া দিয়াই নিরস্ত হয়। জ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে, আপনার প্রাণগত বিষয়ের যে-কোন সমাচার জিজ্ঞাসা করে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তাহার একটি কথারও উত্তর দিতে পারে না—অর্দ্ধস্ফুট স্বরে উত্তর দিতে গিয়া কেবল আপনার অক্ষমতারই পরিচয় প্রদান করে। বহির্বিষয়ের সংসর্গেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মুখে স্ফূর্ত্তি হয়, জ্ঞানের সংসর্গে তাহার মুখে কথা ফুটে না—তাহা মৃতপ্রায় হইয়া অবস্থিতি করে। এ জন্য যাহারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অতিমাত্র পক্ষপাতী, ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাদের চক্ষের বিষ। জ্ঞান অসীম ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া পরমাত্মার মহিমা অবলোকন করিতে চায়, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান জ্ঞানকে সে দিকে তাকাইতে বারণ করে; কিন্তু জ্ঞান সে বারণ শুনে না। এই

জন্যই জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের মধ্যে এত বিবাদ। জ্ঞান চায় জীবন এবং প্রীতি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তাহাকে আনিয়া দেয় মৃত্যু এবং বিষাদ; জ্ঞান তাহা কেমন করিয়া গ্রহণ করিবে? ঈশ্বর-প্রীতি এক দিকে যেমন অনন্ত জীবনের উৎস, আর এক দিকে তেমনি সেই জীবনের অনন্ত উপজীবিকা; জ্ঞান কি এতই অজ্ঞান যে, সে সেই অক্ষয় অমৃত জীবন এবং তাহার চিরন্তন উপজীবিকা ছাড়িয়া মরণকে ভজনা করিবে, অনন্ত আকাশের ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া মৃত্তিকাকেই সার করিবে; ইহা অসম্ভব।

অপরা বিদ্যার মধ্যেও এমন সব দ্বার আছে, যাহার ভিতর দিয়া পরা বিদ্যার পথে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর-পরাঙ্মুখ পণ্ডিতেরা সে সকল দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিতে প্রাণ-পণ চেষ্টা করিয়া থাকেন। বিজ্ঞানের বিশ্বব্যাপী ধ্রুব, মঙ্গল-প্রবণ, বিজ্ঞতার পরিচায়ক নিয়ম সকল কোথায় আরো পরব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপী ধ্রুব মঙ্গলময় জ্ঞানময় সত্তা এবং শক্তির জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য বলিয়া পরিগৃহীত হইবে, তাহা নহে, ইন্দ্রিয়-সর্ব্বস্ব তামসিক বিজ্ঞান সেই সমুজ্জ্বল সূর্য্য কিরণে পেচক পক্ষীর ন্যায় আপনার তমো-গহ্বরে প্রবেশ পূর্ব্বক পাখ দুলাইয়া আস্ফালন করিতে থাকে। অতএব কেবল মাত্র অপরা বিদ্যার অনুশীলন অনর্থের মূল; শরীর মন এবং সংসারের জন্য যেমন অপরা বিদ্যা প্রয়োজনীয়, আত্মার জন্য সেইরূপ পরা বিদ্যা প্রয়োজনীয়।

সকল বিদ্যাই একদিকে যেমন তত্ত্ব-মুখী, আর এক দিকে তেমনি কার্য্যমুখী। জ্যোতিষ বিদ্যা একদিকে আকাশব্যাপী প্রকাণ্ড তত্ত্ব সকল মনোমধ্যে জাগাইয়া তোলে, আর একদিকে সামুদ্রিক নৌকা-চালনায় নিয়োজিত হইয়া বাণিজ্যের সৌকর্য্য সাধন করে। রসায়ন বিদ্যা একদিকে যেমন জড়-জগতের ধাতু-প্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করে, আর একদিকে তেমনি ঔষধ নির্ম্মাণে নিয়োজিত হইয়া চিকিৎসা কার্য্যের সহায়তা করে। লোকে যেমন অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া উদাসীনকে ঘরে ফিরাইয়া আনে, মনুষ্য সেইরূপ জ্ঞানের তত্ত্ব-সকলকে বাহির হইতে ঘরে আনিয়া তাহাকে সংসার-কার্য্যে দীক্ষিত করে।

অপরা বিদ্যার ন্যায় পরা বিদ্যাও একদিকে তত্ত্বমুখী আর একদিকে কার্য্যমুখী। পরা বিদ্যার তত্ত্ব-প্রধান অংশ আমাদের দেশে ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং তাহার কার্য্য-প্রধান অংশ অধ্যাত্মযোগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমাদের লাভালাভ, ইচ্ছানিচ্ছা, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি সকলের প্রতি উদাসীন হইয়া জ্ঞানের আলোচনা করিলে—শুদ্ধ কেবল সত্যের জন্য সত্যের অনুশীলন করিলে—সত্যের প্রতি আমাদের প্রত্যয়ের দৃঢ়তা হয়। নিরপেক্ষ ব্যক্তির সাক্ষ্য যেমন সমধিক প্রত্যয়-ভাজন, নিরপেক্ষ জ্ঞানের কথা সেইরূপ সমধিক শ্রদ্ধেয়। কিন্তু জ্ঞানের কথাতে যদি আমাদের কোন কার্য্য না দর্শে, তবে তাহাতে আমাদের প্রত্যয় দৃঢ় হইলেই বা কি আর না হইলেই বা কি। এই জন্য, প্রীতিকে যেমন ঘর হইতে ক্রমে ক্রমে বাহিরে বিস্তার করা আবশ্যক, জ্ঞানকে তেমনি বাহির হইতে ক্রমে ক্রমে ঘরে আনা আবশ্যক। আমাদের পূর্ব্বতন ঋষিরা সূর্য্য চন্দ্র মেঘ বিদ্যুৎ অগ্নি বায়ু নদী সমুদ্র পর্ব্বত অন্তরীক্ষ পৃথিবী হইতে পরব্রহ্ম-তত্ত্ব আহরণ করিয়া অবশেষে আত্মার অন্তরতম প্রেম নিকেতন সেই পরম-তত্ত্বের অধিষ্ঠানের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। সত্যের প্রতি প্রত্যয়কে দৃঢ় করিবার জন্য নিরপেক্ষ ভাবে জ্ঞানালোচনা করা যেমন আবশ্যক, তেমনি সত্যকে ঘরে পাইবার জন্য অন্তঃকরণের

স্পৃহাকে দিয়া সত্যকে আত্মার অভ্যন্তরে ধরিয়া রাখা আবশ্যক। প্রকৃত পক্ষে, পরমাত্মা যেমন বাহিরে আছেন, তেমনি তিনি আমাদের আত্মার অভ্যন্তরেও বর্ত্তমান আছেন; কিন্তু প্রীতির অবিদ্যমানে ঘরের লোকও বাহিরের হইয়া যায়, প্রীতির আকর্ষণে বাহিরের লোকও ঘরের হইয়া দাঁড়ায়; প্রীতি অপ্রীতিই অন্তর-বাহিরের নির্দ্দেশ-কর্ত্তা। পরমাত্মা যাহার যত প্রিয় তাহার তত নিকটে বর্ত্তমান, যাহার যত অপ্রিয় তাহা হইতে তত দূরে বর্ত্তমান। জ্ঞান সাধারণতঃ বলিতেছে যে, পরমাত্মা সকলেরই অন্তরতম আত্মা, প্রেম বিশেষ করিয়া বলিতেছে যে, যাহার তিনি প্রিয়তম তাঁহারই তিনি অন্তরতম। অতএব প্রেমের পথই পরমাত্মাকে অন্তরে আনিবার একমাত্র পথ। যদিচ নিরপেক্ষ জ্ঞানের কথায় বিশ্বাস করিয়া ইহা আমরা স্থির জানিতেছি যে, পরমাত্মা আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে বর্ত্তমান আছেন, তাহা হইলেও এমন হইতে পারে যে, তিনি আমাদের নিকট হইতে দূরে রহিয়াছেন; অতএব জ্ঞানের ধ্রুব সত্যের প্রতি মনকে সেইরূপে নিবিষ্ট করা আবশ্যক—যাহাতে সেই সত্যের আকর্ষণ আত্মার অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে; যাহাতে আমাদের সুবিমল প্রীতি প্রত্যুত্থান করিয়া সেই জীবন্ত সত্যকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিতে পারে।

ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন পরমাত্মার প্রতি আমাদের প্রত্যয়কে অচলের ন্যায় দৃঢ় করে, এই তাহার মহৎ ফল; অধ্যাত্ম-যোগ আত্মাকে পরমাত্মার সহিত প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া আত্মার আনন্দের উৎস উৎসারিত করিয়া দেয় ও আত্মার সমস্ত অভাব মোচন করে, এই তাহার মঙ্গলময় ফল; একটিকে ছাড়িয়া আর একটি সুচারু-রূপে সম্পন্ন হইতে পারে না—উভয়ের যোগেই উভয়ে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়। জ্ঞানের প্রত্যয় মূলধন স্বরূপ, এবং প্রেমের আদান-প্রদান আয়-ব্যয় স্বরূপ, উভয়ের কোনটিই উপেক্ষণীয় নহে।

ইহা যেমন ধ্রুব সত্য যে, আমাদের আত্মা অপূর্ণ, ইহাও তেমনি ধ্রুব সত্য যে, পরমাত্মা পরিপূর্ণ; তাহা যদি হইল তবে আমাদের সাধন-কার্য্য যে কি তাহা কখন আমাদের নিকট অগোচর থাকিতে পারে না; সেই পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা যিনি আমাদের জ্ঞানে ধ্রুবরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন তাঁহার সহিত আমাদের আত্মার সম্বন্ধ নিবদ্ধ করা, তাঁহার অমৃত প্রসাদ-বিন্দু দ্বারা আত্মার সমস্ত অভাব মোচন করা—ইহাই আমাদের সাধনা। ঈশ্বরারাধনা এই সাধনার নিয়মিত প্রবাহ, কর্ম্মানুষ্ঠান এই সাধনার বিবরণ-সেতু, এবং অধ্যাত্ম যোগ এই সাধনার ধনাভুক্ত স্রোতঃ-সঙ্গম। আমাদের ভাগ্যে যদি কখনও এরূপ শুভযোগ উপস্থিত হয় যে, আমাদের প্রত্যয় এবং স্পৃহা, জ্ঞান এবং প্রেম, মন এবং প্রাণ সমস্তই অমৃত-সাগর পরমাত্মাতে একতানে সম্মিলিত হইয়াছে—তবে সেই শুভ-যোগই প্রকৃত অধ্যাত্ম যোগ। অধ্যাত্ম-যোগের সুনিস্তব্ধ শান্তি এবং সুকোমল প্রেমে অবগাহন করিয়া সাধক যখন উত্থান করেন, তখন তিনি ঈশ্বর-প্রসাদে পাপতাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, নূতন চক্ষু—নূতন আনন্দ—নূতন জীবন—পাইয়া, আপাদ মস্তক সবাহ্যাভ্যন্তর নূতন হইয়া উত্থান করেন; তখন

"স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা। তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহা-গ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।

তিনি আনন্দনীয় পরমাত্মাকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়েন, তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ

হয়েন, তিনি পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, এবং হৃদয়-গ্রন্থি-সমুদায় হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন।”

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের মঙ্গলের একমাত্র মূলাধার,—তুমি সৌন্দর্য্যের মধ্যে বর্ত্তমান, মঙ্গলের মধ্যে বর্ত্তমান, সত্যের মধ্যে বর্ত্তমান—সকল পদার্থে, সকল ব্যক্তিতে, সকল কার্য্যেতে তোমার সত্য সুন্দর মঙ্গল মূর্ত্তি ভিতর হইতে প্রকাশ পাইয়া উঠিতেছে, সমস্ত জগতের আবরণ তাহাকে গোপন করিতে পরাভব মানিতেছে। তোমার সৌন্দর্য্য যাহাতে আমাদের অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করে, সেই সুবিমল প্রেমের উৎস আমাদের হৃদয়ে উন্মুক্ত করিয়া দেও; তুমি আমাদের অন্তরে আবির্ভূত হইয়া আমাদের পূজা গ্রহণ কর, আমরা তোমার চরণে হৃদয় মন সমর্পণ করিয়া জন্ম সার্থক করি; তুমি কৃপা করিয়া ভক্ত হৃদয়ের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

দর্শন-সংহিতা।

এক সংহিতার তিনটি মুখ্য খণ্ড।

দর্শন-সংহিতা তিনটি মুখ্য খণ্ডে বিভক্ত। এই যে ভাগ-বিন্যাস ইহার ব্যাপ্তিগম্যতা এবং ব্যবহার-সৌকর্য্য কেবল নহে কিন্তু ইহার অবশ্যম্ভাবিতা এবং বিকল্প-শূন্যতা প্রদর্শনের জন্য কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তত্ত্ব-জ্ঞান-ক্ষেত্রে কিছুই কাহারো স্বেচ্ছাধীন বিবেচনার উপরে ছাড়িয়া দেওয়া হইতে পারে না। জিজ্ঞাসুর সমুদায় বিন্যাস-ব্যবস্থা, এমন কি প্রত্যেক পদক্ষেপ, অখণ্ডনীয় নিয়মের বশবর্ত্তী হওয়া চাই—কিছুই যদৃচ্ছা-মূলক হইলে চলিবে না। সে বিন্যাস-ব্যবস্থা লক্ষ্য-বস্তুর নিজ-কর্ত্তৃক নিয়মিত এবং প্রবর্ত্তিত হইবে, লক্ষ্যরিতার দৃষ্টি-পদ্ধতি তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।* এজন্য

* যেরূপ তত্ত্ব নির্ণয়-প্রণালী লক্ষ্য বস্তুর উপরে নির্ভর করে, বেদান্ত দর্শনে তাহা বস্তু-তন্ত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যথা; —

"ন তু বস্তু এবং নৈবমস্তি নাস্তীতি বা বিকল্প্যতে। বিকল্পনাস্তু পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষাঃ, ন তু বস্তু-যাথাত্ম্য-জ্ঞানং পুরুষ-বুদ্ধ্যপেক্ষং; কিং তর্হি? বস্তুতন্ত্রমেব তৎ॥ নহি স্থাণৌ একস্মিন্ স্থাণুর্বা পুরুষোঽন্যো বেতি তত্ত্ব-জ্ঞানং ভবতি। তত্র পুরুষো বা অন্যো বেতি মিথ্যা জ্ঞানং, স্থাণুরেবেতি তত্ত্বজ্ঞানং, বস্তুতন্ত্রত্বাৎ। এবং ভূত-বস্তুবিষয়াণাং প্রামাণ্যং বস্তুতন্ত্রং।" ইহার অর্থ; —

বস্তুকে "এ প্রকার নহে" কিম্বা "নাই" বলিয়া বিকল্পিত হয় না। বিকল্পনা পুরুষ বুদ্ধিকে (Individual judgement based upon personal considerations) অপেক্ষা করে, বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞান পুরুষ বুদ্ধিকে অপেক্ষা করে না,—ইহাই বস্তুতন্ত্র। একটী বৃক্ষকাণ্ডকে "হয় এটা বৃক্ষ কাণ্ড, নয় পুরুষ, নয় অন্য-কিছু" এরূপ করিয়া জানা তত্ত্বজ্ঞান নহে। বৃক্ষকাণ্ডকে পুরুষ বা অন্য-কিছু বলিয়া জানা মিথ্যা-জ্ঞান, তাহাকে বৃক্ষ-কাণ্ড বলিয়া জানাই তত্ত্বজ্ঞান; কেননা এ জ্ঞান বস্তু-তন্ত্র। বিদ্যমান বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের নিশ্চয়তা বস্তু-তন্ত্র।

বস্তু-তন্ত্র অর্থাৎ বস্তু-সাপেক্ষ; যাহা পুরুষের ইচ্ছাধীন নহে তাহা অপৌরুষেয় (Impersonal)। এই সূত্রেই তত্ত্বজ্ঞান-শব্দের প্রকৃত অর্থ সুস্পষ্ট রূপে অবধারণ করিয়া দেওয়া শ্রেয় বিবেচনা করি। তত্ত্ব শব্দের যে অর্থটি এখানে বিবেচ্য। তত্ত্ব কি? না বস্তু সে যাহা তাহার তাহাত্ব; যেমন ঘটের ঘটত্ব—পটের পটত্ব—ইত্যাদি। ঘটের পক্ষে যে-রূপ ঘটত্ব না হইলেই নয়, তেমনি উষ্ণ দেশের আলোকিক উত্তাপ, শীত-দেশের শৈত্যোৎপাদক ক্ষমতা ইত্যাদি) তাহার নিরূপণই প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ। যাঁহারা ইউরোপীয় নৈয়ায়িক প্রণালীর সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহাদিগকে এখন বলিলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, তত্ত্ব কি—না Universal proposition কি না সার্ব্বভৌমিক এবং নির্বিকল্প সিদ্ধান্ত। তত্ত্বের অর্থাৎ সার্ব্বভৌমিক সত্যের প্রতিপক্ষ স্বব্যাঘাত-গ্রস্ত; কিন্তু ইংরাজীতে যাহাকে বলে Particular proposition—অর্থাৎ ব্যক্তিগত বা আংশিক তত্ত্ব যাহা কোন স্থলে বা খাটে কোন স্থলে বা খাটে না—তাহার প্রতিপক্ষ স্বব্যাঘাত-গ্রস্ত নহে। "কোন কোন মনুষ্য বৃদ্ধ" এই কথা এবং "কোন কোন মনুষ্য বৃদ্ধ নহে" এই কথা—এ দুই কথা পরস্পরের বিরোধী নহে, কেন না দুইই এক সঙ্গে সত্য হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। কিন্তু "মনুষ্য জীব-বিশেষ" এই কথা, এবং "মনুষ্য জীব নহে" এই কথা, এ দুই কথা পরস্পরের বিরোধী। এ জন্য "মনুষ্য জীব" ইহা যেমন মনুষ্য-বিষয়ক একটি তত্ত্ব, "মনুষ্য বৃদ্ধ" ইহা সেরূপ নহে; কেন না শেষোক্তের বিরুদ্ধ সত্যে—মনুষ্য যুবা হইলেও হইতে পারে। কতক-গুলি তত্ত্ব লৌকিক মাত্র, অর্থাৎ লোকে তাহাদিগকে তত্ত্ব বলিয়া

এখানে যেরূপ ভাগ-বিন্যাসের প্রস্তাব হইতেছে তাহার মুখ্য অবয়বটির প্রতি দৃষ্টি করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তাহা ভিন্ন-গর্ত্তান্তর নাই ; তবে তাহার বিশেষ-বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরবর্ত্তী তত্ত্ববিৎদিগের হস্তে রূপান্তর প্রাপ্ত হইলেও হইতে পারে—হয় হউক্ তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। কিন্তু বর্ত্তমান পরিচ্ছেদ-টি বহুতর ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ। নিম্নের নয়-টি পরিচ্ছেদে ইহার সবিশেষ বিবরণ আনুপূর্ব্বিক প্রকাশিত হইল ; তদ্দৃষ্টে এই গ্রন্থের সাধারণ খণ্ড বিভাগ এবং তাহার ক্রম-পদ্ধতি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

অস্তিতত্ত্ব প্রশ্ন-কল্প, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা উত্তর-কল্প।

মূলতত্ত্ব-সকলের—চরমে আবিষ্কৃত হওয়া সম্বন্ধে যাহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহাতে বুঝাই যাইতেছে যে, এ সংহিতা এমন একটি বিজ্ঞান-ব্যাপার, যাহা উল্টা-পিট সম্মুখে করিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। এর মধ্যে কঠিন হইতেছে—সমস্ত কাণ্ড যন্ত্রটাকে এরূপ করিয়া ঘুরাইয়া রাখা যাহাতে তাহার সোজা পিট আমাদের সম্মুখে আইসে। কি সে উল্টা পিট—যাহা প্রথমেই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং যাহাকে উল্টাইয়া রাখা আবশ্যক? প্রশ্ন-আকারে বলিতে হইলে সেটি এই যে—সত্য কি? স্বরূপতঃ এটি চরম প্রশ্ন, কিন্তু আমাদের কাছে ইহা তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রথম প্রশ্ন। ঐ প্রশ্নের অব্যবহিত উত্তর যাহা ঐ প্রশ্নটিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া সমস্ত কাণ্ড-টি উল্টাইয়া দেয়, তাহা এই ;—যাহা আছে তাহাই সত্য।* যাহা সম্যক্ রূপে আছে তাহাই সত্য। ইহাতে আর সংশয় নাই। এই উত্তর সদা আর একটি প্রশ্ন টানিয়া আনে, সে-টি এই,—কিন্তু কি আছে? এ প্রশ্ন আপাততঃ, শ্লোক-বাক্য ভিন্ন, প্রকৃত উত্তর পাইতে পারে না। এ প্রশ্নের এখনো পালা আসে নাই। ইহাকে অনেক প্রতীক্ষা করিতে হইবে। ভূগোল-সমুদ্রের পশ্চাৎ-দেশের প্রদেশের ন্যায় আপাততঃ ইহাকে সম্মুখ হইতে ঘুরাইয়া রাখিতে হইবে, অথবা পশ্চাৎ পরিশেষ পরিচ্ছেদের ন্যায় আপাততঃ ইহাকে ঝুলিয়া রাখিতে

মানিয়া লয় এই পর্য্যন্ত, —ইহার একটি দৃষ্টান্ত—জড়পিণ্ড মাত্রেরই গুরুত্ব আছে ; পৃথিবীর কেন্দ্রস্থানে কোন বস্তুর গুরুত্ব থাকিতে পারে না (অর্থাৎ যে গুরুত্ব ভার-কেন্দ্র পৃথিবীর কেন্দ্র স্থাপিত তথায় সে বস্তুর গুরুত্ব থাকিতে পারে না) ইহা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। অতএব আমরা বলিতে পারি "জড় পিণ্ড মাত্রেরই গুরুত্ব আছে" ইহা তত্ত্ব শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। দুই বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী সরল রেখা পথ একের অধিক হইতে পারে না—এটি সিদ্ধান্ত পক্ষেই তত্ত্ব-শব্দের বাচ্য, কেন না মনুষ্য ইহার বিকল্প ভাবিতে পারে না। যে জ্ঞানের বিকল্প সম্ভবে আমাদের শাস্ত্রানুসারে তাহা তত্ত্বজ্ঞান-শব্দের বাচ্য নহে। অবশ্যম্ভাবী সত্যের জ্ঞান—যাহার কোন কালেই একটুও নড় চড় হইতে পারে না—তাহাই তত্ত্ব জ্ঞান, সুতরাং তাহা পুরুষ-তন্ত্র নহে (অর্থাৎ পুরুষের ইচ্ছাধীন নহে) কিন্তু বস্তু-তন্ত্র। ফরাসীস্ দেশীয় তত্ত্ববিৎ কুজান্ এইটি বিশেষ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞান বস্তুতন্ত্র, অথবা যাহা একই কথা—তত্ত্বজ্ঞান অপৌরুষেয়। কান্ট্ এইটি বিশেষ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞান সার্ব্বভৌমিক এবং অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান গ্রন্থে বিশেষ করিয়া দেখানো হইয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিপক্ষ স্ববিঘাত-গর্ত্ত। একই কথা। তত্ত্ব-জ্ঞান-শব্দের মুখ্য অর্থ এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে ; তত্ত্বের (অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী সার্ব্বভৌমিক অপৌরুষেয় এবং নির্বিকল্প সত্যের) জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান (Reason) ; এবং ঐ প্রকার সত্য যে শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় তাহাই দর্শন-শাস্ত্র বা তত্ত্ব-জ্ঞান শাস্ত্র (Metaphysics)।

* অর্থাৎ সত্তাই সত্যের পরিচায়ক। সৎ কি? না যাহা চিরকাল বর্ত্তমান। সত্তা কি? না চিরন্তন বর্ত্তমানতা। যাহা সম্যক্‌রূপে আছে—অর্থাৎ যাহা কোন কালে "নাই" হইবার নহে, তাহাই সনাতন সত্তা। আমাদের শাস্ত্র অনুসারে-ও সত্তা (কিম্বা নিত্য অস্তিত্ব) সত্যের পরিচয়-চিহ্ন। সত্তা কি? এ প্রশ্ন এখন ঠেলিয়া রাখিয়া—সত্তা কি—এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়। সত্তা হ'চ্চে ধর্ম্মী—সত্তা হ'চ্চে তাহার ধর্ম্ম ; লক্ষ্য বস্তুর ধর্ম্ম-নিরূপণই জ্ঞানের প্রথম কার্য্য ; এ জন্য, সত্তা কি—ইহাই প্রথম জিজ্ঞাস্য,—ইহার মীমাংসার উপরেই "সত্য কি" ইহার মীমাংসা নির্ভর করে।

হইবে। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্থাপনা তত্ত্বজ্ঞানের একটি সুবিস্তীর্ণ খণ্ড আনিয়া দাঁড় করাইতেছে, সে খণ্ডটির উদ্দেশ্য হচ্চে—বাস্তবিক সত্তা কি—সমীচীন অস্তিত্ব কি—তাহার সিদ্ধান্ত-মীমাংসা। এ খণ্ড-টি অস্তিতত্ত্ব-বিষয়ক, অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে আছে কি তদ্বিষয়ক, সিদ্ধান্ত-মীমাংসা।

জ্ঞান-তত্ত্ব স্বভাবতঃ যদিও চরম, কিন্তু তত্ত্বতঃ তাহাই প্রথম; অতএব তাহাকে পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে ঘুরাইয়া আনিতে হইবে।

তত্ত্বজ্ঞানের গোড়ার কাজ এই—যেমন ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে—মীমাংস্য প্রশ্নের সমস্ত দলবলকে এরূপ করিয়া উল্টাইয়া রাখা, যাহাতে প্রথমটি চরমে পড়ে ও চরমটি প্রথমে আইসে; এটি করিতে হইলে এমন সব উত্তর খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক, যাহা প্রশ্ন গুলির মীমাংসায় আপাততঃ হস্তক্ষেপ না করিয়া তাহাদিগকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারে। ঘূর্ণন-গতিকে—স্বভাবতঃ যাহা চরমে পড়িয়া থাকে তাহা যখন প্রথমে আনীত হইবে, এবং স্বভাবতঃ যাহা প্রথমে আসে তাহা চরমে নিক্ষিপ্ত হইবে—তখনই তাহাদের মীমাংসার সময় উপস্থিত হইবে। কারণ, সে-সকল প্রশ্ন অগ্রে বিচার্য্য তাহারা স্বতন্ত্র, ও যাহারা স্বভাবতঃ অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহারা স্বতন্ত্র; দুয়ের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ যে, শেষোক্তের মীমাংসার সমুদায় মূল উপাদান পূর্ব্বোক্তের মধ্যে অন্তর্ভূত রহিয়াছে; কাজেই, পূর্ব্বোক্তের বিচার-কার্য্য অগ্রে চুকাইয়া না দিয়া শেষোক্ত-গুলিকে সম্মুখে আসিতে দেওয়া হইতে পারে না। প্রত্যেক উত্তর এরূপ হওয়া চাই যে, একদিকে যেমন তাহা পূর্ব্ব প্রশ্নকে প্রতিহত করিবে, আর-এক দিকে তেমনি নূতন একটি প্রশ্নকে সম্মুখে আনয়ন করিবে। অস্তিতত্ত্বের মীমাংসা ঠেলিয়া রাখিবার উত্তর ইহার দৃষ্টান্ত-স্থল, যথা;—প্রশ্নটি সংক্ষেপে এই যে, কি আছে? আর, তাহাকে ঠেলিয়া রাখিবার উত্তর এই—যাহা জ্ঞানে বিদ্যমান তাহাই আছে। কিন্তু এ উত্তর একদিকে যেমন অস্তি-তত্ত্বকে সম্মুখ হইতে সরাইয়া দেয়, অমনি আর এক দিকে নূতন একটি প্রশ্ন (বা প্রশ্নাংশ) আমাদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করে; সেটি এই, জ্ঞানে কি বিদ্যমান আছে? জ্ঞান কি?* এইরূপ প্রক্রিয়া তত্ত্বজ্ঞানের আর একটি সমগ্র খণ্ড আনিয়া দাঁড় করায়; ফলে এইখানেই ঘূর্ণনের পরিসমাপ্তি; অবশেষে, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান সম্বন্ধায় প্রথম প্রশ্ন কি তাহা খুঁজিয়া পাইলেই আমরা তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃত আরম্ভ-স্থান—নিকটতম জিজ্ঞাস্য বিষয়—হস্তে পাই। এই খণ্ডটি জ্ঞানজ্ঞেয়ের মূল নিয়ম-গুলির অনুসন্ধানে এবং ব্যাখ্যানে ব্যাপৃত। তাহাতে একদিকে এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জ্ঞানের যে-গুলি অবশ্যম্ভাবী নিয়ম, সে গুলি সমস্ত জ্ঞানেরই নিয়ম, সমস্ত চিন্তারই নিয়ম; আর-এক দিকে এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জ্ঞানের যে-গুলি আগন্তুক নিয়ম, সে-গুলি শুদ্ধ কেবল আমাদেরই জ্ঞানের নিয়ম—আমাদেরই চিন্তার নিয়ম। বিজ্ঞান-শাস্ত্রের বর্ত্তমান বিভাগ জ্ঞান-তত্ত্ব বলিয়া প্রসিদ্ধ; অস্তি-তত্ত্ব যেমন অস্তিত্বের সিদ্ধান্ত-নির্ণায়ক, জ্ঞান-তত্ত্ব সেইরূপ জ্ঞানের সিদ্ধান্ত-নির্ণায়ক। জানা কি এবং জ্ঞেয় কি, এক কথায়—জ্ঞান কি, এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান ইহার কার্য্য। এই

* সত্য চরম লক্ষ্য; তাহার অনুসন্ধানে আপাততঃ ক্ষান্ত হইয়া, সত্যের ভাবনা যাহা আমাদের অনুভব-গম্য, কি না সত্তা—তাহার প্রতি মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য; আবার সত্তার অনুসন্ধানে আপাততঃ ক্ষান্ত হইয়া, সত্তার সাক্ষী যাহা আমাদের জ্ঞানে প্রকাশমান—কি না জ্ঞান স্বয়ং—তাহার প্রতি মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। অতএব, সত্য অপেক্ষা সত্তা এবং সত্তা অপেক্ষা জ্ঞান আমাদের জ্ঞানের নিকটবর্ত্তী সুতরাং অগ্রে বিবেচ্য।

খণ্ডটি যে-পর্য্যন্ত না সম্যক্‌রূপে বিচারিত হইতেছে, সে-পর্য্যন্ত অস্তি-তত্ত্বের নিকটে যাইতে—এমন কি তাহার দিক্‌পানে তাকাইতে—নিষেধ।

জ্ঞান-তত্ত্ব এবং অস্তি-তত্ত্ব এই দুইটিই তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য খণ্ড।

জ্ঞান তত্ত্ব এবং অস্তি-তত্ত্ব এই দুইটিই তবে তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রধান দুইটি শাখা। ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কি আমরা জানি—এটি যতক্ষণ না আমরা স্থির করিতে পারিতেছি, অথবা যাহা একই কথা—যতক্ষণ না আমরা সম্যক্ তন্ত্র-সম্বন্ধ জ্ঞান-তত্ত্বের সমস্ত বিবরণ নিঃশেষিত করিতে পারিতেছি, ততক্ষণ—কি আছে—ইহার মীমাংসায় আমাদের অধিকার জন্মিতে পারে না, অথবা যাহা একই কথা—ততক্ষণ আমরা অস্তি-তত্ত্বে প্রবেশ পাইতে পারি না। তখনও অস্তি-তত্ত্বে প্রবেশ পাই কিনা—তাহাও সন্দেহ। যাহাই হউক না—জ্ঞান-তত্ত্বের মীমাংসার দ্বার অতিবাহন না করিয়া আমরা সমীচীন অস্তি-তত্ত্বে পৌঁছিতে পারি না। কারণ, কি আছে তাহা অগ্রে আমরা জানিব—তবে তো তাহা কথায় ব্যক্ত করিব, তাহা জানিতে অন্ততঃ চেষ্টা করা চাই—নহিলে আমরা তাহা বলিতে অধিকারী হই না; আবার যতক্ষণ আমরা—'জ্ঞান' কাহাকে বলে, জ্ঞান কি, জ্ঞান-ক্রিয়া এবং জ্ঞেয়-বিষয় কি, এই প্রশ্নের সম্যক্ পরীক্ষা এবং মীমাংসা করিয়া উঠিতে না পারিতেছি, ততক্ষণ—কি আছে—তাহা আমরা জানিতেও অধিকারী হই না। এই সব প্রশ্নের যে পর্য্যন্ত না উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে, সে পর্য্যন্ত—একথা বলা কোন কার্য্যেরই নহে যে, জ্ঞানে যাহা বিদ্যমান তাহাই সম্যক্ অস্তিত্ব।

জ্ঞান তত্ত্ব স্বতঃ অস্তি-তত্ত্বের প্রবেশ-দ্বার হইতে পারে না কেন।

কিন্তু জ্ঞান-তত্ত্বের প্রশ্ন মীমাংসা সমাপ্ত হইবার পরেও—জ্ঞানের সমস্ত নিয়ম আবিষ্কৃত এবং প্রদর্শিত হইবার পরেও—কি আছে এই প্রশ্ন হস্তে লইতে এবং তাহার মীমাংসা করিতে আমরা কি এক তিলও বেশী অধিকার প্রাপ্ত হই? একটু বেশী অধিকার প্রাপ্ত হই বটে,—কিন্তু তাহার ভিতর একটি কথা আছে; কথাটি সহজ নহে, তাহা অস্তি তত্ত্বের পথ দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর দিয়া ঘেরিয়া রাখিয়াছে, সে-টি এই ;—

হইতে পারে—যাহা আমাদের জ্ঞানের অগোচর তাহাই সম্যক্ অস্তিত্ব।

এরূপ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে যে, যাহা আমাদের জ্ঞানের অগোচর তাহাই সম্যক্ অস্তিত্ব। আমাদের অজ্ঞান আত্যন্তিক প্রগাঢ়—আমাদের জ্ঞান-অপেক্ষা তাহা বহু-পরিমাণে বিস্তীর্ণ। ইহাতে আর কাহারো দ্বিরুক্তি হইতে পারে না। অস্তি-তত্ত্ব যদি আমাদের জ্ঞানের সীমার অভ্যন্তরে থাকে, তবে আমরা জ্ঞান-তত্ত্বকে হাতে পাইলেই অস্তি-তত্ত্বকেও সেই সঙ্গে হাতে পাই, ভাণ্ডারের অভ্যন্তরে যদি রত্ন থাকে, তবে ভাণ্ডার আমাদের হস্তগত হইলেই রত্নও আমাদের হস্তগত হয়; কিন্তু অস্তি-তত্ত্ব যদি আমাদের জ্ঞানের সীমার অভ্যন্তরে মূলেই অবস্থিতি না করে, তাহা হইলে জ্ঞান-তত্ত্ব শূন্য-ভাণ্ডার মাত্র—তাহা আমাদের হস্তগত হইলেই বা কি, আর না হইলেই বা কি। মনে কর, জ্ঞানের অর্থ, তাহার যাহা নহিলে নয়, তাহার সীমা, উদ্দেশ্য এবং ক্ষমতা, সমস্তই আমরা স্থির-স্থায় করিয়া বসিয়া আছি, তাহা হইলেও এরূপ হইতে পারে—হইতে পারে কেন—হওয়াই সম্ভব যে, সম্যক্ অস্তিত্ব আমাদের জ্ঞানের সীমা

অতিক্রম করিয়া আমাদের অজ্ঞানের প্রাচীরের আড়ালে পলাইয়া রহিয়াছে। কি আছে—এ সম্বন্ধে হয় তো আমরা কিছুই জানি না, সুতরাং কিছুই বলিতে পারি না। আমাদের অগ্রসর হইবার পথে এটি একটি ঘোরতর প্রতিবন্ধক। ফলে এইটিই এযাবৎকাল সমস্ত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাকে ধরাশায়ী করিয়া আসিতেছে; অস্তিত্বের আদি-পর্যন্ত-অভেদ্য অলঙ্ঘ্য প্রায় প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে যখন যে কেহ পা বাড়াইয়াছে—উহাই তাহাকে তৎক্ষণাৎ হটাইয়া দিয়াছে। অতএব এ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একটা মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করা পরামর্শ-সিদ্ধ।

এই বিবেচনা অজ্ঞান-তত্ত্ব নামক তত্ত্ব-জ্ঞানের আর-একটি খণ্ড আনিয়া দিতেছে।

আমাদের অজ্ঞানের অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করিয়া অথবা তাহার প্রতি চক্ষু নিমীলন করিয়া নহে, কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাতে চোখোচোখ করিয়া, ঐ দুস্তর প্রতিবন্ধকটি অতিক্রম করিতে হইবে; আর চোখোচোখি করিবার এক মাত্র উপায় তা এই,—তাহার প্রকৃতির অভ্যন্তরে অনুসন্ধান প্রয়োগ। অজ্ঞান কি—কি বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নাই বা জ্ঞান থাকিতে পারে না—ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং স্থিররূপে অবধারণ করা আবশ্যক। এইরূপে, সম্পূর্ণ নূতন একটা বিষয়ের অনুসন্ধান আমাদের হস্তে আসিয়া পড়িতেছে; ইহার নাম অজ্ঞান-তত্ত্ব এবং ইহাতেই এই গ্রন্থের মধ্যখণ্ড পর্য্যবসিত। এই অনুসন্ধানের ফল সংহিতার যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এখন অস্তি-তত্ত্বের প্রশ্ন বিবেচিত হইতে পারে।

এখন আমাদের গন্তব্য পথ আমাদের সম্মুখে দিব্য পরিষ্কার এবং সোজা দেখা দিতেছে। জ্ঞানে কি জানা যাইতে পারে—জ্ঞান-তত্ত্ব তাহা নির্দ্ধারণ করিবে। জ্ঞানে কি অজ্ঞাত থাকিতে পারে—অজ্ঞান-তত্ত্ব তাহা নির্দ্ধারণ করিবে। সমীচীন অস্তিত্ব—হয় আমাদের জ্ঞানে বিদ্যমান—নয় আমাদের জ্ঞানে অবিদ্যমান, দুয়ের এক; সুতরাং হয় তাহা জ্ঞান-তত্ত্বের চরম সিদ্ধান্তের সহিত—নয় অজ্ঞান-তত্ত্বের চরম সিদ্ধান্তের সহিত—সম-তানে মিলিয়া যাইবে (পরে আমরা প্রমাণ করিব যে, জ্ঞান-তত্ত্ব এবং অজ্ঞান-তত্ত্ব এই দুই বিপরীত পক্ষের এক তমের আশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর নাই)। কিন্তু যদি জ্ঞান-তত্ত্ব এবং অজ্ঞান-তত্ত্ব উভয়েরই চরম সিদ্ধান্ত একই হইয়া দাঁড়ায় (পরে দেখা যাইবে যে ফলে তাহাই হইয়াছে) তবে, সমীচীন অস্তিত্ব আমাদের জ্ঞানের গোচরই হউক্ আর অগোচরই হউক [illegible] তাহাতে আমাদের কিছুই আসিবে যাইবে না। উভয় পক্ষেই আমরা সমীচীন অস্তিত্বের পরিচয়-লক্ষণ সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা অবধারণ করিয়া তাহাকে আয়ত্তাভ্যন্তরে আনিতে পারিব; তাহার পত্রে আমরা একটা বিশেষণ মুদ্রিত করিয়া দিতে পারিব—তাহা হইলেই হইল। তত্ত্ব-জ্ঞানের এক মাত্র চরম দান—যাহা দিবার জন্য সে জন-সাধারণের নিকটে প্রতিশ্রুত—তাহা ঐ বিশেষণ-দান। অস্তি-তত্ত্বে সমস্তই স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইবে—এখানে তাহার চরম মীমাংসা পূর্ব্বাক্লে বিবৃত করিয়া তাহার মর্য্যাদা নষ্ট করিবার প্রয়োজন করে না। এখানে এইটুকু কেবল বলা যাইতে পারে যে, কি আছে—এই প্রশ্নের মীমাংসাতেই তত্ত্ব-জ্ঞানের চরম প্রশ্ন পরিষ্কার-রূপে মীমাংসিত হইয়া যায়; সেই চরম প্রশ্নটি—যাহা দেখা দিতে সর্ব্ব প্রথমেই দেখা দেয় ও যাহার মূল উপাদান-সকল আমাদের হস্তগত না হওয়া পর্য্যন্ত যাহাকে ক্রমাগতই ঠেলিয়া রাখিতে হয়—তাহা এই,—সত্য কি?

খণ্ড-ত্রয়ের পুনরাবৃত্তি।

বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে কেবল এইটি পুনরুক্তি করিবার অপেক্ষা যে, তত্ত্বজ্ঞান তিন খণ্ডে বিভক্ত,—প্রথম, জ্ঞান-তত্ত্ব; দ্বিতীয়, অজ্ঞান-তত্ত্ব; তৃতীয়, অস্তি-তত্ত্ব। এই যে ভাগ-বিন্যাসের ব্যবস্থা, ইহা ব্যক্তি-বিশেষের রুচি অথবা মনোরথ অনুসারে প্রবর্ত্তিত হয় নাই; ঐরূপ ভাগ-বিন্যাস ব্যতিরেকে গত্যন্তর নাই বলিয়াই—আর-কোনরূপ ক্রম-পদ্ধতি তত্ত্বজ্ঞানের প্রশ্ন-সকলের সহিত সংযোগ হয় না বলিয়াই—তত্ত্বজ্ঞানকে উহার অনুবর্ত্তী হইতে হইতেছে।

খণ্ডত্রয়ের পার্থক্য-রক্ষা প্রয়োজনীয়।

উল্লিখিত-প্রকার ভিন্ন অন্য যে-কোন প্রকার খণ্ড-বিভাগ যখনই করিতে যাওয়া হয়, তখনই কিসে গোলোযোগ উপস্থিত হয় তাহা আর বলা যায় না,—তখন মৃতকল্প গতি-স্তম্ভ যাহা ঘটে তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া ভার। এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, জ্ঞান-তত্ত্বের (অর্থাৎ জ্ঞান এবং তাহার নিয়মাবলী বিষয়ক প্রশ্ন সকলের) মীমাংসা সুসম্পন্ন হইতে না হইতেই অস্তি-তত্ত্বের প্রশ্ন-মীমাংসা হস্তে লইবার এবং অস্তিত্ব-বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার যে, একটা অভ্যাস, যাহাকে প্রায়শই প্রশ্রয় দেওয়া হইয়া থাকে—কখনই রীতিমত দমন করা হয় না, তাহাই তত্ত্বজ্ঞান-সম্বন্ধীয় সমস্ত গোলোযোগের মূল। তত্ত্বজ্ঞানের গতিরোধক কারণের বিষয় যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—এ কেবল তাহারই একটা অঙ্গ বা ফল; গতিরোধক কারণ সে—আর কিছু নয়—মূল ডিঙাইয়া অন্তে উপনীত হইতে যাওয়া। বর্ত্তমান গ্রন্থের আলোচনা-প্রসঙ্গে এইরূপ বিপরীত পদ্ধতির বিষময় ফলের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমাদের চক্ষে পড়িবে। অতএব এইটির প্রতি সবিশেষ প্রণিধান করা কর্ত্তব্য যে, অস্তিত্ব-বিষয়ক যে-কোন প্রশ্নই হউক—আর যে-কোন মতই হউক—সমস্তই জ্ঞান-তত্ত্ব স্বীয় বিবেচনা হইতে বল পূর্ব্বক বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। জ্ঞান-তত্ত্ব কেবল জ্ঞান এবং জ্ঞেয় লইয়াই ব্যাপৃত থাকিবে।

এই তিন খণ্ডে স্বাভাবিক অনবধানতার সংশোধন।

তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্য, প্রবর্ত্তক কারণ এবং প্রকরণ-পদ্ধতি, এ-তিনটি বিষয়ের সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে যে-সমস্ত মন্তব্য প্রকাশিত হইল তদুপলক্ষে সাধারণতঃ—এবং বর্ত্তমান গ্রন্থের পরিচয়-লক্ষণ ও সবিশেষ বিবরণ সহ প্রদর্শিত হইল তদুপলক্ষে বিশেষতঃ—এখনো এমন একটি কথা বলিবার আছে যাহা স্বতন্ত্র একটি পরিচ্ছেদ অধিকার করিবার উপযুক্ত; সেটি এই,—তত্ত্বখানির প্রত্যেক খণ্ডের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত স্বাভাবিক চিন্তা-সুলভ অনবধানতার সংশোধন কার্য্য নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সম্বন্ধীয় আমাদের যে-সকল স্বাভাবিক অনবধানতা, জ্ঞান-তত্ত্বে তাহা হস্তে তুলিয়া লইয়া ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে; অজ্ঞান-সম্বন্ধীয় আমাদের যে-সকল স্বাভাবিক অনবধানতা, অজ্ঞান-তত্ত্বে তাহা হস্তে তুলিয়া লইয়া ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে; আর, অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় আমাদের যে-সকল স্বাভাবিক অনবধানতা, অস্তি-তত্ত্বে তাহা হস্তে তুলিয়া লইয়া ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সকল সর্ব্বদা মনে বিদ্যমান থাকে না, এই আপত্তি উপলক্ষে মন্তব্য।

আর একটি কথা আছে; কথা-টি নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। জিজ্ঞাসু ব্যক্তি এই বলিয়া ভগ্ন-মনোরথ হইতে পারেন যে, এই তত্ত্বের চরম সিদ্ধান্ত-গুলি এতই যদি সত্য, তবে সে সিদ্ধান্ত-গুলি—সত্যের পক্ষে যেমন-টি হওয়া প্রার্থনীয়—তেমনি প্রবল রূপে

এবং জীয়ন্ত-রূপে মনোমধ্যে সর্ব্বক্ষণ বিদ্যমান থাকে না কেন? ফলে, লৌকিক ব্যবহার-সুলভ মনোবৃত্তি—যাহা প্রায়শই মনুষ্যজীবনের এক-শত অংশের নিরেনব্বই অংশ অধিকার করে—তাহা যতক্ষণ-ধরিয়া চলিতে থাকে, ততক্ষণ তো ও-সব সিদ্ধান্ত কাহারো মনে স্থান পায় না। ইঁহার প্রতি বক্তব্য এই যে, তাহাদের সর্ব্বক্ষণ মনোমধ্যে বিদ্যমান থাকা প্রার্থনীয়ও নহে, প্রয়োজনীয়ও নহে। ঐ সিদ্ধান্ত-গুলি যদি তাঁহার মনোমধ্যে নিরন্তর জাগরূক থাকে, তবে তাহাদের উপদ্রবে তাঁহার লোক-সমাজে তিষ্ঠনো ভার হয়, তাহা হইলে তিনি আপনার এবং অন্যের নিকটে বিষম এক জঞ্জাল হইয়া দাঁড়ান। এক-দিকে যেমন, সামান্য কাজকর্ম্ম এবং আচার ব্যবহারে ব্যাপৃত থাকিবার সময় আপনার বা অন্যের চক্ষের সমক্ষে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত লইয়া ক্রমাগত নাড়া চাড়া করা অতীব অপকৃষ্ট শ্রেণীর পাণ্ডিত্য-প্রদর্শন; আর-এক দিকে তেমনি, বিজ্ঞানের সেবায় নিযুক্ত থাকিবার সময় লৌকিক-সিদ্ধান্ত সুলভ সত্যাভাস-সকল—বৈটকখানা এবং হাট-বাটের বিধি-ব্যবস্থা সকল—শিরোধার্য্য করিয়া চলা অতীব অপকৃষ্ট শ্রেণীর দুর্জ্জয়ত্তা-প্রদর্শন। শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত এবং লৌকিক সিদ্ধান্ত উভয়কে পরস্পরের সংসর্গ হইতে চির-বিযুক্ত করিয়া রাখা আবশ্যক। জিজ্ঞাসু ব্যক্তির সম্মুখে যাহা বিমাত্র হইতেছে, তাঁহাকে সত্য বলিয়া জ্ঞানে উপলব্ধি করাই এখানে তাঁহার যাহা কিছু প্রয়োজন; তদ্ব্যতীত তাহা তাঁহার মনে ধরিল কি ধরিল না, এ কথা এখানে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। তাঁহার জ্ঞানই এখানে সর্ব্বস্ব তাঁহার হৃদ্গ্রহের অভাব এখানে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে; আর সেই হৃদ্গ্রহের অভাব যদি এখানকার কোন সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতে আইসে, তবে তাহার কথায় কর্ণপাত না করাই বিধেয়। সত্যের আশ্চর্য্য রহস্য উদ্ভীরণের সঙ্গে আমরা আমাদের মনোবৃত্তি-সকলকে সর্ব্বদা সমুন্নত রাখিতে পারি না বলিয়া, সেই অপরাধে আমরা যদি সত্যকে ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে দিই, তবে তাহাতে সত্যের মাহাত্ম্যের প্রতি আমাদের অতি অল্পই শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়, আর, সত্যের গতিও তেমনি হয়। সত্যকে মনুষ্যের যৎসামান্য রাগ-দ্বেষাদির মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইলে তাহার আর দুর্গতির সীমা থাকে না। আমাদের মন সর্ব্বদাই অথবা প্রায়শই সত্যের 'মহৎ পরামর্শের উচ্চ শিখরের' সমযোগ্য পদবীতে আরূঢ় থাকে না বলিয়া সত্যের প্রতি সন্দিহান হওয়া লোকের একরূপ অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে; কিন্তু এটা সংশয়-বাদের কিছু অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি। মনুষ্যের মনোবৃত্তি সত্যের গভীরতম রহস্যের ভিতর তলাইতে পারে না—যদি পারে তবে সে কচিৎ কদাচিৎ যুগ-যুগান্তর-ব্যবধানে—আর তা'ও অনেক সাধ্য-সাধনায়; এই কারণে অনেক তত্ত্ববিৎ, এবং তা' ছাড়া আরো অনেকে, সত্যকে সত্য-সত্যই অসত্য বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়া থাকেন। অন্যান্য বিজ্ঞান-শাস্ত্রের বেলা আমরা তো তাহাদের প্রমাণীকৃত সিদ্ধান্ত-গুলি শুদ্ধ কেবল জানিয়াই পরিতুষ্ট হই, সেগুলিকে অনুক্ষণ হৃদয়ে জাগ্রত রাখিবার তো কোন প্রয়োজনই অনুভব করি না; দর্শন-শাস্ত্রের বেলা আমরা সেরূপ না করি কেন? শুদ্ধ কেবল দর্শন-শাস্ত্রের বেলা লোকে এইরূপ মনে করিতে খুব তৎপর যে, সত্যকে হৃদয়ে মূর্ত্তিমান করিতে—সত্যকে তাঁহাদের ঘরাও বিশ্বাসের ঘর-কন্নার প্রণালীর মধ্যে আনিতে—তাঁহারা যখন অক্ষম, তখন-আর সত্যের পক্ষ

জ্ঞান ধর্ম্ম ও পবিত্রতার অধিকারী, আমরা স্বাধীন জীব এবং আমরা অমর, অতএব আমরা মহৎ এইরূপ একটি জ্ঞান ঈশ্বর আমাদিগের আত্মায় গূঢ়রূপে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। এই আত্মমহত্ত্ব-জ্ঞানের উদ্দেশ্য এই যে যাহাতে আমাদের মনুষ্যত্ব, যাহাতে আমাদের প্রকৃত মহত্ত্ব, তাহা যেন অবিকৃত থাকে। তাহা যেন বিনষ্ট না হয়, তজ্জন্য আমরা সর্ব্বদা সযত্ন থাকিব। কিন্তু মানুষ তাহার এই আত্ম-মহত্ত্ব-জ্ঞান বিকৃত করিয়া ফেলে। এই বিকৃতির নাম মদ। এই মদ রিপু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলে আমাদের যাহাতে প্রকৃত মহত্ত্ব তাহা যদি আমাদের কিছু মাত্র থাকে তাহা হইলে তাহার জন্য আমাদের মনে অপরিমিত অহঙ্কার উপস্থিত হয়, আবার যাহাতে আমাদের মহত্ত্ব নাই তাহা মহৎ মনে করিয়া তাহার জন্য আমরা গৌরব বোধ করি। মদ রিপুর অধীন হইলে আমাদের প্রকৃত মহত্ত্বের কারণ জ্ঞান, ধর্ম্ম, ও পবিত্রতা যৎকিঞ্চিৎ থাকিলে তাহার জন্য আমাদিগের মনে অহঙ্কার উপস্থিত হয় এবং সেই অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া আমরা মনে করি যে আমরা জ্ঞান ধর্ম্ম পবিত্রতায় উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছি। আবার যাহাতে আমাদের মহত্ত্ব নাই, যাহা অস্থায়ী ও অসার, অর্থাৎ ধন সম্পত্তি, খ্যাতি প্রতিপত্তি সাংসারিক সুখ সম্পদ, বংশ-মর্য্যাদা ও পদগৌরব, এই সকলকে প্রকৃত মহত্ত্বের কারণ ভাবিয়া আমরা ঐ সকলের জন্য গৌরব বোধ করিতে থাকি। আমাদের আত্মায় ঈশ্বর-নিহিত আত্মমহত্ত্ব জ্ঞান বিকৃত হইলে এই দশা প্রাপ্ত হয়। আমাদের পবিত্র আত্মমহত্ত্ব জ্ঞান যাহাতে এরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত না হয়, এবং এরূপ বিকৃত হইলে যাহাতে আমরা তাহার সে বিকৃতি শীঘ্র দূর করিতে পারি তাহার জন্য আমাদিগের সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন নিয়োগ করা ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য।

আমাদিগের ঈশ্বর-প্রদত্ত আত্মমহত্ত্ব জ্ঞান আমাদিগের মঙ্গলের কারণ, কিন্তু উহার বিকৃত আকার যে মদ রিপু তাহা আমাদের ঘোর অমঙ্গলের কারণ। আত্ম-মহত্ত্ব-জ্ঞান অবিকৃত ও অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করিতে পারিলে কিসে আমাদিগের প্রকৃত মহত্ত্ব রক্ষা হইবে, কিসে আমরা জ্ঞান, ধর্ম্ম ও পবিত্রতায় উন্নতি লাভ করিতে পারিব, কিসে আমরা পূর্ণস্বরূপ ঈশ্বরের [illegible] পরিচয় দিতে পারিব, কিসে আমরা পুণ্যবান মহাত্মা সম্প্রদায় মধ্যে [illegible] পদের উপযুক্ত হইব, কিসে আমরা, উচ্চ [illegible] অনন্ত জীবনের [illegible] করিতে পারিব, সেই দিকেই আমাদিগের চেষ্টা ও যত্ন স্বভাবতঃ প্রবাহিত হয়, এবং এদিকে চেষ্টা ও যত্ন থাকিলে আমরা সর্ব্ব-কালে থাকিয়া সুখ শান্তি ও আনন্দের অধিকারী হইতে সমর্থ হই। আর যদি আমরা আমাদিগের আত্ম-মহত্ত্ব-জ্ঞান বিকৃত করিয়া উহা মদ রিপুতে পরিণত করি তাহা হইলে অল্প জ্ঞান, অল্প ধর্ম্ম ও অল্প পবিত্রতা লাভ করিয়া আমরা মনে করি যে আমরা মহাজ্ঞানী, মহাধার্ম্মিক, ও মহাপবিত্রতা-সম্পন্ন এবং এইরূপ অমূলক সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা জ্ঞান ধর্ম্ম ও পবিত্রতায় উৎকর্ষ সাধনে পরাঙ্মুখ হই। আবার যাহাতে মহত্ত্ব নাই গৌরব নাই, মদ রিপুর অধীন হইলে, আমরা সেই সকল পার্থিব অসার ও অস্থায়ী বস্তুতে গৌরব ও মহত্ত্ব আছে ভাবিয়া তাহারই অন্বেষণ করি। এইরূপে ধন, যশ, পদ প্রভৃতি পার্থিব বস্তুর গৌরব করিতে এবং তাহাদিগকে মহৎ ভাবিতে শিখিয়া আমরা আমাদিগের চির-কালের অমূল্য ধন জ্ঞান ধর্ম্ম পবিত্রতার

মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে তাহাদিগের গৌরব অনুভব করিতে ভুলিয়া যাই। এইরূপ হইলে অজ্ঞান, অধর্ম্ম ও অপবিত্রতার দিকে আমাদিগের গতি হয়—আমরা ক্রমে আধ্যাত্মিক অবনতি প্রাপ্ত হইতে থাকি এবং পাপ-পথে পতিত হইয়া মহা দুর্গতির ভাগী হইয়া হাহাকার করিতে থাকি।

প্রকৃত আত্ম-মহত্ত্ব-জ্ঞান ঈশ্বরের দিকে আমাদিগের আত্মার চক্ষু উন্মীলিত রাখে, মদ রিপু আমাদিগকে ঈশ্বরদর্শন হইতে বঞ্চিত করে। আত্মমহত্ত্ব-জ্ঞান আমাদিগের আত্মার নিত্য আধ্যাত্মিক মহত্ত্বের গরিমা সর্ব্বদা জাগরূক রাখে, মদ রিপু পার্থিব বস্তুর অস্থায়ী অসার নীচ-কারী গরিমায় আমাদিগের আত্মাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। আত্ম-মহত্ত্ব জ্ঞান আমাদিগকে স্বর্গের দিকে আকৃষ্ট করে, মদ রিপু আমাদিগকে পৃথিবীর দিকে টানিয়া রাখিতে চায়। আত্ম মহত্ত্ব-জ্ঞান আমাদিগকে আমাদিগের জীবনের প্রকৃত মহান উদ্দেশ্য সর্ব্বদা স্মরণ করাইয়া দেয়, মদ রিপু আমাদিগের সে স্মৃতি হরণ করে। আত্ম-মহত্ত্ব-জ্ঞান আমাদিগকে সুখ শান্তির পথে রক্ষা করে, মদ রিপু আমাদিগকে দুঃখ, সন্তাপ, ও অশান্তির পথে লইয়া যায়। অতএব আত্ম-মহত্ত্ব-জ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়া কখন তাহার স্থান মদ রিপুকে অধিকার করিতে দিবেক না, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের এই আদেশ, এই উপদেশ।

ব্রাহ্ম যিনি তিনি কখন মদ রিপুর অধীন হয়েন না। আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের রাজা অনন্তদেব পরমেশ্বরের পুত্র, আমি জ্ঞান ধর্ম্ম ও পবিত্রতায় অনন্ত উন্নতির অধিকারী, আমি স্বাধীন জীব, পশুদিগের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট পশু-সংস্কারের অধীন নহি, আমি অমর, অনন্তকাল ঈশ্বরের রাজ্যে থাকিয়া আমি অনন্ত উন্নতি লাভ করিতে থাকিব, আমি ইহাই তাঁহার প্রকৃত মহত্ত্বের কারণ জানিয়া শান্তভাবে আত্মায় তাহা পোষণ করিয়া, সেই মহত্ত্ব যাহাতে লাভ করিতে পারেন, সেই মহত্ত্বে যাহাতে কলঙ্ক না পড়ে তদনুসারে কার্য্য করিতে থাকেন। তিনি কখন জ্ঞান ধর্ম্ম ও পবিত্রতা লাভ করিয়া তাহার জন্য অহঙ্কার করেন না, মান না। তিনি জানেন যে জ্ঞান ধর্ম্ম ও পবিত্রতায় তিনি যত দূর উন্নতি লাভ করিয়া থাকুন না কেন, তাহাদের পক্ষে আরও উন্নতি সম্ভব, এবং পূর্ণ জ্ঞান ধর্ম্ম ও পবিত্রতার নিকট তাহা অতি সামান্য, আর ঈশ্বরের এই বিশাল জগতে তাঁহা অপেক্ষা উন্নত জ্ঞান ধর্ম্ম ও পবিত্রতা সম্পন্ন জীব কত রহিয়াছে। তিনি ধনের গৌরব করেন না, মানের গৌরব করেন না, পদ-মর্য্যাদার গৌরব করেন না, উচ্চ বংশের গৌরব করেন না। এই সকলের যে সারবত্তা নাই, স্থায়ী কোন মূল্য নাই, প্রকৃত কোন মহত্ত্ব নাই, তাহা তিনি সম্যক্ বুঝেন। বিপুল ধন-সম্পন্ন হইলেও, অশেষ মানী হইলেও, কিম্বা পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পদে অধিরূঢ় হইলেও তিনি দরিদ্রের ন্যায়, যশহীনের ন্যায় ও উচ্চ-পদশূন্য ব্যক্তির ন্যায় নম্র ও বিনীত হয়েন। তিনি জ্ঞান, ধর্ম্ম, ও পবিত্রতাতেই মানুষের মহত্ত্ব জানিয়া তাহাই অর্জ্জন করিতে করিতে জীবন-পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্ম বলিয়া জগতের নিকট পরিচয় দিয়া যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশানুসারে মদ রিপুকে এইরূপে পরাজিত করিতে না পারেন, তাঁহার আত্মার উপর মদ রিপুর প্রভাব এইরূপে বিনষ্ট করিতে না পারেন, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্ম নামের অবমাননা করেন। তিনি কখন প্রকৃত রূপে ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত হইতে পারেন না।

স্বাস্থ্য ও বৈবাহিক বয়স।

কি সে স্বাস্থ্য থাকে এ প্রশ্নের মীমাংসা বড় কঠিন। অনেকেই বলেন মিতাহার মিতাচার ও ব্যায়ামাদি নিয়ত অভ্যাস কর এবং আর আর নিয়ম পালন করিয়া চল স্বাস্থ্য থাকিবে। কিন্তু এদিকে আবার দেখা যায় যে মনুষ্যের পক্ষে সকল কাল ও সকল অবস্থায় ইহাতেও বিশেষ কাজ হয় না। এই সকল উপায়ে হয় তো কেহ ভাল থাকেন আবার কেহ বা তাদৃশ সুফল পান না। কিন্তু অতি প্রাচীন কালে এদেশে এক সময় এই স্বাস্থ্যের প্রশ্ন উঠিয়াছিল এবং আয়ুর্ব্বেদই ইহার মীমাংসা করিয়া যান। এই আয়ুর্ব্বেদের এক ঋষি কহিয়াছেন, স্বাস্থ্য কিসে থাকে ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, অগ্রে স্বাস্থ্যের মূল স্ত্রীপুরুষের বৈবাহিক বয়স অবধারণ আবশ্যক। কারণ স্ত্রীপুরুষের যাদৃশ আচার আহার ও চেষ্টা তাঁহাদের পুত্রও তদনুরূপ হইয়া থাকে (১)। এই সূত্রটুকু ধরিয়া স্বাস্থ্যের প্রশ্ন মীমাংসা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বৈবাহিক বয়স নির্ণয় করা চাই। কারণ চেষ্টার সহিত বয়সেরই গুরুতর ও ঘনিষ্ঠ যোগ। কিন্তু এই আয়ুর্ব্বেদপ্রণেতা ঋষি এই বৈবাহিক বয়স নির্দ্ধারণে কেবলই যে মনুষ্যের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা নহে। তিনি ইহার সহিত জনসমাজের অবস্থা অর্থাৎ দেশকালপাত্র যথাযথ বুঝিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদের ব্যবস্থা অতি গভীর ও ব্যাপক। আমরা ইহা বিবৃত করিবার পূর্ব্বে এখনকার সমাজসংস্কারকেরা বিবাহের এই বয়স সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন অগ্রে তাহার আলোচনা করিব।

এখনকার কৃতবিদ্যদিগের মতে পঞ্চদশ বর্ষ স্ত্রীর বিবাহকাল। [illegible] স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতে ইহা প্রতিকূল কাল নহে [illegible] এদেশের যেরূপ পারিবারিক প্রথা [illegible] বৈবাহিক বয়স তাহার [illegible] হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের এখনও [illegible] আছে। ইহা যে শীঘ্র [illegible] যে সম্ভাবনাও অল্প। [illegible] যে পাশ্চাত্য সভ্যতা [illegible] করিতেছে কিন্তু বর্ত্তমান [illegible] স্থলে ভবিষ্যৎ মীমাংসা হইতে পারে না। এস্থলে তুলনা দ্বারা পরীক্ষা [illegible] হইলে ইওরোপের সহিত আমাদের পারিবারিক অবস্থাগত কত প্রভেদ বুঝিতে পারিবে। তৎকালের পারিবারিক ভিত্তি আর্থিক কিন্তু এখনকার নৈতিক। তথায় স্বার্থ পিতাপুত্রের মধ্যেও বিচ্ছেদ আনিয়াছে। কিন্তু এখানে নিঃস্বার্থ, ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যবোধ উভয়কে মিলিত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং এইরূপে রাখিলে আমাদের পারিবারিক ভিত্তিমূল সুদৃঢ় বোধ হয়। কিন্তু ইহাও স্বীকার করি রাজনৈতিক শক্তি ইহার অনুকূল নয়। যদিও ইচ্ছা না থাকে তথাচ আমাদের পক্ষে বর্ত্তমান পারিবারিক বন্ধন বাধ্য হইয়া ছেদন করা সম্ভব। অবশ্য, আপাত দৃষ্টিতে ইহাই বোধ হইতে পারে কিন্তু তাহাও ঠিক্ হইতেছে না। কারণ জগতের নিয়ম এই যাহা সৎ বা মঙ্গল তাহা এককালে যায় না। যদিও কোন বাহ্য কারণে আপাততঃ যায় কিন্তু তাহার পুনরাবৃত্তির খুব সম্ভাবনা থাকে। বিজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করেন আমাদের বর্ত্তমান পারিবারিক প্রথা যদিও কোন কোন অংশে দোষস্পৃষ্ট কিন্তু ইহাতে গুণের ভাগ অধিক আছে। কিন্তু সে কথাও ছাড়িয়া দেও। হিন্দুর মর্ম্মগত বিশ্বাস এই যে পোষ্যবর্গকে অন্ন-বস্ত্র-দান একটী নিঃস্বার্থ ধর্ম্মকার্য্য। আমি অন্ন পাইব আমার বৃদ্ধ

(১) আচারাহারচেষ্টাভিঃ যাদৃশাভিঃ * * * *
স্ত্রীপুংসৌ সমুপেয়াতাং তয়োঃ পুত্রোঽপি তাদৃশঃ।

পিতামাতা বা অক্ষম ভ্রাতা অন্ন পাইবে না এ দৃশ্য বা চিন্তা হিন্দুর প্রাণে সহনীয় হয় না। যদি কেবল এইটুকু ধরিয়া বিচার করি তাহা হইলে কি সাহস করিয়া বলিতে পারি না যে, ভবিষ্যতে এই ধর্ম্মবিশ্বাসের বলেই শত শত রাজনৈতিক বাধা অতিক্রম করা আমাদের পক্ষে সম্ভব? এ বিষয়ে আরও একটু গূঢ় কথা আছে। ইওরোপের অন্নকষ্ট প্রতিযোগিতা নিবন্ধন। যাহার ক্ষমতা অধিক লক্ষ্মী তাহারই। কিন্তু এদেশে ঠিক্ এরূপ নয়। ইহা এখন অস্বাধীন। বিশেষত শাসন ও বাণিজ্য একের হস্তে। দেশের অর্থ ও শস্য আর দেশে থাকে না। এই জন্যই কষ্ট সর্ব্বব্যাপী হইতেছে। ভ্রাতা অক্ষম সুতরাং সে অন্ন পায় না দেশব্যাপক কষ্টের সময় এ বিচার থাকে না। প্রত্যুত এই অধীনতার হস্তে যতই কষ্ট বাড়িবে ততই স্বার্থপরতা প্রবল না হইয়া মনুষ্য-প্রকৃতির নিয়মে দয়াই বর্দ্ধিত হওয়া সম্ভব। ভ্রাতায় ভ্রাতায় মিলিয়া দিনান্তে শাকান্নে জঠরজ্বালা নিবারণ করিব এই ভাব প্রবল হওয়াই খুব সম্ভব। কারণ ইহা ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবর্ষ। সুতরাং পাশ্চাত্য সভ্যতার বলে এ দেশের এই পারিবারিক বন্ধনের মূল যদিও কিছু শিথিল হইতেছে কিন্তু কে সাহস করিয়া বলিতে পারেন যে ভবিষ্যতে ইহা এককালে নির্ম্মূল হইবে।

এখন বক্তব্য এই, যে, এই একান্নবর্ত্তিতা ভবিষ্যতে টেঁকুক বা নাই টেঁকুক সে বিষয়ের সবিস্তর মীমাংসা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয় কিন্তু ইহা ঠিক্ যে ইহা এখনও আছে, এবং শীঘ্রই যে যাইবে তাহাই বা কে বলিল। এখন আইস প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি। ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি পঞ্চদশ বর্ষ স্ত্রীর বিবাহকাল স্থির করিলে এই একান্নবর্ত্তিতার সহিত তাহার প্রতিকূলতা দাঁড়ায়। কারণ এই একান্নবর্ত্তিতার মূল ধর্ম্ম। একটী একান্নবর্ত্তি পরিবারে নানা প্রকৃতির লোক থাকে। কিন্তু ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যবুদ্ধি যদি তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত না করে তাহা হইলে পারিবারিক স্থিতিভঙ্গ অপরিহার্য্য। এখন স্ত্রীলোকের পক্ষে এই পঞ্চদশ এ বয়সটী কি বস্তু তাহাও একবার স্থির চিত্তে বুঝিয়া দেখ। এই সময়ে প্রকৃতির নিয়মে স্ত্রীর প্রবৃত্তি সকল যার পর নাই উদ্দাম হইয়া উঠে। কল্পনার অলৌকিক চক্ষে নয় যদি সরল ভাবে বুঝ, নিয়ত যাহা ঘটিতেছে যদি তাই ধরিয়া বুঝ তাহা হইলে দেখিতে পাইবে ধর্ম্ম ও সৎসঙ্গের মধ্যে থাকিলেও শতের মধ্যে অন্তত উননব্বইটীকে প্রকৃতি এই বয়সে ভোগপ্রবণ করিয়া ফেলে। সুতরাং ইহা স্থির কথা যে এই বয়স স্ত্রীলোকের ভোগবুদ্ধি বাড়াইয়া তুলে। এই ভোগের সহিত স্বার্থের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এদিকে আমাদের সাধারণত যেরূপ অবস্থা তাহাতে পাঁচটার মধ্যে এক জনের সর্ব্বাঙ্গীণ ভোগ চরিতার্থ হওয়া সম্ভবই নয়। সুতরাং এই ভোগবুদ্ধিই ক্রমশ ঐ স্ত্রীকে স্বার্থপ্রবণ করিয়া ফেলে। আবার যখন স্বার্থ প্রবল হইতে থাকে তখন ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যবোধ আর বড় একটা স্থান পায় না। এখনও সামান্য গৃহস্থের মধ্যে কেহ কেহ যে পৃথক অন্ন হইয়া পড়ে তাহার মূল অনেক স্থলেই এই স্ত্রীলোকের ভোগপ্রবৃত্তি বা স্বার্থ। সুতরাং বর্ত্তমান সংস্কারকেরা পঞ্চদশবর্ষ স্ত্রীর বিবাহকাল নির্দ্দেশ করিয়া সমাজমধ্যে এই মহৎ দোষটী আরও ডাকিয়া আনিতেছেন। এই ভোগলুব্ধ স্ত্রী আসিয়া কেবল আপনার ভোগ ও ভর্ত্তাকে বুঝিতে থাকিবে। স্বার্থের উৎপীড়নে ইহার নিকট অবশ্য-প্রতিপাল্য পরিবার প্রায়ই উপেক্ষিত হইবে এবং অনেক নিরুপায় লোক যার পর নাই অন্নাভাবে কষ্টে দিন-

এক আপত্তি এই দ্বাদশে স্ত্রীর ভর্ত্তৃত্ব জ্ঞান জন্মে না? প্রত্যুত্তরে আমিও বলিব দায়িত্ব বোধের সহিত ভর্ত্তৃত্ব জ্ঞান পনর বৎসরেও হয় কি? সুতরাং এ বিষয়ের একটা স্থূল জ্ঞান পনর ও বার উভয়ত্রই সমান। এই জন্য বলিতেছি দ্বাদশ বর্ষ যখন এদেশের পারিবারিক প্রকৃতির উপযোগী তখন স্ত্রীর পক্ষে দ্বাদশ এবং পুরুষের পক্ষে পঁচিশ বিবাহকাল হওয়া উচিত। তবে সৎপাত্রের অভাবে এই কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইয়া যায় তাহাতে তোমার দোষ কি? এই বিষয়ে প্রাচীন কোনও সংস্কারক বলিয়াছেন, সৎপাত্রের অভাবে কন্যা চিরকৌমার্য্যে ও দূষণীয় হইতে পারে না। ফলতঃ হিন্দুর গৃহে আজিও এই নিয়ম প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

তাই বৈদিক ঋষি আমাদের জন্য বিবাহের বয়ঃপ্রশ্ন মীমাংসা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি সেই সুদূর অতীতে এই নির্দ্দিষ্ট বিবাহ বয়সটি সমর্থন করিবার জন্য একটি বৈজ্ঞানিক তর্কও উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি কহিয়াছেন গর্ভস্থ সন্তানের কেশ শ্মশ্রু নখ লোম অস্থি ও স্নায়ু প্রভৃতি কঠিন পদার্থ সকল পিতৃজ (৩)। আর মাংস শোণিত মেদ মজ্জা ও হৃৎ প্রভৃতি কোমল পদার্থ সকল মাতৃজ (৪)। তিনি বলিয়াছেন সন্তানের অবয়বগত এই পিতৃজ ও মাতৃজ অংশগুলি গর্ভে নির্দোষ ভাবে প্রাপ্ত হইলে তবে সে সুস্থ হইবে। এইটী বৈজ্ঞানিক মীমাংসা কি না সে বিষয়ে সন্দেহ, কিন্তু আমাদের নিকট ইহা বিজ্ঞান অপেক্ষা সমধিক কবিত্ব-ব্যঞ্জক বলিয়া বোধ হয়। যাহাই হউক তিনি যে স্ত্রী পুরুষের বিবাহোপযোগী বয়োনির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা যে সম্পূর্ণ দেশকাল ও পাত্র-সঙ্গত ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সংস্কার-প্রয়াসের মীমাংসায় তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে [illegible] দোষ আছে। বর্ত্তমান সংস্কারকেরা [illegible] নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া [illegible] ধর্ম্মনীতি অপেক্ষা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের [illegible] সম্পূর্ণ দৃষ্টি [illegible] রাখিয়াছেন। [illegible] একটী বিশেষ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলা যায় যে বর্ত্তমানে আমাদের সমাজের যেরূপ অবস্থা তাহাতে [illegible] সহিত এই বয়স্থা অনূঢ়ার পরিচয় হইলে দোষ ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে এবং অনেক স্থলে ঘটিয়াও থাকে। সুতরাং বর্ত্তমান সংস্কারকদিগের মীমাংসায় দাঁড়াইয়াছে এই যে, একটা দোষ পরিহার করিতে গিয়া আর একটা গুরুতর দোষের প্রশ্রয় দান। এই জন্য বলি সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা করিতে কেবল বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। ধর্ম্মনীতি সুরক্ষিত হইবে কি না তাহাও দেখা চাই। জনসমাজ হইতে যদি ধর্ম্মনীতি যায় তবে তাহার থাকে কি? কিন্তু হিন্দু ঋষির মীমাংসায় এ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা খুব অল্প। ইহা নিশ্চয় কথা স্ত্রীলোক [illegible] অপেক্ষা [illegible] নৈতিক [illegible]

(৩) গর্ভস্য কেশশ্মশ্রু লোমাস্থি নখ দন্ত শিরা স্নায়ু ধমনীরেতঃ প্রভৃতীনি স্থিরাণি পিতৃজানি।

(৪) মাংস শোণিত মেদো মজ্জাহৃৎনাভি যকৃৎ প্লীহান্ত্র গুদপ্রভৃতীনি মৃদূনি মাতৃজানি।

রক্ষার জন্য একটু বিশেষ মনোযোগী হয়। কারণ ভর্ত্তৃগৃহ তাহার সাংসারিক জীবনের মুখ্য ক্ষেত্র। তথায় জয়লাভ করিতে পারিলে তাহার তিন কুলের মুখ উজ্জ্বল হইবে হিন্দুস্ত্রীর ইহাই এক বিশ্বাস। অতএব তুমি যদি দ্বাদশে কন্যার বিবাহ দিয়া তাহার সমস্ত সৎবৃত্তির অনুশীলন করিবার জন্য ভর্ত্তৃগৃহে রাখ তাহা হইলে আত্মরক্ষা তাহার পক্ষে সহজ হইবে। এখনও দেখ হিন্দুর ভিতর বিবাহের পর কন্যাকে যে পিতৃগৃহে বড় থাকিতে দেয় না ইহার কারণই এই। যাহাই হউক, বর্ত্তমান সংস্কারকেরা বিবাহের বয়োনির্দ্ধারণে যখন ধর্ম্মনীতিকে উপেক্ষা করিয়াছেন তখন তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যে কোনও জনসমাজের উপযোগী নয় তাহা সুনিশ্চিত। সুক্ষ্ম বুঝিতে গেলে ইহা সমাজগঠনের জন্য নয় ইহা সমাজভঙ্গের জন্য। ঐ নিয়ম যত শীঘ্র এ দেশ হইতে তিরোহিত হয় ততই এদেশের মঙ্গল।

আমরা উপসংহারে সংস্কারকদিগকে একটী কথা বলি। হিন্দু সমাজের ভিত্তি নৈতিক। ইহা বড় উন্নত সমাজ। ইহার ভিতর কোন রূপ সংস্কার আনিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইওরোপের সামাজিক ভিত্তি আর্থিক। তাহার দৃষ্টান্তে কোনওরূপ পরিবর্ত্তন আনিলে ইহার বক্ষে তাহা কখন সহ্য হইবে না। কিন্তু সমাজ এক স্থলে কোন কালেই দাঁড়িয়া থাকিবার নয়। তুমি ইচ্ছা না করিলেও ইহা আপনার শক্তিতে চলিতে থাকে। কিন্তু তা বলিয়া শঙ্খাসুরের ন্যায় বেগবতী ভাগীরথীর স্রোতকে অন্য দিকে লইয়া যাইও না। ইহা আপনার শক্তিতে চলুক। আত্রবৃক্ষে কখন নিম্ব ফলিবে না। তবে তোমার কার্য্য কেবল তাহার কণ্টক শোধন করা। তুমি দেশকাল বুঝিয়া তাহাই কর। দেখিবে ঐ হিন্দু সমাজের বক্ষে সেই অতীতের গভীরে প্রোথিত নৈতিক বীজ যাবৎ চন্দ্রসূর্য্য কখন কুফল প্রসব করিবে না।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকাগুলি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর। প্রথমভাগ।

২। উদ্গীথা—শ্রীপ্রমথনাথ শাস্ত্রী প্রণীত।

৩। পুত্রপ্রসাবনী—পুত্র। শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষাল প্রণীত।

৪। মদ খাও নেশা ছুটিবে না। শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

এই গ্রন্থ লেখক মহাকবি হাফেজের ন্যায় এক অলৌকিক মদের আমদানি করিয়াছেন। ইহার গুণ এই যে অন্য মদের ন্যায় ইহার নেশা ছুটিবে না। আমরা সকলকেই এই মদ পান করিতে অনুরোধ করি।

৫। Revised Prayer book. Compiled by the Rev. Charles Voysey. B A.

৬। Voysey's Sermons—1885.

৭। Theistic Church—The order of public worship &c—

Bibliotheca Indica, Published by the Asiatic Society of Bengal.

N. S. N. 575. (Lalita-Vistara)

N. S. N. 576. (Zafarnamah)

N. S. N. 577. (Prithiraja Rasau)

N. S. N. 578. (Uvasagudasao)

N. S. N. 579. (Chaturvarga chintamani)

N. S. N. 580. (Nirukta)

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal May, June 1886.

Theosophist, August 1886.

Fellow Worker, July 1886.

ধর্ম্মপ্রচার। আষাঢ় ১২৯৩।

বামাবোধিনী পত্রিকা। শ্রাবণ ১২৯৩।

আলোচনা। ঐ

নব্য ভারত। ঐ

প্রচার। ঐ

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৭ আশ্বিন মঙ্গলবার "বালী ধর্ম্ম সমাজের" চতুর্থ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। ধর্ম্মানুরাগী মহোদয়গণ উপাসনায় যোগদান করেন ইহা নিতান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীহীরালাল মুখোপাধ্যায়।

[illegible]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৭ ভাদ্র রবিবার ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭।

আচার্য্যের উপদেশ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ। পরমাত্মাকে দর্শন শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে। প্রথমে পরমাত্মাকে দর্শন করিবে। জ্ঞানের বিষয় যখন জ্ঞান-সন্নিধানে উপস্থিত, তখন তাহার প্রতি চক্ষু উন্মীলন করা'র নাম দর্শন। পরমাত্মা যখন আমাদের জ্ঞান-সন্নিধানে উপস্থিত, তখন তাঁহার প্রতি জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিলেই পরমাত্মাকে দর্শন করা হয়। পরমাত্মা আমাদের আত্মাতে সর্ব্বদাই উপস্থিত; কিন্তু মোহ-অন্ধকার মাঝখানে আসিয়া যখন তাঁহাকে আড়াল করিয়া ফেলে তখন পরমাত্মা আমাদের নিকট উপস্থিত থাকিয়াও অনুপস্থিত; আবার যখন শ্রদ্ধা ভক্তি এবং বিশুদ্ধ প্রেমের আলোক আসিয়া মোহ-অন্ধকারকে [illegible] রিয়া দেয়, তখন পরমাত্মা আমাদের আত্মাতে আবির্ভূত হন, তখন [illegible] করিলেই আমরা তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া কৃত কৃতার্থ হই।

আমাদের জ্ঞান নানা জাতীয়; সকল জাতীয় জ্ঞানকে আমরা দর্শন বলি না; যে জ্ঞানের লক্ষ্য-বিষয় আমাদের সন্নিধানে উপস্থিত, সেই জ্ঞানকেই আমরা দর্শন বলি। স্মরণ-জাতীয় জ্ঞান দর্শন নহে; কারণ, অনুপস্থিত বিষয়েরই স্মরণ সম্ভবে। ভাবনা-জাতীয় জ্ঞান দর্শন নহে; কারণ অনুপস্থিত বিষয়কে উপস্থিতের মত করিয়া মনোমধ্যে কল্পনা করা'র নামই ভাবনা; দৃষ্ট বিষয় ভাবনার বিষয় নহে, অদৃষ্ট বিষয়ই ভাবনার বিষয়। অনুমান-জাতীয় জ্ঞান দর্শন নহে; কারণ অনুমান ভাবনারই দল-ভুক্ত; দৃষ্ট বিষয়ের সম্বন্ধ-সূত্রে অদৃষ্ট বিষয়ের ভাবনা, যেমন ধুমের সম্বন্ধ-সূত্রে অগ্নির ভাবনা, ইহারই নাম অনুমান। অনুমান ভাবনা-বিশেষ সুতরাং তাহা দর্শন নহে।

দর্শন তবে কি? চক্ষের দর্শনকেই সচরাচর আমরা দর্শন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। কিন্তু চক্ষের দেখাই শুধু যে, দেখা, তাহা নহে; তদ্ব্যতীত মনের দেখা আছে, আত্মার দেখা আছে। মনের দেখা এবং

আত্মার দেখা এ তিনের মধ্যে প্রভেদও আছে। মনের দেখা এক প্রকার স্বপ্ন দেখা, তাহা অতীব [illegible]; স্বপ্নে কল্য যাহা দেখিয়াছি অদ্য তাহা দেখিতে পাই না; কল্য আমার মনোমধ্যে কত কি উদয়াস্ত হইয়াছে অদ্য তাহা আমার মনে নাই। মনের দেখা অপেক্ষা চক্ষের দেখা স্থিরতর; কল্য যে সব চিন্তা যেরূপ পূর্ব্বাপরক্রমে আমার মনোমধ্যে দেখা দিয়াছে, অদ্য সেরূপ পূর্ব্বাপর-ক্রমে সে-সব চিন্তার দেখা পাওয়া অসম্ভব; কিন্তু দশ বৎসর পূর্ব্বে এই সমাজ-মন্দিরের যেখানে যে প্রাচীর দেখিয়াছি, আজিও ঠিক্ সেইখানে সেই প্রাচীর দেখিতেছি; অতএব চক্ষের দেখা মনের দেখা অপেক্ষা স্থিরতর। আত্মার দেখা চক্ষের দেখা অপেক্ষাও স্থিরতর। এমন কত বিষয় আমরা চক্ষে দেখিয়াছি—এখন যাহা কেবল মনশ্চক্ষেই কথঞ্চিৎ দেখিতে পাই, এক সময়ে যাঁহাকে আমরা প্রতিনিয়তই ঘরে দেখিয়াছি—এখন হয় তো সাতসমুদ্র-পারে না গেলে তাঁহার দর্শন পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু আত্মাকে দেখিবার জন্য কোন কালেই দূরে যাইতে হয় না। বিষয়-দর্শন আমাদের নিজের আয়ত্তাধীন নহে, এই জন্যই তাহা অনিশ্চিত; আত্মার দর্শন আমাদের নিজের আয়ত্তাধীন, এই জন্যই তাহা স্থিরতর। আমাদের চক্ষুর দোষেও বিষয় অদর্শন হইতে পারে; আলোকের দোষেও বিষয় অদর্শন হইতে পারে, মালিন্য প্রভৃতি বিষয়ের নিজ দোষেও বিষয় অদর্শন হইতে পারে; আমার মন এবং চক্ষু এ দুয়ের সহিত যোগভ্রষ্ট হইলেও বিষয় অদর্শন [illegible]; এক স্থানে আমাদের চক্ষু, আর এক স্থানে সূর্য্য চন্দ্র প্রদীপ, আর এক স্থানে বিষয়; কাজেই বিষয় দর্শন আমাদের নিজের আয়ত্তাধীন নহে; কিন্তু আত্মার বিষয়, আত্মার আলোক, এবং আত্মার চক্ষু সকলই একাধারে বর্ত্তমান, এজন্য আত্ম-দর্শন আমাদের আপনাদের আয়ত্তাধীন। অতএব মনের দেখা অপেক্ষা চক্ষের দেখা স্থিরতর, চক্ষের দেখা অপেক্ষা আত্মার দেখা আরো স্থিরতর। মনের দেখা অপেক্ষা, চক্ষের দেখার সহিত আত্ম-দর্শনের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। চক্ষের দেখা প্রত্যক্ষ-জ্ঞান—সম্মুখ-স্থিত প্রাচীরকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি; আত্মার দেখা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান,—আত্মাকে আমরা স্বতঃ উপলব্ধি করিতেছি—আত্মারই দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করিতেছি। প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান এই দুই প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য এই যে, উভয়ের কোনটিরই বিষয় অনুপস্থিত নহে, উভয়েরই বিষয় উভয়ের সন্নিধানে উপস্থিত; দৃষ্ট বস্তু চক্ষুর সন্নিধানে উপস্থিত, আত্মা আত্মার সন্নিধানে উপস্থিত। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের এইরূপ সাদৃশ্য আছে বলিয়া স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান শাস্ত্রাদিতে অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা দর্শন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান উভয়ের মধ্যে যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনি প্রভেদও আছে; প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় সময়ে উপস্থিত হয় এবং সময়ে অনুপস্থিত হয়,—এই সমাজ-মন্দির এখন আমাদের সন্নিধানে উপস্থিত কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই অনুপস্থিত হইবে, কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের বিষয় চিরকালই আমাদের সন্নিধানে উপস্থিত থাকিবে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের এইরূপ প্রভেদ সত্ত্বেও—উভয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিকাংশ সাদৃশ্য আছে বলিয়া স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান অনেক স্থানে দর্শন বলিয়া [illegible] থাকে।

অতএব পরমাত্মাকে দর্শন করিবে ইহার অর্থ—আত্মার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে—আত্মপ্রত্যয়ে—দর্শন করিবে। মনকে নির্ম্মল করিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতির সহিত পরমাত্মাকে দর্শন করিবে। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে আমরা যেমন আমাদের আত্মাকে দেখিতেছি—তেমনি আমাদের আত্মার অশেষ প্রকার অভাবও দেখিতেছি; আমাদের মন কখনো বিষাদে আচ্ছন্ন, কখনো দুঃখে ম্রিয়মান, কখনো আনন্দে উৎফুল্ল; আমাদের আত্মা এইরূপ সুখ-দুঃখ-ময় মানসচক্রে নিয়ত বিঘূর্ণিত হইতেছে। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে আমরা আমাদের আত্মার অপূর্ণতা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি এবং সেই অপূর্ণতার পূরণ-স্বরূপে পরিপূর্ণ মহান্ পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি; এইরূপে তাঁহাকে আমরা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতির সহিত প্রণাম করি—তাঁহাতে আমরা হৃদয় সমর্পণ করি, তাঁহার চক্ষুর সমক্ষে আমরা আমাদের হৃদয়ের সমস্ত অভাব—সমস্ত বেদনা—উন্মুক্ত করিয়া দিই। তখন তিনি আমাদিগকে সান্ত্বনা করেন—শান্তি-বারিতে তিনি আমাদের আত্মাকে পরিপ্লুত করেন—অমৃতের উৎস উৎসারিত করিয়া দেন। ব্রহ্মর্ষি তাই বলিতেছেন

"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥

"জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত সমান বৃক্ষে নিমগ্ন রহিয়া এবং দীনভাবে মুহ্যমান হইয়া সর্ব্বদা শোক করিতে থাকে, কিন্তু যখন সর্ব্বসেব্য ঈশ্বরকে এবং তাঁহার মহিমাকে দেখিতে পায়, তখন তাহার আর শোক থাকে না।" জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত সমান বৃক্ষে অবস্থিতি করিতেছে ইহার অর্থ কি? এক স্থান-স্থিত, দুই বস্তুর একটিকে ছাড়িয়া যেমন, আর একটিকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভবে না, বৃক্ষকে ছাড়িয়া বৃক্ষ-নিহিত শাখা প্রত্যক্ষ করা সম্ভবে না, সেইরূপ পরমাত্মাকে ছাড়িয়া জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভবে না। কেননা জীবাত্মার যাহা কিছু সমুদায়ই পরমাত্মাকে এবং তাঁহার প্রসাদকে অপেক্ষা করে। চিত্রকরের চিত্র-সৌন্দর্য্য, কবির কবিতা-মাধুর্য্য, এবং গায়কের গীত-মাধুর্য্য যেমন স্বভাবের সৌন্দর্য্যের অনুপ্রকাশ, জীবাত্মার জ্ঞান-প্রেম সেইরূপ পরমাত্মার জ্ঞান-প্রেমেরই অনুপ্রকাশ। স্বভাবের সৌন্দর্য্যকে ছাড়িয়া যেমন চিত্রকরের চিত্র-সৌন্দর্য্য কিছুই নহে, সেইরূপ পরমাত্মাকে ছাড়িয়া জীবাত্মা কিছুই নহে। স্বভাবের সৌন্দর্য্য যদি কোথাও না থাকে, তবে চিত্রকরের চিত্র কবির কবিতা এবং গায়কের গীত সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়; আবার, স্বভাবের সৌন্দর্য্যের সহিত উহারা যত ঘনিষ্ঠ-রূপে সংযুক্ত থাকে, ততই উহারা সজীবতা প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ আমাদের আত্মা পরমাত্মার সহিত যত প্রগাঢ় রূপে সংশ্লিষ্ট থাকে, তাহা ততই সজীবতা প্রাপ্ত হয়। আমাদের জ্ঞান যে-অংশে সজীব জ্ঞান, আমাদের প্রেম যে-অংশে সজীব প্রেম, আমাদের আত্মা যে-অংশে সজীব আত্মা, সেই অংশে তাহা পরমাত্মার অনুপ্রকাশ। এইরূপে আমরা পরমাত্মাকে জ্ঞানালোকের সূর্য্য রূপে, আত্মার অভাবের পরিসমাপ্তি রূপে, আত্মার ধ্রুব এবং অপরিবর্ত্তনীয় আশ্রয় রূপে, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি।

সুন্দর বস্তু দেখিবামাত্র আমরা যেমন তাহার সৌন্দর্য্যে মোহিত হই, পরমাত্মার দর্শন-মাত্রে আমরা তাঁহার প্রতি সেইরূপ আকৃষ্ট হই; তখন আমাদের কঠিন মন প্রেমে গলিয়া কোমল হইয়া যায়, তখন আমরা তাঁহাকে আত্মাতে চিরকাল প্রেম-বন্ধনে

বাঁধিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু পরমাত্মাকে চির-আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে—তেমন প্রেম কোথায়? পরমাত্মা নিজে যেমন অসীম প্রেমের আকর তেমন আর কে? তাঁহার প্রেমের কোটি অংশের এক অংশ পাইলে আমরা দেবতাদিগের অপেক্ষাও ধন্য হইয়া যাই! পরমাত্মা যখন তাঁহার অতুলন মহিমা এবং মধুময় সৌন্দর্য্যের সহিত আমাদের আত্মাতে আবির্ভূত হ'ন, তখন আমরা তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করি, তাঁহাতে হৃদয় সমর্পণ করি, তাঁহার অমৃত প্রসাদ-বারিতে দেহ মন পবিত্র করি, তখন আর আমাদের আনন্দের সীমা থাকে না; কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র আত্মা এক-কালে কত আনন্দ ধারণ করিতে পারে? উষার পবিত্র নিশ্বাসে পূর্ব্বদিক্ আরক্তিম হইয়া উঠে এবং সেই নিশ্বাসেই উষা অন্তর্হিত হইয়া যায়। পরমাত্মা আমাদিগকে দর্শন দিয়া আমাদের আত্মাকে যত দূর পূর্ণ করিবার হয় তাহাকে পূর্ণ করেন, যে আত্মার যত দূর ধারণ-শক্তি তাহাকে তত দূর কৃতার্থ করেন, অবশেষে আমাদের দর্শন হইতে অন্তর্হিত হ'ন;—তখন আমরা কোথায় ছিলাম আর কোথায় আসিয়া পড়ি! সূর্য্যের অদর্শনে পৃথিবীর যেরূপ দশা হয়, পরমাত্মার অদর্শনে আত্মার সেইরূপ দশা হয়। পরমাত্মা যখন অদর্শন হ'ন, তখন আমাদের কি কর্ত্তব্য? আমরা কি নিরাশ হইয়া পড়িয়া থাকিব? ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন "পরমাত্মাকে দর্শন করিবে।" কিন্তু যখন তিনি আমাদের চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হ'ন, তখন আমরা কি করিব? ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন শ্রবণ এবং মনন করিবে। শ্রবণ-দ্বারা দৃষ্ট বস্তুর স্মরণ হয় এবং পুনর্দর্শনের স্পৃহা উদ্দীপ্ত হয়। দর্শন-দান করা পরমাত্মার কার্য্য—কিন্তু দর্শন-স্পৃহাকে অবসন্ন হইতে না দেওয়া আমাদের কার্য্য; অগ্নি-উপাসকেরা যেমন ইন্ধন-সংযোগ করিয়া সর্ব্বদাই অগ্নিকে প্রজ্বলিত রাখে, সেইরূপ ঈশ্বরের গুণানুবাদ শ্রবণ দ্বারা ঈশ্বর-স্পৃহাকে সর্ব্বদা প্রদীপ্ত রাখা কর্ত্তব্য। তাহার পর শ্রুত বিষয়ের মনন করা কর্ত্তব্য। অনুপস্থিত বিষয়কে ভাবনাতে উপস্থিত করিবার নাম মনন। পরমাত্মা যখন আমাদের অন্তশ্চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, তখন তাঁহার কথা-শ্রবণে আমাদের হৃদয়ে তাঁহার দর্শন-স্পৃহা বল করিয়া উঠে, এই জন্য তখন নির্জ্জন প্রদেশে গিয়া আমরা তাঁহার মনন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হই; তাঁহার দর্শন-বিরহে তাঁহার চিন্তাই আমাদের সম্বল হয়। স্পৃহার উদ্দীপন হইলেই চিন্তার প্রয়োজন হয়; এবং সেই চিন্তার প্রগাঢ়তা এবং একাগ্রতাই নিদিধ্যাসন। স্পৃহা এবং মনের আবিষ্ট চিন্তা যখন একাগ্রতা সহকারে ঈশ্বরকে মনোমধ্যে আহ্বান করে, ঈশ্বর তখন সাধকের আত্মাতে পুনর্ব্বার আবির্ভূত হ'ন। তখন প্রচণ্ড রৌদ্রের পর শীতল সমীরণ যেমন অধিকতর রমণীয়, গ্রীষ্মের পরে দেবতার বর্ষণ যেমন অধিকতর রমণীয়, সেইরূপ পরমাত্মার সহবাস তখন ভক্তের হৃদয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রমণীয় হইয়া উঠে। তখন ভক্তের কত না আনন্দ; তিনি তখন ধন্য ধন্য হইয়া পুনর্ব্বার ঈশ্বরের চরণে প্রণত হ'ন, পুনর্ব্বার তিনি ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখেন, পুনর্ব্বার তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হয়—তাঁহার মনের গুপ্ত কপাট সকল উদ্ঘাটিত হইয়া সর্ব্বত্র মুক্ত সমীরণ যাতায়াত করিতে থাকে—তাঁহার শরীরে স্ফূর্ত্তি হয়, তাঁহার জীবন জন্মের মত কৃতকৃতার্থ হয়।

হে পরমাত্মন্! "আবিরাবীর্ম এধি" তৃষিত হৃদয়ে আমরা তোমাকে ডাকিতেছি তুমি আমাদের নিকট আবির্ভূত হও। তো-

মার চরণে প্রণিপাত করিয়া আমরা জীবনকে সার্থক করিব তুমি আমাদের নিকট আবির্ভূত হও। হে ভক্তের সর্ব্বস্ব ধন—তুমি আমাদের নিকট প্রকাশিত হও! তোমার মধ্যে আমাদের মধ্যে যেন মোহ-ব্যবধান না থাকে; তোমার দর্শন-লাভের জন্য আমরা এখানে সমাগত হইয়াছি, তোমার চরণে প্রণিপাত করিতেছি, তুমি তোমার প্রসাদ-বারি বিতরণ করিয়া আমাদের সমস্ত কামনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

দর্শন-সংহিতা।

সকল জ্ঞানের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী নিয়মের সমান আবশ্যকতা।

কিন্তু জিজ্ঞাসু ব্যক্তি বলিতে পারেন যে এই তত্ত্বের কার্য্য-সিদ্ধির জন্য—অবশ্যম্ভাবী নিয়ম সকলকে ওরূপ প্রভূত ব্যাপ্তিশালী করিয়া দাঁড় করানো কি একান্তই আবশ্যক? আর অন্য জ্ঞানের সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া শুধু যদি কেবল মনুষ্য-জ্ঞানের সম্বন্ধে ঐ সকল নিয়মের আধিপত্য সপ্রমাণ করা যায়, তবে তাহাই কি এখানকার পক্ষে যথেষ্ট নহে? তাহা যদি যথেষ্ট হয়, তবে সর্ব্বসাধারণতঃ সকল জ্ঞানের স্কন্ধে ও-সকল নিয়ম চাপাইতে না যাওয়াই তো ভাল। কিন্তু, ভ্রাতঃ, তাহা যথেষ্ট নহে। আমাদের কার্য্যোদ্ধারের জন্য এটি সংস্থাপন করা নিতান্ত-পক্ষেই আবশ্যক (অতীব স্পষ্টাক্ষরে এটি আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে) নিতান্ত-পক্ষেই আবশ্যক যে, একা কেবল মনুষ্যের জ্ঞান নহে কিন্তু সকল জ্ঞানই—জ্ঞান-মাত্রেই—ঐ সকল নিয়মের বশতাপন্ন। এ জন্য উপরে যে ইঙ্গিত-টি প্রক্ষিপ্ত হইল (কি না—শুদ্ধ কেবল মনুষ্য-জ্ঞানেরই কথা কওয়া হউক) এ তত্ত্ব তাহাতে সম্মত হইতে পারে না। তবুও যদি এখানকার এই পদ্ধতির বৈধতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির মনের ভিতর কোন প্রকার খোঁকা থাকে, তবে আমরা তাঁহাকে এই পরামর্শ দিই যে, প্রতিপক্ষ-বিবাদের নিয়ম যাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি—তাহা সকল-জ্ঞানের পক্ষেই একান্ত অলঙ্ঘনীয় কি না—এ বিষয়ে তিনি আপনি কি বলেন তাহা একবার স্থির-চিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখুন। আমাদেরই হউক আর অন্যান্য-দিগেরই হউক—কোন জ্ঞানই কি ঐ বিপরীত-পক্ষের উভয়কেই এক সঙ্গে অবধারণ করিতে পারে? তিনি আপনিই বলিবেন—কখনই না। অতএব ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রতিপক্ষ-বিবাদের নিয়ম সকল জ্ঞানের পক্ষেই নির্বিশেষে বলবৎ। সর্ব্বসাধারণতঃ সকল জ্ঞানের সম্বন্ধে আমরা যদি একটি-কোনো নিয়মের (যেমন ঐ নিয়মটির) বলবত্তা সংস্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলেই তো সমস্ত বিবাদ মিটিয়া গেল, ও আমাদের পক্ষই স্থির-তর রহিল। এখানে বলা আবশ্যক যে, আমাদের এই তত্ত্ব পূর্ব্ব হইতেই এটি কিছু-আর মানিয়া লয় না যে, মনুষ্য-জ্ঞান ছাড়া আর কোন প্রকার জ্ঞান আছে। এ তত্ত্বের কার্য্যারম্ভের পক্ষে ওরূপ মানিয়া লওয়া আবশ্যকই হয় না—সুতরাং উহা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু তা বলিয়া—এ তত্ত্ব এ কথাটি বলিতে ছাড়ে না যে, মনুষ্য-জ্ঞান ব্যতীত যদি (বস্তুতঃ বা সম্ভবতঃ) আর-কোন প্রকার জ্ঞান থাকে, তবে তাহা ঐ-সকল নিয়মের বশবর্ত্তী ভিন্ন আর-কিছু হইতে পারে না; কারণ, ও-সকল নিয়ম জ্ঞান-মাত্রেরই, এবং চিন্তা-মাত্রেরই, সম্ভাব্য-

জ্ঞার নিদান; উহাদিগকে ছাড়িয়া জ্ঞানও সম্ভব হয় না, চিন্তাও সম্ভব হয় না।

অসঙ্গতি-দোষের দায় অতিক্রমণ।

এই তন্ত্রের বিরুদ্ধে এই আর-একটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত বিষয়কে মনুষ্য-বুদ্ধির আয়ত্তাধীন করিয়া প্রতিপন্ন করাতে—এ তন্ত্র-টি অসঙ্গতি দোষে লিপ্ত হইয়াছে। এ তন্ত্র ও-রূপ কোন দোষেই লিপ্ত নহে। এ তন্ত্র বলে এই যে, মনুষ্যের বুদ্ধি এটি বেস্ বুঝিতে পারে যে, অনেক বিষয় যাহা তাহার নিজের অগম্য, তাহা আর-কোন উচ্চতর বুদ্ধির গম্য হইলেও হইতে পারে; এজন্য সে-সকল বিষয় যে, একান্তই বুদ্ধির অগম্য, স্বরূপতই বুদ্ধির অগম্য, তাহা নহে; তবে কি না, ওরূপ উচ্চতর বুদ্ধি—যদি থাকে; কারণ, তাহা যে—আছেই আছে—এরূপ সিদ্ধান্ত আগে ভাগে মানিয়া লওয়া এখানকার অভিপ্রেত নহে। ও-সকল বিষয়, আমাদের নিজ-বুদ্ধির, যদিও অগম্য, তথাপি উহারা বোধগম্যের কোটায় স্থান পাইবার উপযুক্ত। আমাদের এই তন্ত্রের মতে—বোধগম্য-কোটার ভিতর দুইটি কুটুরি;—প্রথম, আমাদের আপনাদের বুদ্ধির গম্য; দ্বিতীয়, আমাদের আপনাদের বুদ্ধির অগম্য হইয়াও (বস্তুতঃ বা সম্ভবতঃ) আর কোন-না-কোন বুদ্ধির গম্য। এই দ্বিতীয় কুটুরির সামগ্রী-গুলিকে আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বুঝিতে পারি না বটে, কিন্তু এটা বুঝিতে পারি যে, তাহারা বোধগম্য,—আমাদের আপনাদের বুদ্ধির গম্য না হউক্—যথাযোগ্য বুদ্ধির গম্য। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, বোধগম্য কোটার অভ্যন্তরে কুটুরি যদিচ দুইটি, কিন্তু কোটা সে একটি মাত্র; বোধগম্য-কোটার প্রতিদ্বন্দ্বী কোটা যাহা তাহা হইতে পৃথক্ রূপে বিবেচ্য, তাহা শুধু কেবল আমাদের আপনাদের বোধাতীত হইয়াই ক্ষান্ত নহে—তাহা একান্তই বোধাতীত—স্বরূপতই বোধাতীত; একান্ত বোধাতীতের আর-এক নাম স্ববিরোধী বা অসঙ্গত।

অসঙ্গতি-দোষ আমাদের নহে কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষ-দিগের

অসঙ্গতি দোষ যে আমাদের নহে কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষদিগের, তাহার প্রমাণ এই যে, চিন্তনীয় এবং অচিন্তনীয় এ দুয়ের মধ্যে সচরাচর যেরূপ দার্শনিক বৈলক্ষণ্য নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা এমনি এক সৃষ্টি-ছাড়া ব্যাপার যে, তাহা নৈয়ায়িক শ্রেণী-বিভাগের কোন নিয়মেরই প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, ও তাহার উৎপীড়নে দর্শন-শাস্ত্র এ-যাবৎকাল মরণাপন্ন হইয়া রহিয়াছে। দার্শনিক পণ্ডিতেরা বস্তু-সকলকে (বস্তু-শব্দ এখানে অতীব ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত—অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়-মাত্রই এখানে বস্তু) দার্শনিক পণ্ডিতেরা বস্তু-সকলকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন; যে সকল বস্তু আমাদের আপনাদের চিন্তনীয় তাহারা একদিকে (এই সকল বস্তুকেই প্রকৃত রূপে চিন্তনীয় বলিয়া ধরা হইয়াছে), আর, যে-সকল বস্তু আমাদের আপনাদের চিন্তনীয় না হইয়াও অন্য কাহারো-না-কাহারো চিন্তনীয়—ইহারা এক-দিকে; তাহার মধ্যে শেষোক্ত শ্রেণীকে তাঁহারা একেবারেই অচিন্তনীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহাতে ফল কি দাঁড়াইতেছে তাহা একবার দেখ;—যাহা শুদ্ধ কেবল আমাদের আপনাদের অচিন্তনীয় তাহা ঐকান্তিক অচিন্তনীয়ের কোটায়—অর্থাৎ স্ববিরোধী এবং অর্থ-শূন্যের কোটায়—আটক পড়িয়া যাইতেছে। এটা নিঃসংশয় যে, আমাদের আপনাদের অচিন্তনীয় কিন্তু আর কাহারো চিন্তনীয় এরূপ তত্ত্বের সঙ্গে আমাদের আপনাদের চিন্তনীয় তত্ত্বের বরং বস্তু-

কটা সম্পর্ক আছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে স্ববিরোধী তত্ত্বের আদবেই কোন সম্পর্ক নাই; হইলে হইবে কি—আমাদের তত্ত্বজ্ঞ ভ্রাতারা সে দিকে আদবেই দৃক্‌পাত করেন না। তাঁহারা, চিন্তনীয় এবং অচিন্তনীয়, এ দুয়ের মধ্যে এমনি এক লক্ষণ ভেদ আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন যে, তাহাকে লক্ষণ ভেদ না বলিয়া লক্ষণ-সঙ্কর বলিলেই ঠিক্ হয়; এই ভ্রম সিদ্ধান্ত-টি দর্শন-শাস্ত্রকে নিতান্তই বিপদে ফেলিয়াছে, এমন কি কিয়ৎকালের জন্য তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিতেও ত্রুটি করে নাই।

লক্ষণ-সংকরের উদাহরণ।

মনে কর, কোন প্রকৃতি-তত্ত্ববিৎ—ভারাত্মক এবং ভারহীন—এই দুই প্রকার বস্তুর বিবেচনা কালে ভারাত্মক বস্তু সকলকে নিম্নলিখিত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন;—(১) যাহা আমাদের আপনাদের কর্ত্তৃক তোলনীয় (এই প্রকার বস্তুকেই তিনি প্রকৃত পক্ষে ভারাত্মক বলিয়া ধার্য্য করিলেন); (২) যাহা তোলনীয় বটে কিন্তু আমাদের আপনাদের কর্ত্তৃক নহে: আর মনে কর যে, শেষোক্ত প্রকার বস্তু সকলকে তিনি নির্বিশেষে ভার-হীন নামে সংজ্ঞিত করিলেন। তাহা যদি হয়, তবে হিমালয় ভার হীন, যেহেতু তাহা আমাদের আপনাদের কর্ত্তৃক অতোলনীয়, অথবা—যাহা একই কথা—হিমালয় আমাদের আপনাদের কর্ত্তৃক অতোলনীয় অতএব তাহা স্বরূপতঃ অতোলনীয়। জগতে, স্বরূপতঃ অতোলনীয় কিছুই যে, নাই, তাহা মনে করিও না;—যদিচ তাহা প্রকৃতি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের বড় একটা গ্রাহ্যে আসে না। সৌম মঙ্গল প্রভৃতি বার-সকল স্বরূপতই অতোলনীয়। অতএব ফলে দাঁড়াইতেছে এই—যে, ঐ সকল অবস্তু—যাহাদিগকে আমরা সোম মঙ্গল বুধ প্রভৃতি নাম দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকি—হিমালয় তাহাদের অপেক্ষা একটুও বেশী ভারাত্মক নহে। চিন্তনীয় এবং অচিন্তনীয় এ-দুয়ের মধ্যে দার্শনিক পণ্ডিতেরা যে-প্রকার প্রভেদ অবধারণ করিয়া থাকেন, তাহা ঠিক এইরূপ। প্রকৃতি-বিজ্ঞান যদি এইপ্রকার অদ্ভুত শ্রেণী বিভাগ কার্য্যে সাধারণতঃ রত হইত, তবে তাহা আজ কোথায় থাকিত? দর্শন-শাস্ত্র এখন যেখানে আছে—ঠিক সেইখানে থাকিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আর সমস্ত তত্ত্ব চিন্তার নিয়ম সকলকে বাল্য ক্রীড়ায় পরিণত করিতেছে।

এই সব গোলমালের পশ্চাতে, চিন্তার নিয়ম-সকল তত্ত্বজ্ঞানীদিগের নিকটে এক প্রকার খেলার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা শুদ্ধ কেবল আমাদের আপনাদের অচিন্তনীয়, তাহার সহিত একাত্মক অচিন্তনীয় ব্যাপার-সকলকে একসঙ্গে জড়াইয়া তাঁহারা বলেন এই যে, এমন অনেক বিষয় আছে যাহারা একান্ত-পক্ষেই অভাবনীয়, অথচ এটি আমাদের না ভাবিলেই নয় যে, তাহারা আছে; অর্থাৎ কি না—এ সব তত্ত্বজ্ঞানীদিগের মতে—চিন্তার নিয়মানুসারে যে-বিষয়ের ভাবনা হইতেই পারে না, তাহার অস্তিত্ব আমাদিগকে ভাবিতেই হইবে। তাঁহারা আমাদিগকে এমনি একটি বিষয় ভাবিতে বলেন, যাহা তাঁহারা পরক্ষণেই বলেন যে, তাহা ভাবনার অতীত। এক কথায়, যাহা "ভাবিতে পারা যায় না" বলেন, তাহাই ভাবিতে বলেন। ইহার অর্থ—চিন্তার নিয়ম-সকলকে লইয়া বাল্য-ক্রীড়া—সমস্ত শাস্ত্রটাকে লইয়া কৌতুক-পরিহাস—এ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ইহার একটি দৃষ্টান্ত;—এই একটি নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল যে, আমরা আমাদের আপনাদের সম্বন্ধ-বহির্ভূত কোন কিছুই ভাবিতে পারি না; কিন্তু এই কথাটির ধ্বনি

অভ্রান্ত হইতে না হইতেই আমাদিগকে বলা হইতেছে যে, আমাদের আপনাদের সম্বন্ধবহির্ভূত বস্তু আমাদিগকে ভাবিতেই হইবে এবং তাহা আমরা ভাবিয়া থাকি। ইহার ভিতর অবশ্যই কিছু-না-কিছু গলদ্ আছে। হয় বলো—নিয়ম যাহা নির্দ্ধারিত হইল তাহা নিয়মই নহে, নয় বলো যদি তাহা নিয়মই হইল তবে তাহার বন্ধন ছেদন করিয়া আমরা কোন কিছুই ভাবিতে সমর্থ নহি। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীরা আপনাদের কথার বন্ধনে শক্তাশক্তি-রূপে ধরা-বাঁধা দিতে পারৎপক্ষে স্বীকৃত হ'ন না; আপনাদের কথাকে তাঁহারা আপনারা বড়ই ডরা'ন; আপনাদের কথার সঙ্গে লুকাচুরি খেলিতেই তাঁহারা সবিশেষ তৎপর।

তত্ত্বজ্ঞানীদিগের অসঙ্গতি-দোষ অপ্রতীকার্য্য।

কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন যে, ঐ-যে গোলযোগ বা লক্ষণ-সংকর যাহার কথা এতক্ষণ ধরিয়া বলা হইল, তাহার প্রতীকারের পথ আছে। উহার প্রতীকারের পথ একটিও নাই। তত্ত্বজ্ঞানী বলিতে পারেন যে, "ঐকান্তিক অচিন্তনীয়" এই যে, একটি কথা, ইহার অর্থ শুধু কেবল আমাদের আপনাদের কর্ত্তৃক অচিন্তনীয়, তাহার অধিক আর কিছুই নহে। "ঐকান্তিক অচিন্তনীয়" শব্দের এ যা অর্থ করা হইল—ইহাতে দাঁড়াইতেছে যে, তাহা "ঐকান্তিক অচিন্তনীয়" নয়—তাহা শুধু কেবল আমাদের আপনাদের অচিন্তনীয়; এরূপ বিষয়ের অস্তিত্ব আমরা ভাবিতে না পারিব কেন—স্বচ্ছন্দে আমরা তাহা ভাবিতে পারি। যাহা সত্য-সত্যই ঐকান্তিক অচিন্তনীয়, এক কথায়—যাহা স্ববিরোধী, তাহারই অস্তিত্ব আমরা ভাবিতে পারি না; কিন্তু যাহা স্ববিরোধী নহে তাহার অস্তিত্ব আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে (অর্থাৎ আপনাদের জ্ঞানগোচর বলিয়া) না-ও যদি ভাবিতে পারি, তবুও তাহা আমরা পরোক্ষ-সম্বন্ধে (অর্থাৎ অন্যের জ্ঞান-গোচর বলিয়া) অনায়াসে ভাবিতে পারি। কিন্তু ঐকান্তিক অচিন্তনীয় এবং আমাদের আপনাদের-কর্ত্তৃক অচিন্তনীয় এ দুইটি পৃথক্ লক্ষণাক্রান্ত বিষয়কে এক করিয়া ফেলা কি বৈধ কার্য্য? উভয়ের মধ্যে স্পষ্টই যখন লক্ষণ-ভেদ রহিয়াছে, আর সে লক্ষণ-ভেদ যখন অর্থ-পূর্ণ, তখন সে বাঁধ-টি ছাড়িয়া ফেলিয়া ভাষা এবং ভাবকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিবার অর্থ কি? যাহা আমাদের আপনাদের অচিন্তনীয় হইয়াও অন্যের চিন্তনীয়, তাহা তো চিন্তনীয়ের কোটাতেই স্থান পাইবার উপযুক্ত; কারণ কোন-একটি বস্তু যদি কোন সূত্রে চিন্তনীয় হয় (তাহাকে আমরা অন্যের চিন্তনীয় বলিয়া চিন্তা করিতে পারি—এ সূত্রেও যদি তাহা আমাদের চিন্তনীয় হয়) তবে সেই সূত্রে তাহা চিন্তনীয়ের কোটায় অবশ্যই স্থান পাইতে পারে। ঐকান্তিক অচিন্তনীয়ই প্রকৃতরূপে অচিন্তনীয় এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তাহার আর এক নাম স্ববিরোধী।

চিন্তার নিয়ম কল্পনার নিয়মে পরিণত।

পুনশ্চ "যে বিষয়ের ভাবনা হইতেই পারে না, তাহা ভাবিতেই হইবে" এ কথাটির অসঙ্গতি-দোষ যখন চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেওয়া হয়, তখন তত্ত্বজ্ঞানী যেরূপে স্বপক্ষ-সমর্থন করেন তাহা এই;—তাঁহাকে যখন খুব কসাকসি করিয়া ধরা যায়, তখন তিনি এই বলেন যে, "যাহা ভাবনা করা যায় না" এই যে কথা বলা হইল, এইখানেই ভাবনা-শব্দের অর্থ প্রকৃত পাকই ভাবনা, কিন্তু তাহার পরে এই যে কথাটি বলা হইল যে "তাহা ভাবিতেই হইবে" এখানে ভাবনা শব্দের অর্থ—কল্পনা, অর্থাৎ মনোনেত্রের সমক্ষে ছবি খাড়া করা। তাঁহার এই সমস্তি

বাক্যটি তাঁহার পক্ষের নূতন একটি অবয়ব আমাদের দৃষ্টি-ক্ষেত্রে আনয়ন করিতেছে ; পূর্ব্বে আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, চিন্তার নিয়ম-সকলের নিগূঢ় মর্ম্ম বিবৃত করিয়া দেখাইবার জন্য তিনি আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন. এখন দেখিতেছি—তাহা নহে শুধু কেবল কল্পনার নিয়ম-সকলের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এটি যদি পূর্ব্বাহ্ণে আমাদিগকে বুঝাইয়া বলা হইত, তাহা হইলে কোন বাদানুবাদেরই প্রয়োজন হইত না, তাহা হইলে প্রতিপক্ষের সকল কথাই আমরা নির্ব্বাদে শিরোধার্য্য করি[illegible]। কিন্তু, না আগেতে, না শেষেতে তাহা বুঝাইয়া বলা হয় নাই। মনোবিজ্ঞানী আগা গোড়া বলিয়া আসিতেছেন যে, তিনি কল্পনার নহে কিন্তু বুদ্ধি-বৃত্তির—মনোরথের নহে কিন্তু চিন্তার—নিয়ম-সকল বিবৃত করিতেছেন ; অতএব, হয় তাঁহার সূচনা-পত্র [illegible], নয় [illegible], নয় যাহা তিনি আমাদিগকে দেখাইবেন বলিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে না দেখাইয়া, তিনি আর একটা কিছু—যাহা আমরা দেখিতে চাহি না—তাহাই আমাদিগকে দেখাইতেছেন। ইহা আমাদিগকে শিখাইবার কোন প্রয়োজন নাই যে, যাহা আমাদের কল্পনার অতীত তাহা আমাদের চিন্তার গম্য হইতেও পারে। এই সহজ সত্যটিকে আমরা অখণ্ডনীয়-বোধে নির্ব্বিবাদে শিরোধার্য্য করিতেছি। কিন্তু ইহাঁদের মুখে যখন আমরা শুনি যে, যাহা আমরা আদবেই ভাবিতে পারি না—তাহা আছে ইহা আমরা ভাবিতে পারি, ইহা শুনিবামাত্র আমাদের জ্ঞান স্ববিঘাতের সংক্ষোভে সচকিত হইয়া উঠে। বিশেষ কোন মনোবিজ্ঞানীকে লক্ষ্য করিয়া এ সকল কথা বলা হইতেছে না ; এ-সকল কথা সকল-মনোবিজ্ঞানীর সম্বন্ধেই খাটে ; আমাদের কথার লক্ষ্য সমস্ত তন্ত্রের প্রতি যত—বিশেষ বিশেষ তন্ত্রকারদিগের প্রতি তত নহে। চিন্তনীয় এবং অচিন্তনীয় এ দুয়ের লক্ষণ-সংকর ঘটাইবার অপরাধে কে প্রধানতঃ দায়ী ইহা বলা সুকঠিন।

এ তন্ত্র চিন্তার নিয়ম-সকলকে [illegible] করে না।

এ তন্ত্র চিন্তার নিয়ম সকলকে লইয়া বেশী আড়ম্বর করে না। এ তন্ত্র যাহা মনে ভাবে তাহাই মুখে বলে, এবং যাহা বলে তাহাতেই লাগিয়া থাকে। এ তন্ত্র যাহা ভাবিতে পারা যায় না [illegible] তাহাদিগের দ্বারা [illegible] না বলে। [illegible] মনোবিজ্ঞানে [illegible] কোন [illegible] তাহা [illegible] করে না। এ তন্ত্র [illegible] নিয়ম-সকলকে [illegible] করিয়া প্রতিপন্ন [illegible] বাধ্য হইবার জন্য, যেন তাহাদের [illegible] প্রস্তুত এরূপ কাহারো প্রতিপন্ন [illegible] যে, যাহার [illegible] হইবার জন্যই [illegible]। ইহা এরূপ শিক্ষা দেয় যে বুদ্ধির [illegible] মনুষ্য ভাবিতে পারে, মনোবিজ্ঞানের ন্যায় এরূপ শিক্ষা দেয় না যে, বুদ্ধির মূলতত্ত্বের বিরুদ্ধেও মনুষ্য ভাবিতে পারে এবং ভাবে। এ তন্ত্রের প্রতিজ্ঞাই এই যে, যাহা [illegible] তাহাতেই আবদ্ধ থাকিবে।

এ তন্ত্র বাদীদিগের গোড়াকার সূত্র-সকলকে সংক্ষিপ্ত করিয়া আনে।

আর-আর তন্ত্র-সকল অনেক বিষয়েই পরস্পর পরস্পরকে খণ্ডন করে। আমাদের এইটি ধারণা যে, বর্ত্তমান তন্ত্র সকল-বিষয়েই অখণ্ডনীয়। এ তন্ত্রের মধ্যে একটি পক্ষেই যদি খণ্ডন-যোগ্য কিছু থাকে, তবে সে-টি এই তন্ত্রের মূল সিদ্ধান্ত। একটি-মাত্র লক্ষ্য-স্থানের প্রতি সমস্ত প্রতিবাদের

পর-সন্ধান করিতে পারা—তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে কম সুবিধার কথা নহে। এ তন্ত্র আপনার আর আর সিদ্ধান্ত-গুলিকেও যেমন—মূল সিদ্ধান্তটিকেও তেমনি—অখণ্ডনীয় বলিয়া জানে; কিন্তু ইহার প্রতি যদি-বা কাহারো কোন-প্রকার সন্দেহ থাকে, তথাপি এ-বিষয়ে আর কাহারো সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, ঐ মূল সিদ্ধান্তটিই এক যা কেবল বিবাদ-স্থল। এই জন্য এ তন্ত্র—দার্শনিক বাদানুবাদের মূল-সূত্র সকলকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছে বলিয়া—তাহাদিগকে একেবারেই উন্মূলিত না করুক্ অতীব অল্পের মধ্যে সংকুচিত করিয়াছে বলিয়া—বিনীত-ভাবে আপনাকে শ্লাঘান্বিত মনে করে।

উপক্রমণিকার উপসংহার।

বর্ত্তমান তন্ত্র কেমন করিয়া মূলে (অর্থাৎ নিতান্ত গোড়ার কথায়) পৌঁছিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহার বিবরণ প্রদর্শন করিয়া এই উপক্রমণিকা সাঙ্গ করা যাইতেছে। কারণ, মূল কথাটিতে কেমন করিয়া পৌঁছানো হইয়াছে—এ-টি বুঝিতে পারিলেই মূল-কথাটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। ফলে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তি ঐটি যতক্ষণ না বুঝিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ হয় তো মূল-কথাটি তাঁহার নিকট যদৃচ্ছা-সম্ভূত বলিয়া প্রতিভাত হইবে, হয় তো তাঁহার মনে এইরূপ একটা ধোঁকা থাকিয়া যাইবে যে, মূল কথাটি যথোক্ত-বিধ না হইয়া অন্য-বিধ হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু কেমন করিয়া ঐ মূল-কথাটিতে পৌঁছানো হইয়াছে, ইহা যখন তিনি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইবেন, তখন তাঁহার সমস্ত সংশয় তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইয়া যাইবে; যখন তিনি দেখিবেন যে, গোড়ার কথা তদ্ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

মূলে উত্তীর্ণ হইবার পদ্ধতি।

পূর্ব্বে যেমন বলা হইয়াছে—জ্ঞানতত্ত্বই এ দর্শন-তন্ত্রের প্রথম খণ্ড; অর্থাৎ প্রথমেই উহাকে জ্ঞানতত্ত্বে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার চরম সীমায় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাতে লাগিয়া থাকিতে হইবে। এই খণ্ডের যেটি আদ্যন্ত-ব্যাপী সর্ব্বময় প্রশ্ন, সেটি এই যে, জ্ঞান কি? কিন্তু এ প্রশ্নটি, ইহার বর্ত্তমান আকারে, অতিশয় ভ্রান্তিজনক, দুরায়ত্ত, এবং দুর্ব্বোধ্য। আমরা উহাকে ধরিতে ছুঁতে পাই না। কোথায় যে উহার মুষ্টি-স্থান তাহার ঠিকানা পাই না। উহাকে ছোটো বা বড় কোন-প্রকার ব্যক্ত অবয়ব নাই। এই সূতার পুঁটুলির আরম্ভ স্থান কোথায়—খাই' কোথায়? উহা কি সূতার পুঁটুলি, না পাথরের গোলা? কারণ, যদি পাথরের গোলা হয়, তবে ইহার জটা ছাড়াইতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। কামানের গোলার জটা ছাড়ানো মনুষ্যের অঙ্গুলীর কর্ম্ম নহে। তা নয়—ইহা সূতার-ই পুঁটুলি; তবে কি না—ইহার খাই খুঁজিয়া পাওয়া সুকঠিন; তাহা যে-পর্য্যন্ত না খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে সে-পর্য্যন্ত পুঁটুলির জটা ছাড়ানো অসাধ্য ব্যাপার। আর কিছু হউক্ আর না হউক, এইটি বিশেষ করিয়া দেখা উচিত যে, ঐ পুঁটুলির উপর আর যেন পুঁটুলি জড়ানো না হয়;—এ বিষয়টিতে লোকের মনোযোগ অতি অল্প। ইহা আমরা পূর্ব্বে একস্থানে ইঙ্গিত করিয়াছি। অলঙ্কার ছাড়িয়া সাদা কথায়;—যদিচ আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে, জ্ঞান কি—ইহাই তত্ত্বজ্ঞানের গোড়ার কথা, তথাপি, জ্ঞান কি—এই অস্পষ্ট, গোল-মেলে, এবং ব্যাপক প্রশ্নের মধ্যে গোড়ার কথা কি, তাহা খুঁজিয়া পাইতে এখনো [illegible] আছে। জ্ঞান কি—[illegible]

করিয়া বিভাগ করা কঠিন নহে; পরন্তু সেই খণ্ডাংশ-গুলির মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত-পক্ষে মূলাংশ—অর্থাৎ গোড়ার কথা—তাহাই খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

প্লেটো গোড়ার কথা খুঁজিয়া পান নাই।

প্লেটোর সক্রেটিস্ ঐ কাঠিন্যে আটক পড়িয়া গিয়াছিলেন। উহার মধ্যে কোন্ খানটা যে কঠিন, তাহা সক্রেটিস্ স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহার মীমাংসা যে কিরূপে হইতে পারে তাহা তিনি দেখিতে পান নাই, অন্ততঃ তাহা তিনি কোথাও প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। তিনি প্রশ্ন করিলেন "জ্ঞান কি?" শিষ্য উত্তর করিলেন "জ্যামিতি এবং আর আর বিষয় যাহা আমরা এতক্ষণ ধরিয়া বলা-কহা করিতেছি, তাহাই জ্ঞান।" ইহার উত্তরে সক্রেটিস্ যাহা বলিলেন তাহা দিব্য লগ্ন-সঙ্গত ও ঠিক্ সক্রেটিসেরই মতো—যদিচ তাহা ফলদায়ক নহে। সক্রেটিস্ বলিলেন "খুব বদান্যতা-সহকারে, খুব মুক্ত-হস্তে, বলিতে কি—রাজ-রাজড়ার মতো, তুমি উত্তর প্রদান করিলে। শুদ্ধ কেবল একটি বস্তু আমি তোমার নিকট যাচ্ঞা করিলাম—তুমি কত না বস্তু আমাকে প্রদান করিলে। আর, আমার মতো একজন বুড়া মূর্খের প্রতি তোমার এই যে উদার আচরণ, এ-কেই আমি বলি প্রকৃত মহত্ত্ব।" এই মিষ্ট ভৎসনায় শিষ্য কিছু অপ্রতিভ হইলেন; তখন সক্রেটিস্ আপনার মর্ম্ম কথাটি খুলিয়া বলিলেন। তিনি বলিলেন "আমার মর্ম্মটি যে কি তাহা তুমি ধরিতে পার নাই; জ্ঞানের বিষয় কি কি তাহা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নাই, জ্ঞান স্বয়ং কি—ইহাই কেবল আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি।" এই ব্যাখ্যাটি যদিও ঠিক্ লক্ষ্য-স্থানটির প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিতেছে—তথাপি ইহাতে বিশেষ কোন ফল দর্শিতেছে না; কারণ, এদিকে যখন—গুরুশিষ্যে মিলিয়া জিজ্ঞাস্য প্রশ্নটির যত কাছ ঘেঁসিয়া পারেন (খুব যে বেশী কাছ ঘেঁসিয়া তাহা নহে) তর্ক বিতর্ক চালাইতেছেন, ওদিকে তখন—প্রশ্নটি মাঝে-হইতে অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় পৃথিবী-গর্ভে তলাইয়া গিয়াছে; পুনর্ব্বার যদিও তাহা সময়ে সময়ে প্লেটোর প্রবন্ধ-মধ্যে দেখা দিতে উঠিয়াছে, কিন্তু সে কেবল ক্ষণকালের জন্য—অল্প একটু ইসারায় দেখা দিয়া তৎক্ষণাৎ অমনি পাতালে পুনঃপ্রবেশ করিয়াছে। প্লেটো তত্ত্বজ্ঞানের গোড়ার কথা খুঁজিয়া পান নাই—অন্ততঃ কোথাও তাহার প্রকাশ নাই।

গোড়ার কথার অনুসন্ধান।

অতএব জ্ঞান কি—এ প্রশ্নের মীমাংসা আমাদের আপনাদের দ্বারা কি পর্য্যন্ত হইতে পারে তাহা একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যা'ক্। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি—ঐ প্রশ্নটিরই মীমাংসা এই সংহিতার প্রথম খণ্ডের মুখ্য কার্য্য। তবে কেন উহাতে আমরা একেবারেই কোমর বাঁধিয়া প্রবৃত্ত না হই। জিজ্ঞাসু ব্যক্তি মনে করিতে পারেন যে, যদি উহা অপেক্ষা সহজ প্রশ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তবে তাহাকে দিয়াই গ্রন্থের গোড়া পত্তন করা শ্রেয়—ইহাতে আর ভুল নাই, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা খুঁজিয়া পাওয়া না যাইতেছে, ততক্ষণ যাহা আমাদের হস্তাভ্যন্তরে আছে তাহাকে দিয়াই আপাততঃ কার্য্য চালাইলে ভাল হয়। কিন্তু তাহা যদি করা যায় তবে তত্ত্ব-জ্ঞান একটি যদৃচ্ছা-মূলক কাণ্ড হইয়া উঠে; তাহা এমনি একটি তন্ত্র হইয়া উঠে যাহার মূল-পত্তন অখণ্ডনীয় নিয়মের বশবর্ত্তী নহে—কেবল তত্ত্বালোচকের সুবিধা এবং স্বেচ্ছার অনুবর্ত্তী এরূপ ঘটনা তত্ত্বজ্ঞানের যাথার্থ্য এবং মাহাত্ম্যের পক্ষে নিতান্তই হানিজনক। উহা

তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ-সকলের বিশেষত্ব নষ্ট করে—তাহাদের মর্য্যাদা অপহরণ করে—তাহাদের বাহ্য অবয়ব হইতে তাহাদের প্রাণকে বিযুক্ত করে। অতএব জ্ঞান কি—এ প্রশ্নকে আপাততঃ ঠেলিয়া রাখিবার মুখ্য কারণ তাহার জটিলতা নহে; আর, নূতন একটা প্রশ্ন খুঁজিয়া আনিবার জন্য আমরা যে ব্যগ্র হইতেছি, তাহার মুখ্য কারণ তাহার সহজ-গম্যতা নহে। অবশ্য, পূর্ব্বোক্ত অপেক্ষাকৃত জটিল, এবং শেষোক্ত অপেক্ষাকৃত সহজ হইবারই কথা। কিন্তু সে বিবেচনা গৌণ কল্প; সে বিবেচনায় আমরা পূর্ব্ব-প্রশ্নটিকে ঠেলিয়া রাখিতে এবং নূতন একটা প্রশ্নের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে অগত্যা বাধ্য নহি। স্বেচ্ছা এবং অভিরুচির গতিকে নহে কিন্তু, অগত্যা, যদি না আমরা ঐরূপ করিতে বাধ্য হই, তবে আমাদের কার্য্য-পদ্ধতি যদৃচ্ছা-মূলক হইবে। কিন্তু যদি আমাদের এই তত্ত্বজ্ঞানকে যথার্থ সত্য বলিয়া প্রতিপাদন এবং গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহাকে ওরূপ হইতে-দেওয়া হইতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞান-ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিই এমন কোন বস্তুকে সত্য বলিতে অধিকারী নহে, যাহাকে সত্য বলিয়া না-ভাবিলেও না-ভাবা যাইতে পারে। তত্ত্বজ্ঞান-ক্ষেত্রে কেহই এমন একটিও পদ্ধতি অবলম্বন করিতে অধিকারী নহে—যাহার পরিবর্ত্তে আর কোন পদ্ধতি অবলম্বন করিলেও করা যাইতে পারে।

জ্ঞান কি এইটিই গোড়ার প্রশ্ন হইতে না পারে কেন?

কেন তবে আমরা—জ্ঞান কি—এই প্রশ্ন একেবারেই হস্তে লইয়া তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছি না? এই তাহার যথেষ্ট কারণ যে, প্রশ্নটি বোধগম্য নহে। ঐ প্রশ্নটি এখন যে আকারে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাতে তাহার অতীব অস্পষ্ট ভিন্ন আর কোন প্রকার অর্থ তাহাতে যুক্তিতে আরূঢ় হইতে পারে না। উহা দ্ব্যর্থ-লক্ষণাক্রান্ত; উহার অর্থ একাধিক। এই জন্য উহার বর্ত্তমান আকারে উহা কাহারো বোধ-গম্য হইবার নহে। কাজেই উহা হইতে আমাদিগকে অগত্যা ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইতেছে; কারণ, যাহা বুঝা যায় না—তাহা লইয়া কিছু-আর আন্দোলন চলিতে পারে না। অতএব ঐ প্রশ্নটিকে আপাততঃ পরিত্যাগ করা আমাদের স্বেচ্ছার কার্য্য নহে—তাহা নিতান্তই অনিবার্য্য। তেমনি আবার, তাহার স্থলে নূতন একটি প্রশ্নের অবতারণা শুধু-যে-কেবল আমাদের সুবিধার জন্য করা—তাহা নহে; তাহা না করিলে নয় বলিয়াই তাহা করা। তাহা শুধু-যে কেবল আমাদের প্রার্থনীয় তাহা নহে, তাহা একেবারেই অলঙ্ঘনীয়। দর্শন-শাস্ত্রকে ফলোপধায়ী হইতে হইলে তাহার যেমনটি হওয়া চাই, আমাদের আলোচনা-পদ্ধতি ঠিক সেইরূপ; তাহার কোন স্থানে স্বেচ্ছা-মূলক কিছুই নাই—তাহা আদ্যোপান্ত অখণ্ডনীয় নিয়মের বশবর্ত্তী।

ঐ প্রশ্নের মধ্যে দুইটি প্রশ্ন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

যে প্রশ্ন আমরা অন্বেষণ করিতেছি তাহা—জ্ঞান কি—এই প্রশ্নের সহিত অবশ্যই কোন-না কোন সম্পর্ক-সূত্রে আবদ্ধ; কারণ, অস্পষ্টই হউক আর যাহাই হউক—জ্ঞান কি—ইহাই আমাদের প্রথম খণ্ডের মূল প্রশ্ন। নূতন প্রশ্নটি নূতন কিছুই নহে, তাহা ঐ মূল প্রশ্নটিরই—প্রদর্শনের উপযোগী সুস্পষ্ট এবং বোধ-গম্য মূর্ত্ত্যন্তর। স্থির-চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, জ্ঞান কি—ইহার অর্থ দুইরূপ হইতে পারে। প্রথম অর্থ এই যে, নানা জাতীয় [illegible] জ্ঞানে পরস্পর হইতে বিভিন্ন [illegible] জ্ঞান কি? সহজ [illegible]—জ্ঞান কত প্রকার। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, [illegible]

প্রকার জ্ঞানই হউক না কেন—সকল জ্ঞানই যে অংশে জ্ঞান বই আর কিছুই নহে, সে অংশে, জ্ঞান কি? সহজ কথায়,—এমন একটি অপরিবর্ত্তনীয় অবয়ব—অপরিবর্ত্তনীয় লক্ষণ—বা অপরিবর্ত্তনীয় অংশ—কি আছে, যাহা সাধারণতঃ সকল জ্ঞানেই বর্ত্তমান? জ্ঞান হইতে জ্ঞানান্তরের প্রভেদ এখানে ভুলেই ধর্ত্তব্য নহে।

ঐ দুই প্রশ্নের কোনটি প্রাসঙ্গিক।

জ্ঞান কি—এই দুর্ব্বোধ্য প্রশ্নটি নিম্ন-লিখিত দুইটি সহজ-বোধ্য প্রশ্নে বিভক্ত হইল; প্রথম, জ্ঞান কত প্রকার? দ্বিতীয়, সকল জাতীয় জ্ঞানের মধ্যে এক অভিন্ন অবয়ব কি? এ তো হইল; এখন দেখিতে হইবে—ঐ দুইটি প্রশ্নের মধ্যে কোনটি আমাদের এখনকার প্রশ্ন—কোনটি জ্ঞান-তত্ত্বের নিকট-তম প্রশ্ন? হয় এ-টি—নয় ও টি—দুয়ের একটি-না-একটি তাহাতে আর ভুল নাই; কেননা তৃতীয় কোন প্রশ্নের সম্ভাবনা নাই। কোনটি তবে আমাদের এখানকার প্রকৃত প্রশ্ন? ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, সক্রেটিসের শিষ্য সহসা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, প্রথমটিই তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রকৃত প্রশ্ন। সক্রেটিস্ অচিরে তাঁহার শিষ্যের ভুল ভাঙিয়া দিলেন; কারণ, তত্ত্বজ্ঞানের নিকট আমরা কিছু-আর এ উপদেশের প্রার্থী নহি যে, জ্ঞান—গণিত ইতিহাস ব্যাকরণ প্রভৃতি নানা-শাখায় বি-ভক্ত। দ্বিতীয় প্রশ্নটিই তবে তত্ত্বজ্ঞানের প্র-কৃত প্রশ্ন—যদিচ সক্রেটিস সে বিষয়ের কোন আভাস আমাদিগকে প্রদর্শন করেন নাই। এইটিই তত্ত্ব-জ্ঞানের মূলতম প্রশ্ন—ইহার মূলে আর কিছুই নাই। এই প্রশ্নের উত্তর তত্ত্বজ্ঞানের একমাত্র অদ্বিতীয় উত্থান-দ্বার।

তত্ত্বজ্ঞানের একটি উত্থান-দ্বার আছে ইহার প্রমাণ এই যে, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে।

ইহার পূর্ব্বে আর একটি প্রশ্ন উঠিতে হইতে পারে—সেটি এই;—আমাদের সমস্ত জ্ঞানের একমাত্র অদ্বিতীয় লক্ষণ—সাধারণ মধ্য-ভূমি—অটল সংগ্রহ-স্থান বাস্তবিক কিছু আছে কি? আমাদের অনুসন্ধানের ফল কা-র্যতঃ কিরূপ দাঁড়ায়, তাহারই উপর এ প্রশ্নের মীমাংসা নির্ভর করিতেছে। যদি ওরূপ কোন সাধারণ মধ্য-ভূমি না থাকে, কিম্বা যদি কোথাও তাহা খুঁজিয়া পাওয়া না যায়, তবে তত্ত্বজ্ঞানের অস্তিত্বই অসম্ভব; কিন্তু যদি ঐরূপ একটি কেন্দ্র বা সাধারণ লক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব না হয় এবং তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তবে তত্ত্বজ্ঞান নির্ব্বিঘ্নে বর্ত্তিয়া থাকিতে পারে, এবং তাহার মূল প্রশ্নের উত্তর হইতে যতকিছু ফল দোহন করিবার আছে তাহা দোহন করিয়া আপনার ভাণ্ডার যথেচ্ছা পূরণ করিতে পারে। জ্ঞানের ঐরূপ একটি কেন্দ্রস্থান আছে ইহার প্রমাণ এই যে, ঐরূপ একটি কেন্দ্রস্থান খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে।

জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী ধর্ম্মই তত্ত্বজ্ঞানের উত্থান দ্বার।

আমাদের সকল জ্ঞানেরই অন্তর্নিহিত সাধারণ কেন্দ্র, সাধারণ লক্ষণ, বা সাধারণ অবয়ব অবশ্য এইরূপ একটি মুখ্য উপাদান—যাহা জ্ঞান-মাত্রেরই পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। অথবা যাহা একই কথা—তাহা এইরূপ একটি মুখ্য উপাদান যে, যে-কোন জ্ঞানই হউক না কেন—সে জ্ঞান হইতে সে উপাদানটি অপহৃত হইলেই সে জ্ঞানের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি অলঙ্ঘনীয়, এবং যে পর্য্যন্ত না সেই অপহৃত উপাদানটি তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার পুনরুদ্দীপন একান্তই অস-ম্ভব। তত্ত্বজ্ঞানের মূল প্রশ্নের উত্তর-স্বরূপ ঐ-যে মূল-উপাদান—যাহা আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তাহাকে ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত (অর্থাৎ একান্ত অবশ্য-ম্ভাবী) হইতেই হইবে, কেননা সেরূপ না

কুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন। এই সমস্ত ব্রাহ্মণ অযাজ্য-যাজন-দোষে পৈতৃক ভূমিতে আর বসবাস করিতে পারেন নাই। সেই সূত্রে তাঁহাদের গৌড়ে বাস। কালক্রমে ইহাঁদের বিস্তর সন্তান সন্ততি হইয়া উঠে। এই আদিশূরের সম্ভবত ৩০০ শত বৎসর পরে মহারাজ বল্লাল সেন ১০১৯ শকাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি কান্যকুব্জাগত ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান সন্ততিদিগকে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উঁহাদের কুলপরম্পরাগত বিদ্যা বিনয়াদি সদ্গুণ অনুসারে কৌলীন্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। শ্রেণীবিভাগের মূল দেশভেদে বসবাস। অর্থাৎ যাঁহারা রাঢ় দেশে বাস করিয়া ছিলেন তাঁহারা রাঢ়ীয় এবং যাঁহারা বরেন্দ্র ভূমিতে বাস করিয়াছিলেন তাঁহারা বারেন্দ্র হইলেন। ফলত রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এক পিতারই পুত্র। এই শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে একটু মতভেদও আছে। অনেকে বলেন ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণ অযাজ্য-যাজন-দোষে পৈতৃক ভূমিতে বসবাস করিতে না পারিয়া গৌড়ে অবস্থিতি ও এই স্থানেই বিবাহাদি করেন। সেই সমস্ত বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানেরা রাঢ়দেশে বাস নিবন্ধন রাঢ়ীয় হন। আর ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের পৈতৃক ভূমি কান্যকুব্জে যে সমস্ত সন্তান সন্ততি ছিল কালক্রমে বরেন্দ্র ভূমিতে আসিয়া বাস করায় তাঁহারাই বারেন্দ্র হন। যাহাই হউক এই বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও উহাঁরা যে একই পিতার সন্তান তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ব্যতীত আরও দুই শ্রেণী ব্রাহ্মণ আছেন। ইহাঁরা বৈদিক ও সপ্তশতী। বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে যখন দাক্ষিণাত্যের চোল বংশীয় কোন রাজা গৌড়দেশ জয় করিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তাঁহার সহিত কতকগুলি বৈদিক ব্রাহ্মণ এদেশে আসিয়া ছিলেন। আর কতকগুলি পশ্চিম দেশ হইতে আইসেন। এই জন্য ইহাঁদের মধ্যে দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য এই দুই বিভাগ।

উপরে যাহা বলিলাম তাহাতে ইহাই প্রদর্শিত হইল যে শাস্ত্রে শ্রেণীবিভাগের কোন ব্যবস্থা নাই। ইহা মহারাজ বল্লাল সেনের ব্যবস্থাপিত। শাস্ত্রে যখন শ্রেণীবিভাগের কথা নাই তখন পরস্পারের মধ্যে আদান প্রদান কোনও মতে দোষাবহ হইতে পারে না। কারণ সংহিতাই হিন্দুসমাজ শাসন করিয়া আসিতেছে। সেই সংহিতায় আদান প্রদান স্থলে শ্রেণীগত অবান্তর বিভাগের কোন কথা বলে না। এখন বক্তব্য এই হিন্দুসমাজের শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত না বল্লালের মর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত? শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষায় একটী বিশেষ সুবিধা আছে। শাস্ত্রানুসারে কেবল বঙ্গদেশের নয় ভারতবর্ষের যেখানে যত ব্রাহ্মণ আছে সকলেরই সহিত একটা সম্বন্ধ বন্ধন হইতে পারে। কিন্তু বল্লালের স্থান অতি সঙ্কীর্ণ। কেবল বঙ্গদেশ। তন্মধ্যেও আবার সকল ব্রাহ্মণ সকলের পক্ষে নহেন। এইরূপে ক্ষেত্রপ্রশস্ত করা ব্যতীত ইহা দ্বারা আরও একটু উপকার হয়। হিন্দুসমাজ বহুকাল ধরিয়া অতি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন। বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত এই যে বহুকাল ধরিয়া একই দেশের একই বংশের রক্ত-সংশ্রবে বংশ ক্রমশঃ হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে। এজন্য বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন বংশে আদান প্রদান আবশ্যক। কিন্তু যদি ব্রাহ্মণাদির অবান্তর শ্রেণীবিভাগ ভাঙ্গিয়া সকল দেশের সকল ব্রাহ্মণাদির মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান চলে তাহা হইলে এই

বঙ্গদেশীয়দিগের বংশ আবার যে বলিষ্ঠ হইয়া পৃথিবীর বীর জাতির সহিত সমকক্ষতা করিতে পারিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখন শিক্ষিতদিগের মধ্যে অনেকেরই বলবীর্য্য ও স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু যত দিন না বল্লালকৃত সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে বদ্ধ বৈবাহিক দোষটুকু উন্মূলিত হইতেছে তাবৎ তাঁহারা বলবীর্য লাভের নিমিত্ত যা কিছু করুন কোনও মতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

এ বিষয়ে আরও একটু বক্তব্য আছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মে মর্ম্মে সর্ব্বত্র সাম্যের কথা পাওয়া যায়। এক সময় সমাজবন্ধন ও সামাজিক উন্নতি সাধনের নিমিত্ত বর্ণবিভাগের বিশেষ আবশ্যকতা হইয়াছিল। এবং ইহার দ্বারাই সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। কিন্তু এই বর্ণবিভাগ থাকিলেও বিবাহের কোন ব্যাঘাত ছিল না এবং এই বিবাহবন্ধনে বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে একটা সাম্য রক্ষিত হইত। কালসহকারে এই বিবাহ রহিত হইয়া যায়। এখন হিন্দুসমাজের যেরূপ ভাবগতি তদ্দৃষ্টে ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যায় যে বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে বিবাহের পুনঃপ্রবর্ত্তনার এখনও সময় আইসে নাই, কিন্তু বর্ণবিভাগের মধ্যে এই অবান্তর শ্রেণীবিভাগ ভাঙ্গিবার ঠিক সময় হইয়াছে। অনেকেই বুঝিয়াছেন ইহারই দ্বারা সমাজের অনেক অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। অতএব যাহাতে বর্ণের মধ্যে এই অবান্তর বিভাগ নষ্ট হয় তদ্বিষয়ে সহৃদয় মাত্রেরই একটু চেষ্টাবান হওয়া আবশ্যক। এই অবান্তর বিভাগের জন্য বর্ণের মধ্যে একটী বৈরবীজ বহুকাল হইতে পুষ্ট হইয়া আসিতেছে। ইহা দ্বারা কেবল যে সমাজের অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা নহে কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত হইতেছে। কারণ এই ধর্ম্মের মূল মন্ত্র সর্ব্বত্র সাম্য। এস্থলে সংস্কারকদিগকে একটা কথা বলাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সমাজসংস্কার একটা স্বতন্ত্র কার্য্য নয়। ইহার জন্য আড়ম্বর ও উপদেশ করিয়া বেড়াইলে কখনও সমাজের কোনও উপকার হইবে না। অগ্রে ধর্ম্মরক্ষায় যত্ন কর। সমাজ-সংস্কার ইহারই আনুষঙ্গিক ফল। তদ্ব্যতীত ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে সমাজ-সংস্কারের নামে এমন সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে যাহার সহিত ধর্ম্মের কোন কালে কোন সম্বন্ধ নাই। সমাজের বক্ষে একটা উপদ্রব আনয়ন ব্যতীত তাহার ফল আর কিছুই নহে। ফলতঃ ভবিষ্যতে যদি কোনরূপ সংস্কার আবশ্যক হয় এই বর্ত্তমান [illegible] ঘোর প্রতিবন্ধক হইবে। অতএব তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

এক্ষণে আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি হিন্দুসমাজের স্থিতিশীলতা-দোষ অপনীত হইবার উপক্রম হইয়াছে। রাঢ়ীয় শ্রেণী সপ্তশতীদিগের সহিত মিশিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্ব্বাঞ্চলের কোন কোন সম্ভ্রান্ত লোক কৌলীন্যের উচ্ছেদ সাধনে যত্ন করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত সম্প্রতি আরও একটী শুভাবহ ব্যাপার ঘটিয়াছে। ইহা শ্রেণীভঙ্গ। ইহার পথ-প্রদর্শক শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ রাজা আদিশূরের যজ্ঞসাধনার্থ গৌড়দেশে আইসেন তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ কবি ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্য বংশের প্রবর্ত্তক। শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ ভট্টনারায়ণের অধস্তন ষট্ত্রিংশ পুরুষ। ইনি রাঢ়ীয় শ্রেণী। গত ৩০ শ্রাবণে ইহাঁর পৌত্রী শ্রীমতী প্রতিভা দেবীর সহিত কৃষ্ণনগরের একজন জমিদার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরীর বিবাহ হইয়াছে। ইনি বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ। কিছু দিন হইল

ইনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এ, উপাধি লাভ করিয়া স্বদেশে আসিয়াছেন। পাত্রী সুশিক্ষিতা পাত্র উচ্চ-শিক্ষা-প্রাপ্ত। এই মিলন যে বহুকল্যাণকর হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের বিদ্যা বুদ্ধি অর্থ ও জীবন দিয়া এ দেশের সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ইনি সমাজতত্ত্বজ্ঞ বিচক্ষণ ও দেশকালদর্শী। সমাজসংস্কার ইহাঁর ধর্ম্মরক্ষারই আনুষঙ্গিক ফল। ধর্ম্মরক্ষা করিতে গিয়া যতটুকু সংস্কার আবশ্যক তদ্বিষয়ে ইহাঁর বিশেষ দৃষ্টি আছে। ইনিই মহারাজ বল্লালের ৮০০ শত বৎসর পরে এই শ্রেণীবিভাগ ভাঙ্গিবার সূত্রপাত করিলেন। এখন বঙ্গদেশে বাস্তবিক যাহা অভাব এই মহাত্মা হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে তাহা অনুভব করিয়াছেন এবং নিজেই তৎসংস্কারের পথ-প্রদর্শন করিলেন। রাঢ় ও বরেন্দ্র ভূমির ভ্রাতারা সমস্ত ব্যবধান দূর করিয়া এত দিনের পর একহৃদয় একপ্রাণ হইল, এবং বহু দিনের পর কবি ভট্টনারায়ণের এক বংশধর হইতে এই বিবাদ সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া গেল।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্যের-
ব্যাখ্যানমূলক পদ্য।

বিংশ ব্যাখ্যান।

ঈশ্বর মহান্, সুখের নিদান, তিনি বিনা যত আর।
বিপুল ভবন, যশোমান ধন, নহে নহে সুখ সার॥

যাবে যদি জীব। অমৃতের ধাম।
সংসার তরিতে যদি তব কাম॥
তাঁহার চরণ লও হে শরণ।
তাঁহারে অর্পণ করহ জীবন॥
উজ্জ্বল করিয়া জ্ঞানের নয়ন।
তাঁহারে হৃদয়ে করহ দর্শন॥

দেখ শু দেশে দেশে গ্রহগণ।
বিতরিছে কর সুধাংশু তপন॥
নদ নদী সব হয় প্রবাহিত।
বরষার বারি করে নানা হিত॥
বসুন্ধরা ফল ফুলে সুশোভন।
তাঁহার জগৎ সুন্দর কেমন॥
জগতে যাঁহার মহিমা প্রচার।
জীবে যাঁর দয়া করুণা অপার॥
তিনিই তোমার হৃদয়ের ধন।
তাঁর কাছে যেতে বলেন বচন॥
তিনিই ঈশ্বর, তিনিই মহান্।
মুক্তিদাতা তিনি সুখের নিদান॥
তাঁহারে জানিতে, তাঁহারে সাধিতে,
তাঁর সুধা নাম প্রচার করিতে,
হয় নাই তব জনম এ ভবে?
তাঁর প্রতি তুমি উদাসীন রবে?
যে কিছু তোমার—সব যাঁর দান,
তাঁহারে করিবে তুমি প্রত্যাখ্যান?
তিনি স্বাধীনতা দিলেন তোমারে।
আপন ইচ্ছায় ভজিবে তাঁহারে॥
সেই তাঁর ইচ্ছা করহ পালন।
প্রেমে তাঁর পথে কররে গমন॥
প্রেমে তাঁর গলি কর কায তাঁর।
এই তব কায—নাহি অন্য আর॥
কেন ক্ষুদ্র ভাবে হইয়া মগন,
দিবানিশি অশ্রু করিছ বর্ষণ?
ভবের ভাণ্ডারে হেন দ্রব্য নাই।
আত্মার পিপাসা যাতে মিটে ভাই॥
অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র এ সংসার।
দিতে পারে সুখ গভীর অপার?
আত্মা তাই দেখ শুধু তাঁরে চায়।
যশোমান ধনে তৃপ্তি নাহি পায়॥
মরীচিকা সম সুখের ছলনে,
কেন যাও তবে বিষয় পিছনে?
এক বিন্দু জল তাহে না মিলিবে।
আত্মার পিপাসা যাহে নিবারিবে॥
বিষয় অর্জ্জন, বিষয় রক্ষণ,
বিষয় বর্দ্ধন, বিষয় চিন্তন,

বিষয় সম্পদ, আত্মীয় স্বজনেরে
নাহি দেয় সুখ একদিন তরে ॥
ক্ষণে হর্ষ শোক ক্ষণে [illegible] আশা।
আশায় নিরাশা আবার পিপাসা
ক্ষণে প্রলোভন ধর্ম্ম কাড়ি লয়।
দুঃখের দুর্দ্দিন অন্ধকার ময় ॥
এইত ক্ষণিক সংসারের হয়।
শান্তির নিবাস কভু ইহা নয় ॥
মূঢ় মোরা তাঁর পথে নাহি যাই।
প্রবৃত্তির পথে আগে মোরা ধাই ॥
আগে সংসারের পথে প্রবেশিয়া।
গহন মাঝারে পথ হারাইয়া ॥
কণ্টক ফুটিয়া হয়ে জ্বালাতন।
তবে ফিরে যেতে করি আকিঞ্চন ॥
পথ নাহি পাই, দেখি তারিবার।
তিনিই কাণ্ডারী, নাহি কেহ আর ॥
সৌভাগ্য তাহার, এ হেন সময়ে।
ডাকে দয়াময়ে কাতর হৃদয়ে ॥
বলে; "কোথা নাথ! অনাথ শরণ!
অগতির গতি, পতিত পাবন।
বিপথে পড়েছি কর হে উদ্ধার।
লয়ে যাও এবে সুপথে তোমার ॥
অঙ্গ হ'ল ক্ষত সংসারের ঘায়।
জুড়াও লইয়া চরণ-ছায়ায় ॥
আসিয়াছিলাম তৃষ্ণা নিবারিতে।
না জানিয়া ভ্রমে গোষ্পদ-বারিতে ॥
ক্ষাম-কণ্ঠ এবে কাতর পরাণ।
অমৃতের বিন্দু তুমি কর দান ॥"
যে কাতরে তাঁরে ডাকে এক চিতে।
সংসার সাগরে তাহারে তারিতে ॥
কৃপা-হস্ত দিয়া তারে তুলি ল'ন!
কাটি দেন তার মায়ার বন্ধন ॥
যে চায় তাঁহারে অমৃতের বিন্দু।
দয়াময় তাহারে দেন [illegible]-সিন্ধু ॥
পরীক্ষা করিয়া দেখহ সংসার।
[illegible] [illegible] বহে এ আগার ॥
কয় দিন হেরে [illegible] [illegible] [illegible]
সুখের পিছনে [illegible] [illegible] ॥

[illegible] [illegible] আশা [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ছাই পড়ে কতবার ॥
হেথা শোক তাপ কতই যন্ত্রণা।
কত অত্যাচার কতই লাঞ্ছনা ॥
বন্ধু বলি যারে বুকে দিই ঠাঁই।
কভু তার কাছে শেলাঘাত পাই ॥
সংসার নহে ত সুখের আলয়।
হেন করিলেন—যিনি দয়াময় ॥
অবিচ্ছেদ সুখ পাইলে হেথায়।
পাছে জীব আর তাঁরে নাহি চায় ॥
করেন সুখেতে কণ্টক যোজন।
দুঃখ কশাঘাতে আত্মার শোধন ॥
বিষয় আশার না হয়ে সুসার।
জানিবে সংসার নাহি হয় সার ॥
সংসার পরীক্ষা শিখিবার স্থান।
ইথে থাকি জীব লভিবেক জ্ঞান ॥
দুঃখেতে পুড়িয়া শ্যামিকা ত্যজিবে।
তাঁর পানে চাহি অটল থাকিবে ॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা সংসারে থাকিয়া।
প্রবৃত্তির সহ সংগ্রাম করিয়া ॥
তাঁর দিকে ক্রমে হ'ব আগুয়ান।
তাঁর বলে ক্রমে হ'ব বলীয়ান ॥
সংসার মায়ায় আর না মজিব।
হৃদয়ের স্বামী তাঁহারে করিব ॥
কিন্তু রিপুসহ সংগ্রাম করিতে।
দুঃখ প্রলোভন শতেক সহিতে ॥
হীন-বল মোরা কেমনে পারিব?
দুর্ব্বলের বল তাঁহারে ডাকিব।
রে আত্মন্! তাঁরে করহ নির্ভর।
তিনি বল দেন বলের আকর ॥
সম্পদ মলয় যখন বহিবে।
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহারে স্মরিবে ॥
বহিলে বিপদ ঝটিকা ভীষণ।
তাঁর কাছে গিয়া লইবে শরণ ॥

---

* কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [illegible] [illegible]
ইহার অনুরূপ ভাব [illegible] [illegible]ছেন। যথা—
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাঁদিলাম।
সুখের [illegible] [illegible] [illegible]

তিনিই আশ্রয় দিবেন তোমারে।
তিনি বিনা আর কেবা দিতে পারে?
প্রেম বিহঙ্গম দুই পক্ষে ভর।
করিয়া উঠিছে আকাশ উপর॥
সুখ দুঃখ উভে করিয়া আশ্রয়।
তাঁর দিকে যেতে করহ নিশ্চয়॥
সম্পদ, সৌভাগ্য, দুঃখ, অশ্রু-জল।
সবে যেন হয় আত্মার মঙ্গল॥

ক্রমশঃ।

সমালোচনা।

বিদ্যাবতী আবিয়ার ও তাঁহার উপদেশ।

শ্রীযুক্ত বাবু নকড়চন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত। মূল্য /০ আনা। আবিয়ার নামে যে একজন বিদুষী স্ত্রী ছিলেন, তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন না। ইহাঁর সমস্ত জীবন-বৃত্তান্ত পাওয়া যায় নাই, যাইবারও কোন উপায় নাই। লেখক বহু কষ্টে যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার অনেক স্থল উপন্যাসসংশ্লিষ্ট। ইহা সত্তেও তিনি আমাদিগের ধন্যবাদার্হ। এতৎপাঠে আবিয়ারের সময়ে ভারতবর্ষে স্ত্রী-শিক্ষার কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, তাহার বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইনি খনার সম-সাময়িক ছিলেন। আমাদিগের দেশে যদ্যপি পূর্ব্বে জীবনী লেখার প্রথা থাকিত, তাহা হইলে আমরা আজ এই রমণীকুলতিলকের আদ্যোপান্ত জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া অধিকতর সুখী হইতাম। চানক্যের শ্লোকের মত ইহাঁর উপদেশ-গুলি সারগর্ভ। আমরা আশা করি এদেশের বালক বালিকাগণ এ সমস্ত উপদেশ যেন যত্নের সহিত পাঠ করেন। এরূপ পুস্তিকা যত প্রকাশিত হয়, ততই ভাল।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকাগুলি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। জীবন-সহায়। শ্রীমনোরঞ্জন গুহ কর্তৃক লিখিত।

২। পাপীর জীবনে ভগবানের লীলা। দ্বিতীয় সংস্করণ। পূর্ব্ববঙ্গ নববিধান সমাজ হইতে প্রকাশিত।

৩। গীতি কবিতা। শ্রীভবানীচরণ ঘোষ প্রণীত।

৪। সখি-সমিতি শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

৫। Hindu Religion by Deena Nath Gangluy

৬। পরাশর সংহিতা অনুবাদ সহিত। শ্রীকৈলাস চন্দ্র সিংহ কর্তৃক সম্পাদিত।

৭। শ্রীদারুব্রহ্ম অর্থাৎ জগন্নাথ দেবের বিবরণ। শ্রীকৈলাশচন্দ্র সিংহ কর্তৃক প্রণীত।

৮। আনন্দ-তুফান। শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রণীত।

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal July, 1886.

ভারতী ও বালক। শ্রাবণ ১২৯৩।

প্রচার। ঐ

সজ্জনতোষিণী। ঐ

নব্যভারত। ভাদ্র ১২৯৩।

আলোচনা। ঐ

সর্ব্ব-বিদ্যারত্নাকর বা তন্ত্র-শাস্ত্র। ত্রৈমাসিক পত্র। ১ম সংখ্যা।

Hindu Reformer, August 1886.

Fellow Worker, August 1886

Theosophist, Sept, 1886.

সংবাদ।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে আমাদের বন্ধু শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। বহু দিন হইতে ইহাঁর আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংযোগ। ইনি এখানকার এক জন আচার্য্য এবং প্রচারক ছিলেন। ভীষণ পৃষ্ঠব্রণ ইহাঁর মৃত্যুর কারণ। আজ প্রায় তিন মাস হইল তিনি এই রোগে যার পর নাই কষ্ট পাইতেছিলেন। কিন্তু গত ১৮ ভাদ্রে রাত্রি ৯ টার সময় সর্ব্বসন্তাপহারক ঈশ্বর ইহাঁকে আপনার ক্রোড়ে লইয়া সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়াছেন। আমরা কায়মনে তাঁহার পরলোকগত আত্মার শুভ কামনা করি। তিনি এতাবৎকাল আমাদিগের মধ্যে থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন। এই তত্ত্ববোধিনীতে তাঁহার অনেক উপদেশ ও অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত আছে। অতঃপর সেই গুলি দুঃখের সহিত তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবে। তিনি বিলক্ষণ সুস্থ ও বলবান ছিলেন। আবহমান কাল মৎস্য মাংস স্পর্শ করেন নাই। এরূপ লোকের অকাল মৃত্যুতে আমরা বাস্তবিকই ব্যথিত হইলাম। ইনি উৎসাহী ও পরিশ্রমী ছিলেন। জীবনের প্রায় অর্দ্ধাংশ ধর্ম্মপ্রচারে ব্যয় করিয়াছেন। ইহাঁর জন্মস্থান বেহালা। ইনি তথায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ঔষধালয় স্থাপন প্রভৃতি প্রত্যেক সৎকার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত বেহালা ব্রাহ্মসমাজ ইহাঁরই তত্ত্বাবধানে ছিল। তিনি এখন যথায়ই থাকুন ঈশ্বর তাঁহার সহায় হউন। আমাদের এই শেষ প্রার্থনা।

আয় ব্যয় ।

বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭ ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ ।

আয়	৯১৪॥ ১৫
পূর্ব্বকার স্থিত ...	৩০০৮॥৶ ৫
সমষ্টি	৩৯২৩ ৵০
ব্যয় ...	৯৪২।৶ ১০
স্থিত	২৯৮০৸১০

আয় ।

ব্রাহ্মসমাজ	৭৪৶ ৫
মাসিক দান ।	
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা)	১।৹
সাম্বৎসরিক দান ।	
শ্রীযুক্ত বাবু বনমালী চন্দ্র	১৲
" " শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	২৲
" " শশীন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়	৫৲
" " মণিলাল মল্লিক	৪৲
" " রসিকলাল পাইন	৩৲
" " রাজকৃষ্ণ আঢ্য	১৲
" " প্যারিমোহন রায়	১৲
" " শিবচন্দ্র নন্দী	৫৲
" " ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়	১০৲
উপাসকমণ্ডলীর দান ।	
শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রিয় দেব	২৲
" " চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	৩৲
আনুষ্ঠানিক দান ।	
শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮৲
" " সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫
" " যশঃপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়	৬৲
" " জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮৲
" " সরোজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪৲
" " প্রমোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬৲
দানাধারে প্রাপ্ত	২৸৶৫
	৭৪৶৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২২০৸০
পুস্তকালয় ...	৬২॥৶০
যন্ত্রালয় ...	৪০৮॥৶১৫
গচ্ছিত ...	৫৬৸৶১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	।৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ...	৫০৲
দাতব্য ...	৯
গবর্ণমেণ্ট সেবিংশ ব্যাঙ্ক	[illegible]
রামায়ণ	২৩
সমষ্টি	৯১৪॥ ১৫

ব্যয় ।

ব্রাহ্মসমাজ	৪০৬॥৶১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৯৫৸৶
পুস্তকালয় ...	২ ৫
যন্ত্রালয়	[illegible]৶১৫
গচ্ছিত	৩৬ ৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৬॥৶ ৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার	৫০৲
দাতব্য	৬৲
রামায়ণ	৴১০
সমষ্টি	৯৪২।৶১০

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন ।

আগামী ২৭ আশ্বিন মঙ্গলবার "বালী ধর্ম্ম সমাজের" চতুর্থ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে । ধর্ম্মানুরাগী মহোদয়গণ উপাসনায় যোগদান করেন ইহা নিতান্ত প্রার্থনীয় ।

শ্রীহীরালাল মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক ।

আগামী ২৮এ আশ্বিন বুধবার কালনা ব্রাহ্মসমাজের ঊনবিংশ সাম্বৎসরিক মহোৎসব উপলক্ষে প্রাতে ৭॥ ঘটিকা ও সায়ংকালে ৭ ঘটিকার পর উপাসনাদি কার্য্য আরম্ভ হইবে ।

শ্রীবিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক ।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক সোমবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়স্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিন ঘণ্টার পর ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে ।

শ্রীশ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক ।

ভক্তি ভক্তিই নহে—যে জ্ঞান ভক্তির বিরোধী সে জ্ঞান জ্ঞানই নহে।

ঈশ্বর-জ্ঞানের প্রধান লক্ষণ—শ্রদ্ধা। ঈশ্বর আছেন—ইহাতে মনের ঐকান্তিক সম্মতি [illegible] দৃঢ় বিশ্বাস—ইহারই নাম শ্রদ্ধা। এ বিশ্বাসের ভিতর ঐকান্তিক [illegible] অসম্মতি [illegible] কোন প্রকার ছিদ্র [illegible] পাইতে পারে না,—"না" এ কথাটি এ বিশ্বাসের সীমায় স্থান পাইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম তাই বলেন "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে" যে ব্যক্তি বলেন যে, তিনি আছেন, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন। এইরূপ ঐকান্তিক সম্মতি-গর্ভ বিশ্বাসই ঈশ্বরের সমস্ত উপাধি আমাদের জ্ঞান-লোকের সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। "না" যেখানে নাই, "নাই" সেখানে থাকিতে পারে না,—অতএব, জ্ঞান প্রেম শক্তি ইত্যাদি যত প্রকার সদ্ভাব লক্ষণ—সমস্তই ঈশ্বরেতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে, অজ্ঞান, জড়তা, অশক্তি, প্রভৃতি অভাব-সূচক কোন লক্ষণই ঈশ্বরেতে বর্ত্তিতে পারে না। এইরূপ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং মাহাত্ম্যের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা।

ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিলে, তাঁহার সহিত আমাদের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা, আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি মহান প্রভু, আমরা তাঁহার একান্ত আশ্রিত; অতএব তাঁহার অভিপ্রেত পথে চলাই আমাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি ঈশ্বরের অভিপ্রেত পথ অন্বেষণ করেন এবং সেই পথে চলিতে অভ্যাস করেন—তাঁহার ধর্ম্ম-বুদ্ধিই তাঁহার পথ-প্রদর্শক। বিষয়ের উত্তেজনায় চালিত হইব না—কর্ত্তব্য স্থির করিয়া তদনুসারে চলিব—এইরূপ বুদ্ধিই ধর্ম্মবুদ্ধি। ধর্ম্মবুদ্ধিকে সহায় করিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত পথে প্রাণপণে লাগিয়া থাকার নাম—নিষ্ঠা। শ্রদ্ধা জ্ঞান-গর্ভ, নিষ্ঠা শক্তি-গর্ভ। আমাদের আত্মাতে যে এক স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান-জ্যোতি আছে, তাহাই শ্রদ্ধার অবলম্বন; এবং আমাদের আত্মাতে যে এক নিয়ামিকা শক্তি আছে [illegible] আমাদের মন আমাদের আপনার [illegible] সেই শক্তিই নিষ্ঠার অবলম্বন। [illegible] শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠার দ্বার দিয়াই [illegible] এবং [illegible] উপনীত হওয়া।

সাধক ঈশ্বরের অভিপ্রেত [illegible] তাঁহার আজ্ঞা [illegible] অবলোকন [illegible] থাকেন, [illegible] আপনি [illegible] অনুষ্ঠান করেন—ঈশ্বরকে [illegible] মঙ্গলের আকর বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করেন। পৃথিবীতে ঈশ্বরের [illegible] নাই—ঈশ্বর যে কেবল প্রভু নহেন, তিনি আমাদের পরমহিতৈষী মঙ্গলময় প্রভু,—পূর্ব্বোক্ত কথাটি যখন সাধকের [illegible] হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ জন্মে। পূর্ব্বে তিনি কর্ত্তব্যবোধে যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, এখন তিনি আন্তরিক অনুরাগে সেই পথ অবলম্বন করেন। মোহ-মেঘের অপসারণে সাধক যখন ঈশ্বরের প্রেমমুখ অবলোকন করেন, তখনই তিনি বুঝিতে পারেন যে, ইনিই আমার একমাত্র ভজনীয়; তখনই তাঁহার মনোমধ্যে ঈশ্বরানুরাগ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে; ইহারই নাম ভক্তি।

সাধকের আন্তরিক ভক্তি ঈশ্বরের করুণা আকর্ষণ করে। ঈশ্বরের করুণামৃত সর্ব্বত্রই উন্মুক্ত রহিয়াছে; যাঁহার যে পরিমাণে পিপাসা, তিনি সেই পরিমাণে তাহা পান ক-

রেন। যতক্ষণ চিত্ত যে পর্য্যন্ত না ঈশ্বরের অপার করুণা-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়, সে পর্য্যন্ত তিনি ঈশ্বরানুসন্ধানে ক্ষান্ত হ'ন না। সাধকের ভক্তি ক্রমে যতই উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকে—ঈশ্বরের প্রতি আত্মার আকর্ষণ যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে—ততই তিনি ঈশ্বরকে নিকটে পা'ন, ততই তিনি ঈশ্বরকে আপনার বলিয়া—আত্মার আত্মা বলিয়া—হৃদয়ঙ্গম করেন; এইরূপে তাঁহার ভক্তি ক্রমে ক্রমে প্রীতিরূপে পরিণত হইতে থাকে। শ্রদ্ধা নিষ্ঠা এবং ভক্তি তিনই প্রীতির অন্তর্ভূত—প্রীতি তিনের একটিকেও ছাড়িতে পারে না। যখনই সাধক ঈশ্বরকে অন্তরতম প্রিয়তম সুহৃৎ বলিয়া প্রীতি করেন, তখনই তিনি তাঁহাকে পরাৎপর পরমাত্মা বলিয়া ভক্তি করেন, এবং তাঁহার অনুগত সেবক হইয়া কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর হ'ন। প্রীতি কোন ভাল সামগ্রীই নষ্ট করে না—সকলকেই যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করে; প্রীতি ভক্তির আর কিছুই অপহরণ করে না—কেবল ভয় অপহরণ করে, প্রীতি কর্ত্তব্য-সাধনের আর কিছুই অপহরণ করে না—কেবল কঠোরতা অপহরণ করে। ঈশ্বর-প্রীতিতে মনুষ্যের আত্মার যেমন উৎকর্ষ সাধিত হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। ঈশ্বরের প্রতি প্রেমাসক্ত মনুষ্যের জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয়; ঈশ্বরের পথে চলাতে মনুষ্যের শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়; ঈশ্বর-প্রীতিতে সমগ্র আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হয়। সাধক যখন ঈশ্বর-প্রীতিতে পরিপোষিত হইয়া মোহের তামসিক পরাক্রম আত্মা হইতে নিঃসৃত করিয়া ফেলেন, তখন ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার আত্মাতে আপনার জ্ঞানের কণা-মাত্র প্রকাশিত করিয়া তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া দে'ন, এবং আপনার শক্তির কণা-মাত্র সঞ্চারিত করিয়া তাঁহার আত্মার বল উত্তেজিত করিয়া তোলেন। ঈশ্বর স্বয়ং যাঁহার চক্ষুর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ এবং আত্মার আত্মা হইয়া সমস্ত অভাব মোচন করেন, তাঁহার কিসের অভাব? ঈশ্বরকে যিনি হৃদয়ের সহিত প্রীতি করেন—তাঁহার কিসের অভাব? আত্মার উৎকর্ষ ঈশ্বর-প্রীতির অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু সাধক যতই কেন উৎকর্ষ লাভ করুন না—ঈশ্বর তাহা অপেক্ষা পরাৎপর পরম উৎকৃষ্ট; এজন্য আপনার আত্মার উৎকর্ষ সাধকের লক্ষ্যের উপযুক্ত নহে; ঈশ্বরই সাধকের লক্ষ্য, আত্মার উৎকর্ষ উপলক্ষ মাত্র। আত্মার উৎকর্ষ-সাধনের জন্য ঈশ্বর-প্রীতি নহে কিন্তু ঈশ্বর-প্রীতির উপযুক্ত আধার হইবার জন্যই আত্মার উৎকর্ষ সাধন; এইরূপ হইলেই সাধক ঠিক্ পথে দণ্ডায়মান হ'ন। যে প্রীতির উদ্দেশ্য আপনার উৎকর্ষ সে প্রীতি প্রীতিই নহে; প্রিয় ব্যক্তিই যে প্রীতির সর্ব্বস্ব সেই নিষ্কাম প্রীতিই প্রকৃত প্রীতি। আত্মার উৎকর্ষ ঈশ্বর-প্রীতির অবশ্যম্ভাবী ফল, এবং ঈশ্বর-প্রীতির উপযুক্ত আধার—ইহা সত্য; কিন্তু আমাদের আত্মার উৎকর্ষই যদি আমাদের মুখ্য লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে আমরা এ কুল ও কুল দু কুল হারাই, তাহা হইলে আমরা আত্মার উৎকর্ষেও বঞ্চিত হই, এবং ঈশ্বরের সহবাসেও বঞ্চিত হই। নিষ্কাম ঈশ্বর-প্রীতিই মনুষ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ।

হে পরমাত্মন্! তোমার প্রেমের পিপাসু হইয়া আমরা এখানে সমাগত হইয়াছি। তোমার প্রেমামৃতই আমাদের আত্মার জীবন। পাপতাপে জর্জরিত হইয়া আমরা তোমার দ্বারে উপনীত হইয়াছি, তুমি আমাদের প্রতি করুণাবারি বর্ষণ কর। তাপিত হৃদয়ে তোমার এক বিন্দু করুণা-বারি নিপতিত হইলে আনন্দের সাগর উথলিয়া উঠে ও সমস্ত দুঃখ শোক দূরে চলিয়া যায়।

মোহ মলিনতা অপসারিত করিয়া—নির্জীব হৃদয়ের জীবন-স্বরূপ হইয়া—তুমি আমাদের আত্মাতে আবির্ভূত হও, তাহা হইলেই আমরা চির জীবনের মত কৃতার্থ হইব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

দর্শন-সংহিতা।

অনুবাদকের মন্তব্য।

শাঙ্কর দর্শনের অদ্বৈত-বাদ এবং বর্ত্তমান দর্শনের দ্বৈত-বাদ, এ দুয়ের মধ্যে কিরূপ ঐক্যানৈক্য তাহা পূর্ব্বাহ্ণে জানিয়া রাখা ভাল। আশ্চর্য্য এই যে, শাঙ্কর দর্শনের সহিত বর্ত্তমান দর্শনের যেখানে ঐক্য সেখানে খুবই ঐক্য, তেমনি আবার, যেখানে অনৈক্য সেখানে খুবই অনৈক্য।

(১) উভয়ের ঐক্য।

শাঙ্কর দর্শনেও যেমন—বর্ত্তমান দর্শনেও তেমনি—বিষয়-শব্দ অতীব ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। জড় বস্তুই যে কেবল বিষয়-শব্দের বাচ্য, তাহা নহে; স্বপ্নের বস্তু সকলও বিষয়-শ্রেণী-ভুক্ত। এমন কি—বর্ত্তমান খণ্ডের চতুর্থ সিদ্ধান্তে আছে

"All blanks, all nonentities, require to be supplemented by a "me" before they can be cogitable, just as much as all things require to be thus supplemented.

ইহার অর্থ এই যে, জ্ঞানে প্রকাশ পাইতে হইলে—বস্তু-সকলও যেমন—অভাব সকলও তেমনি—একটি না একটি "আমি"র আশ্রয়াধীন না হইলেই নয়। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অভাব-সকলও (যেমন আলোকের অভাব অন্ধকার, শব্দের অভাব নিস্তব্ধতা, ঔষ্ণ্যের অভাব শৈত্য, জড়-বস্তুর অভাব শূন্য আকাশ, ক্রিয়ার অভাব শূন্য কাল, এই সকল অবস্তুরাও) জ্ঞানের বিষয়-শ্রেণী-ভুক্ত। পঞ্চদশীর গ্রন্থকার সুষুপ্তির অন্ধকারকেও বিষয়-শ্রেণীতে নিক্ষেপ করিয়াছেন, যথা,

"সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্ত তমো-বোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ।
সা চাববুদ্ধ-বিষয়া হ্ববুদ্ধং তত্তদা তমঃ॥"

সুষুপ্তি কালের অন্ধকার-বোধ সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির স্মৃতি-পথে উপনীত হয়; পূর্ব্বজ্ঞাত বিষয়-সকলেরই স্মৃতি সম্ভবে; অতএব, সুষুপ্তি-কালের অন্ধকার সুষুপ্তি-কালে জ্ঞাত ছিল।

এইরূপ, উভয় দর্শনের মতেই দাঁড়াইতেছে যে, জড়-বস্তু, স্বপ্নের বস্তু, ভাবনার বস্তু, আকাশ, কাল, ইত্যাদি যত প্রকার অনাত্ম-বিষয় আছে—তা সে বস্তুই হউক্ আর অবস্তুই হউক্—সমস্তই বিষয়-শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু অনাত্ম বিষয় সকলই কি কেবল বিষয়, আত্মা কি বিষয় নহে? বর্ত্তমান গ্রন্থের জ্ঞান-তত্ত্বের প্রথম সিদ্ধান্তে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয়ের মধ্যে আত্মাই কেবল একমাত্র নিরন্তর-জ্ঞেয়। নিম্ন-লিখিত কথোপকথনে এই সিদ্ধান্তটির যাথার্থ্য সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে;—

অনাত্ম-বাদী॥ আমি উপন্যাস-পাঠে এমনি নিমগ্ন ছিলাম যে, আমি যে পাঠ করিতেছি—সে বোধ তখন আমার ছিল না।

আত্মবাদী॥ এখন অবশ্য তোমার স্মরণ হইতেছে যে, তুমিই পাঠ করিতেছিলে?

অনাত্ম-বাদী॥ সে কি কথা,—এখন যদি তাহা আমার স্মরণ না হইবে, তবে কিরূপে আমি তোমার নিকটে তাহা জ্ঞাপন করিতে পারিব?

আত্ম-বাদী॥ ভুক্ত বস্তুরই রোমন্থন হয়, জ্ঞাত বস্তুরই স্মরণ হয়,—এই তো জানি। তুমি বলিতেছ যে, পাঠ-কালে তোমার এ জ্ঞান ছিল না যে, তুমি পাঠ করিতেছ, অথচ এখন তোমার স্মরণ হইতেছে যে, তুমিই পাঠ করিতেছিলে [illegible] স্বন্ধে যাহা জ্ঞান-কালেই [illegible]

ছিল না, অকস্মাৎ এখন তাহা তোমার স্মরণে উদ্বোধিত হইয়া উঠিল! যে ব্যক্তির সহিত তোমার কোন-কালেই সাক্ষাৎকার নাই, সে ব্যক্তিকেও তুমি তবে স্মরণ করিতে পার। এ-টি তোমার কাছে আমি আজ নূতন শুনিতেছি! এ যদি বলিতে যে, উপন্যাসের প্রতি তোমার পোনেরো আনা মনোযোগ ছিল এবং তোমার আপনার প্রতি শুদ্ধ কেবল-এক আনা মাত্র মনোযোগ ছিল, তাহা হইলে কোন হানি ছিল না; কিন্তু তুমি বলিতেছ যে, পাঠ কালে তুমি মূলেই জান না যে, তুমি পাঠ করিতেছ, আর, সেই না-জানা বিষয়টি এখন তোমার স্মরণে আবির্ভূত হইতেছে! অগ্রে সাক্ষাৎ জ্ঞান পরে স্মরণ—এই তো জানি সম্ভবে; কিন্তু সাক্ষাৎ জ্ঞানের নাম-গন্ধও নাই—অথচ স্মরণ! এটা তো কিছুতেই আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির গলাধঃকরণ হইতেছে না।

অনাত্মবাদী॥ বলিয়াছ ঠিক্! উপন্যাস-পাঠের সময় নিশ্চয়ই আমি জানিতেছি যে, আমিই পাঠ করিতেছি; কারণ, অগ্রে যদি তাহা আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না জানিব, তবে পরে তাহা কিরূপে আমার স্মরণে উপস্থিত হইবে? পাঠ-কালে, উপন্যাসের প্রতি আমার যেরূপ পোনেরো আনা মনোযোগ ছিল, তাহার তুলনায় আমার আপনার প্রতি অতীব যৎসামান্য মনোযোগ ছিল—এইমাত্র,—আপনার প্রতি মূলেই যে আমার মনোযোগ ছিল না—ইহা কোন কাজের কথা নহে। এখন বুঝিলাম যে, আত্মজ্ঞান শুদ্ধ-কেবল আমাদের স্মরণেরই সহচর, তাহা নহে, তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরও সঙ্গের সঙ্গী; সুতরাং প্রত্যক্ষ-জ্ঞান যেমন সাক্ষাৎ-জ্ঞান, আত্মজ্ঞানও সেইরূপ সাক্ষাৎজ্ঞান।

এইরূপে বর্ত্তমান দর্শনে প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, আমরা যাহা-কিছু জানি, তাহারই সঙ্গে জানি যে, আমিই জানিতেছি। জ্ঞেয় বিষয় অনেক আছে;—ঘটি একটি জ্ঞেয় বিষয়, বাটি একটি জ্ঞেয় বিষয়, ইত্যাদি; কিন্তু তাহাদের কেহই নিরন্তর-জ্ঞেয় নহে—জ্ঞান-মাত্রেরই অবিচ্ছেদ্য সহচর নহে; যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয়ের মধ্যে আত্মাই কেবল একমাত্র নিরন্তর-জ্ঞেয়। পঞ্চদশীর গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের একস্থানে বলিয়াছেন।

"অবিদিত্বা স্বমাত্মানং বাহ্যং বেদ ন তু কাচিৎ"

আপনাকে না জানিয়া কেহই অন্য কোন বিষয়কে জানিতে পারে না।

তবেই হইল যে, জ্ঞাতা যাহা কিছু জানে তাহারই সঙ্গে জানে যে, "আমিই জানিতেছি;" আত্মা, জ্ঞান-মাত্রেরই, নিরন্তরজ্ঞেয়। এইটিই অবিকল বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম সিদ্ধান্ত। নিম্ন-লিখিত কতিপয় পংক্তি বেদান্ত দর্শনের মূল গ্রন্থের শাঙ্কর ভাষ্য হইতে উদ্ধৃত;—

"যুষ্মৎপ্রত্যয়াপেতস্য চ প্রত্যগাত্মনো বিষয়ত্বং ব্রবীষি?"

"ন তাবদয়ং একান্তেনা হবিষয়ঃ। অস্মৎ প্রত্যয় বিষয়ত্বাৎ।"

অর্থ।

প্রশ্ন॥ যাহা "আমি" ভিন্ন আর কোন কিছু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না, সেই নিকটতম আত্মাকে তুমি বিষয় বলিতেছ?

উত্তর॥ আত্মা যে, একান্তই বিষয় নহে, তাহা নহে; যেহেতু আত্মা অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয়। অস্মৎ-প্রত্যয়ের অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান দর্শন এবং শাঙ্কর দর্শন উভয়েরই মতে আত্মা জ্ঞেয় বিষয়। এখন জ্ঞানের বিষয় কত প্রকার তাহা দেখা যা'ক্।

জ্ঞানের বিষয় দুই ভাগে বিভক্ত,—আত্মা এবং অনাত্মা। অনাত্ম-বিষয় দুই ভাগে বিভক্ত,—বাস্তবিক (যেমন দৃশ্য স্পৃশ্য ইত্যাদি) এবং অবাস্তবিক (যেমন কাল, স্বপ্ন, অন্ধকার ইত্যাদি)। বাস্তবিক বিষয়

দুই ভাগে বিভক্ত,—প্রত্যক্ষ (যেমন উপস্থিত দৃশ্য-স্পৃশ্য বিষয়) এবং পরোক্ষ (যেমন অনুপস্থিত স্মৃত বিষয়)। অবাস্তবিক বিষয় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; মনোময় (যেমন স্বপ্নের বস্তু) এবং অভাব রূপী (যেমন শূন্য কাল, অন্ধকার, নিস্তব্ধতা, ইত্যাদি)। এই শ্রেণী-বিভাগটি নিম্নে লতাবদ্ধ করিয়া প্রদর্শিত হইল ;—

বিষয় { আত্মা
 { অনাত্মা { বাস্তবিক { প্রত্যক্ষ (দৃশ্যাদি)
 { পরোক্ষ (স্মৃতাদি)
 { অবাস্তবিক { মনোময় (স্বপ্নাদি)
 { অভাবরূপী (অন্ধকারাদি)

এই গেল জ্ঞানের বিষয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আলোকও জ্ঞানের বিষয়—অন্ধকারও জ্ঞানের বিষয়, জড়-বস্তুও জ্ঞানের বিষয়—শূন্য আকাশও জ্ঞানের বিষয়. এ যদি হইল,—জ্ঞানের অবিষয় তবে কি? বর্ত্তমান দর্শনের মতে যাহা স্ববিরোধী তাহাই জ্ঞানের অবিষয়; এক-পৃষ্ঠক পত্র অর্থাৎ যে পত্রের কেবল একটি মাত্র পৃষ্ঠা—তদ্ব্যতীত দ্বিতীয় পৃষ্ঠা নাই—ইহা জ্ঞানের অবিষয়; নির্গুণ বস্তু, অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব আছে কিন্তু না তাহার আপনার জ্ঞানে—না অন্য কাহারো জ্ঞানে—কোন জ্ঞানেই সে অস্তিত্বের উপলব্ধি নাই—ইহা জ্ঞানের অবিষয়; চিন্তাতীত বিষয়ের চিন্তা জ্ঞানের অবিষয়, ইত্যাদি। এই স্ববিরোধী অবিষয় যে কিরূপ তাহা প্রথম খণ্ডের চতুর্থ-সিদ্ধান্তের শেষ ভাগে সুস্পষ্টরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে, যথা ;—

"Does this contradictory nondescript exist?

* * * * * *

This system is as far as any system can be from maintaining that matter per se is a nonentity—a blank. All blanks, all nonentities, require to be supplemented by a "me" before they can be cogitable, just as much as all things or entities require to be thus supplemented. But matter per se is, by its very terms, that which is unsupplemented by any "me;" therefore it, certainly, is not to be conceived as a nonentity. If idealism be a system which holds that matter per se is nothing, we forswear and denounce idealism. True idealism, however, never maintained any such absurd thesis. But does not true idealism reduce every thing in the universe to a mere phenomenon of consciousness? suppose it does,—does it not also reduce every nothing in the universe to a mere phenomenon of consciousness? The materialist supposes that, according to idealism, when a loaf of bread ceases to be a phenomenon of consciousness and is locked away in a dark closet, it must turn into nothing. He might as well fancy that, according to idealism, it must turn into cheese. Idealism does not hold that when a thing ceases altogether to be a phenomenon of consciousness, it becomes another phenomenon of consciousness, as this supposition would imply. No—in the absence of all consciousness, the loaf, or whatever it may be, lapses, not into nothing, but into the contradictory. It becomes the absolutely incogitable—a surd—from which condition it can be redeemed only when some consciousness of it is either known or conceived."

ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, জড়-বস্তু যে সময়ে কোন জ্ঞানেই প্রকাশ পাইতেছে না, সে সময়ে তাহা কিরূপ? জ্ঞান-বহির্ভূত জড় বস্তু স্বতঃ কিরূপ? হয়—তাহা "কিছু," অর্থাৎ ভাব-পদার্থ; নয়—তাহা "কিছু না," অর্থাৎ অন্ধকারাদির ন্যায় অভাব-পদার্থ; নয় তাহা "কিছু অথচ কিছু না", অর্থাৎ বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত যেমন যখনই আছে তখনই নাই—আছে অথচ নাই—উহা তেমনি একটা বিরোধ-পদার্থ;—জ্ঞান-বহির্ভূত জড়বস্তু, স্বতঃ, এই তিন শ্রেণীর কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত? তাহা "কিছু"র দল-ভুক্ত, না "কিছু-না"র দল-ভুক্ত, না "কিছু অথচ কিছুনা"র দলভুক্ত? যদি বল যে, তাহা "কিছু," তবে দাঁড়ায় এই যে, তাহা ঘটপটাদির ন্যায় জ্ঞান-গোচর একটা কিছু—কিন্তু তাহা হইলে তাহা আর জ্ঞান-বহির্ভূত রহিল

না ; যদি বল যে, তাহা "কিছু না," তবে দাঁড়ায় এই যে শূন্য আকাশ—শূন্য কাল—অন্ধকার—এই সকল অবস্তুর ন্যায়, তাহা জ্ঞান-গোচর অভাব পদার্থ ; কিন্তু জ্ঞান-বহির্ভূত জড়বস্তুর স্বরূপ-লক্ষণই এখানে জিজ্ঞাস্য, জ্ঞান-গোচর কোন কিছুই এখানে জিজ্ঞাস্য নহে; তবেই দাঁড়াইতেছে যে,"কিছু অথচ কিছু না" ইহাই জ্ঞান-বহির্ভূত জড়বস্তুর স্বরূপ। জ্ঞান-বহির্ভূত জড়বস্তু ভাব পদার্থও নয়, অভাব-পদার্থও নয়,—তাহা বিরোধ-পদার্থ। বেদান্তসারে অবিদ্যার যেরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা অবিকল ঐরূপ, যথা ;—

"সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞান-বিরোধি ভাব-রূপং যৎকিঞ্চিৎ।"

অর্থ।

তাহা আছে কি নাই তাহা বলিতে পারা যায় না অর্থাৎ কিছু-অথচ-কিছু-না এইরূপ বিরোধ-পদার্থ ; ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ প্রকাশ অপ্রকাশ এবং আকৃতি এই তিন বিরোধী লক্ষণাক্রান্ত ; জ্ঞান-বিরোধী ভাব-রূপী একটা কিছু।

অবিদ্যাকে ত্রিগুণাত্মক বলিবার তাৎপর্য্য কি দেখা যাক্। জ্ঞান-বহির্ভূত জড়বস্তু যে অংশে জ্ঞানের নিকট হইতে লুকাইয়া থাকে সে অংশে তাহা তমোগুণ ;—"কিছু অথচ কিছু না" এই যে, অবিদ্যা, ইহার কিছু-না-অংশটি তমোগুণ ; অবিদ্যা যে অংশে জ্ঞানের নিকট প্রকাশ-যোগ্য, সে অংশে তাহা সত্ত্বগুণ ; কেননা, জ্ঞানের নিকটে প্রকাশ-যোগ্যতাই জড়বস্তুর সত্ত্ব, কিনা—সত্ত্ব—অস্তিত্ব ;—ত্রিগুণাত্মক অবিদ্যার সত্ত্বাংশটিই সত্ত্বগুণ ; এবং যে অংশে তাহা জ্ঞানের নিকট অপ্রকাশ হইয়াও জ্ঞানকে ধরা দেয় না—জ্ঞানের চক্ষে কেবল ধাঁধা লাগাইয়া দেয়—সেই অংশে তাহা রজোগুণ ; সত্ত্বতমোময় অবিদ্যার স্বরূপ-গত বিরোধাংশটিই রজোগুণ। জড়বস্তু, স্বরূপতঃ অর্থাৎ যে অংশে তাহা জ্ঞানের অগোচর, সেই অংশে, অবিদ্যা-শব্দের বাচ্য ; যে-অংশে তাহা জ্ঞানের গোচর সে অংশে তাহা অবিদ্যা নহে। জ্ঞান স্পর্শ-মণি-স্বরূপ ; জ্ঞানের সংস্পর্শ মাত্রে অবিদ্যা বিদ্যায় পরিণত হয়—স্ববিরোধী অবিরোধীতে পরিণত হয়—অনির্ব্বচনীয় সুনির্ব্বচনীয়ে পরিণত হয়। জ্ঞানে প্রকাশ পাওয়াই অবিদ্যার মৃত্যু, এবং অবিদ্যার মৃত্যুই বিদ্যার জন্ম। অবিদ্যার গর্ব্বেই অবিদ্যার মৃত্যু প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বিদ্যার বীজ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—সত্ত্বগুণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সত্ত্ব-গুণের প্রাদুর্ভাব (অর্থাৎ জ্ঞানে প্রকাশ পাওয়া) যদিচ অবিদ্যার মৃত্যু-স্বরূপ, কিন্তু সেই মৃত্যুই অবিদ্যার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সত্ত্বগুণ-প্রধান অবিদ্যা সতীর সহিত উপমেয়; রজোগুণ দক্ষের সহিত উপমেয় ; জ্ঞান শঙ্করের সহিত উপমেয়। দক্ষ যেমন শঙ্করের বিরোধী, রজোগুণ সেইরূপ জ্ঞানের বিরোধী ; সতী যেমন পতি-প্রাণা, সত্ত্বগুণ-প্রধান অবিদ্যা সেইরূপ জ্ঞান-প্রাণা ; সতী যেমন প্রাণ-ত্যাগ করিয়া উমা হইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাবে অবিদ্যা সেইরূপ প্রাণ-ত্যাগ করিয়া বিদ্যা হইয়া জন্ম-গ্রহণ করে। অবিদ্যা কেবল জীব সন্নিধানেই অবিদ্যা, ঈশ্বর-সন্নিধানে তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্ব-গুণ-মাত্রে পর্য্যবসিত; কেন না পূর্ণ জ্ঞানে সমস্তই প্রকাশমান—কিছুই অপ্রকাশ থাকিতে পারে না।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানের—বিষয় সম্বন্ধেও যেমন—অবিদ্যা সম্বন্ধেও তেমনি—উভয় দর্শনেরই মতের ঐক্য রহিয়াছে। নিম্নে জ্ঞানের বিষয় এবং অবিদ্যার সমস্তই লতাবদ্ধ করিয়া প্রদর্শিত হইল।
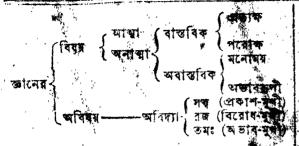
এই তো গেল জ্ঞানের বিষয় এবং অবিষয়। এখন আত্মা এবং অনাত্মার পরস্পরের সম্বন্ধ বিষয়ে দুই দর্শনের কিরূপ ঐক্য তাহা দেখা যা'ক।

নিম্ন-লিখিত দুইটি শ্লোক পঞ্চদশী হইতে উদ্ধৃত।

"অহম্বৃত্তি রিদম্বৃত্তিরিত্যন্তঃকরণং দ্বিধা।
বিজ্ঞানং স্যাদহম্বৃত্তি রিদংবৃত্তি র্মনো ভবেৎ।
অহম্প্রত্যয় বীজত্ব মিদম্বৃত্তেরতি স্ফুটং।
অবিদিত্বা স্বমাত্মানং বাহ্যম্বেদ নতু কচিৎ॥"

অর্থ।

অন্তঃকরণের বৃত্তি দুই প্রকার,—অহংবৃত্তি (অর্থাৎ আত্মবিষয়ক বৃত্তি) এবং ইদম্বৃত্তি (অর্থাৎ অনাত্ম-বিষয়ক বৃত্তি)। অহম্বৃত্তিই বিজ্ঞান এবং ইদম্বৃত্তিই মন। ইহা অতীব স্পষ্ট যে, অহম্প্রত্যয় (আত্মজ্ঞান) ইদম্বৃত্তির (অনাত্মবিষয়ক জ্ঞানের) বীজ স্বরূপ। কারণ, আপনাকে না জানিয়া কেহই অন্য কোন বিষয়কে জানিতে পারে না।

পঞ্চদশীর এই কয়েকটি কথা বর্ত্তমান গ্রন্থের বর্ত্তমান খণ্ডের আপাদ মস্তক অধিকার করিয়া রহিয়াছে; অতএব উহার অর্থের প্রতি সবিশেষ প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। জ্ঞানমাত্রেরই দুইটি বৃত্তি; তাহার মধ্যে একটি আপনাকে লইয়া ব্যাপৃত হয়—এইটি অহম্বৃত্তি, আর-একটি অনাত্ম-বিষয় লইয়া ব্যাপৃত হয়—এইটি ইদম্বৃত্তি। কি অভিপ্রায়ে অ[illegible] বিজ্ঞান এবং ইদম্বৃত্তিকে মন বলা হইতেছে, এক্ষণে তাহা ভাল করিয়া অবধারণ করা আবশ্যক। বিজ্ঞান যে কি—তাহা তাহার কার্য্যেই [illegible] সাধারণ-তত্ত্ব অবলম্বন পূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ [illegible] বিবরণ দ্বারা তাহার পুষ্টি-সাধন করাই বিজ্ঞানের একমাত্র কার্য্য। যে কোন বিজ্ঞান [illegible] (যেমন জ্যোতিষ বিজ্ঞান) তাহার সাধারণ তত্ত্বগুলি ছাঁটিয়া ফেলিলে, বিশেষ বিশেষ বিবরণ যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা বিজ্ঞান-নামের অযোগ্য। অতএব, জ্ঞানের যে অংশ সাধারণ তত্ত্ব-গর্ভ তাহাই বিজ্ঞান-শব্দের বাচ্য; আর, যে অংশ বিশেষ বিশেষ বিষয়-গর্ভ তাহাই মনঃশব্দের বাচ্য। অহম্বৃত্তি যদি সাধারণ-তত্ত্ব-গর্ভ হয়, তবেই তাহা বিজ্ঞান শব্দের বাচ্য, নচেৎ নয়। কাণ্ট, যিনি ইউরোপের একজন প্রধান তত্ত্ববিৎ, তাঁহার মতে অহম্বৃত্তি ("The I Think" অর্থাৎ আমি চিন্তা করিতেছি বা আমি জানিতেছি,—এই ব্যাপারটি) এমনি একটি ব্যাপকতম সাধারণ তত্ত্ব যে, তাহা বিজ্ঞানের সমস্ত মূলতত্ত্বেরই ভিত্তি-মূল। অতএব পঞ্চদশীর এই যে একটি কথা যে, অহম্বৃত্তিই বিজ্ঞান, ইহাকে "সেকেলে" বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া ইহার তাৎপর্য্যের প্রতি যত্নপূর্ব্বক প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। একটা কোন অনাত্ম-বিষয় ধর—যেমন ঘট; আমাদের জ্ঞানাভ্যন্তরে ঘট থাকিলেও থাকিতে পারে—না-থাকিলেও না-থাকিতে পারে—ঘটের পরিবর্ত্তে পট থাকিতে পারে—পটের পরিবর্ত্তে আর একটা কিছু থাকিতে পারে; অতএব ঘট-পটাদি বিষয়-সকল জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ সময়ের বিশেষ বিশেষ বিষয়—সকল সময়ের সাধারণ তত্ত্ব নহে। কিন্তু যখন [illegible] ঘট জানিতেছি—তখনও আমি জানিতেছি যে, আমিই জানিতেছি,—যখন আমি [illegible] জানিতেছি তখনও আমি জানিতেছি যে, [illegible] জানিতেছি; সুতরাং আমি জানিতেছি [illegible] ("The I think" এই যে একটি ব্যাপার, ইহা জ্ঞানের কোন বিশেষ সময়ের বিশেষ বৃত্তান্ত নহে—ইহা জ্ঞানের সকল সময়েরই সাধারণ তত্ত্ব। [illegible]

অহম্বৃত্তি সাধারণ-তত্ত্বগর্ভ। পূর্ব্বে বলিয়াছি (এবং বিজ্ঞান-শাস্ত্র মাত্রই আমাদের এ কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছে) যে, জ্ঞানের যে অংশ সাধারণ তত্ত্ব-গর্ভ তাহাই বিজ্ঞান-শব্দের বাচ্য; অতএব পঞ্চদশীর এ কথাটি অকাট্য যে, অহম্বৃত্তি বিজ্ঞান। অহম্বৃত্তিই যে মূল বিজ্ঞান, ইহা বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের অষ্টম সিদ্ধান্তে রীতিমত প্রমাণ করা হইয়াছে। পঞ্চদশী তাহার পরে বলিতেছেন যে, "অহম্প্রত্যয়-বীজত্ব মিদংবৃত্তেরিতিস্ফুটং" ইহার অর্থ এই যে, আত্মজ্ঞানই অনাত্মজ্ঞানের বীজ কি না ভিত্তি-মূল; এই বচনটির সপক্ষে বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম সিদ্ধান্তের গোড়াতেই আছে যে, জ্ঞাতা যাহা কিছু জানে, তাহার সেই জ্ঞানের ভিত্তিমূল স্বরূপে আপনাকে কিছু-না-কিছু জানা তাহার নিতান্ত আবশ্যক; সংক্ষেপে, অনাত্ম-জ্ঞান মাত্রই আত্ম জ্ঞানের আশ্রয়-সাপেক্ষ। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, আত্মা এবং অনাত্মার পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়েও দুই দর্শনের কোন মত-ভেদ নাই। এখানে সে সম্বন্ধটি আর-একটু স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। সাধারণ-তত্ত্ব (যেমন "যে জড়-পিণ্ডের ঘনত্ব এবং বিস্তৃতি যত অধিক তাহার আকর্ষণ-শক্তি তত প্রবল" এই একটি সাধারণ তত্ত্ব) নিয়ম ব্যক্ত করে, এবং তাহার অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ বিবরণ (যেমন গ্রহাদির গতিবিধি) সেই নিয়ম মানিয়া চলে; সাধারণ তত্ত্ব নিয়ামক, এবং তাহার অধীনস্থ বিশেষ বিশেষ বিবরণ নিয়ম্য;—দুয়ের মধ্যে এইরূপ নিয়ম্য-নিয়ামক সম্বন্ধ। সাধারণ-তত্ত্ব-গর্ভ অহম্বৃত্তি বা মূল বিজ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ বিষয়-গর্ভ ইদম্বৃত্তি বা মন, এ দুয়ের মধ্যেও, কাজেই, সেইরূপ নিয়ম্য-নিয়ামক সম্বন্ধ; তাহার [illegible] অহম্বৃত্তি (ধীবৃত্তি বা বিজ্ঞান) নিয়ামক এবং ইদম্বৃত্তি (মনোবৃত্তি বা ইন্দ্রিয়-বৃত্তি) নিয়ম্য। এ পর্য্যন্ত দুই দর্শনের মধ্যে কেবল ঐক্যই উপলব্ধি করা গেল—অনৈক্যের বিন্দুবিসর্গও দৃষ্টি-গোচর হইল না। এখন কথা এই যে, মানিলাম—অহম্বৃত্তি ইদম্বৃত্তির নিয়ামক সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি শেষোক্ত বৃত্তি অপেক্ষা উচ্চ পদবীস্থ; কিন্তু তাহা বলিয়া কখনো কি এরূপ হইতে পারে যে, অহম্বৃত্তি আপনার সেই উচ্চ পদবীতে ঐকান্তিক ভর করিয়া দাঁড়াইয়া ইদম্বৃত্তির সহিত একেবারেই সম্পর্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাকী অবস্থিতি করিতেছে? যদি বল যে হাঁ—তাহা হইতে পারে, তবে তুমি অদ্বৈতবাদী; যদি বল যে, না—তাহা হইতে পারে না, তবে তুমি দ্বৈতবাদী। এই যে এক হাঁ না, এই সূক্ষ্ম সূত্রটিতে দুই দর্শনের সমস্ত মত-ভেদ লম্বমান রহিয়াছে।

(২) উভয়ের অনৈক্য।

এখন আমরা বিষম এক সংকট স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এই স্থানটি স্ব-বিরোধে পরিপূর্ণ। পঞ্চদশীর গ্রন্থকার এইমাত্র বলিলেন "অবিদিত্বা স্বমাত্মানং বাহ্যং বেদ নতু কচিৎ" আপনাকে না জানিয়া কেহই অন্য কোন বিষয়কে জানিতে পারে না; ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আত্মা আপনাকে জানে—আত্মা আপনিই আপনার জ্ঞেয় বিষয়। সুতরাং আত্মা জ্ঞেয়-বিষয়ের শ্রেণী-ভুক্ত। আর, ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং আত্মাকে জ্ঞেয় বিষয়ের দল-ভুক্ত করিয়াছেন—"অস্মৎ প্রত্যয় বিষয়ত্বাৎ" যে হেতু আত্মা আপনি আপনার জ্ঞানের বিষয়; কিন্তু অনতিপরেই পঞ্চদশী বলিতেছেন।

"স্বয়মেবানুভূতিত্বাৎ বিদ্যতে নানুভাব্যতা।
জ্ঞাতৃজ্ঞানান্তরাভাবাৎ অজ্ঞেয়ো ন ত্বসত্তয়া॥"

আত্মা নিজেই জ্ঞান স্বরূপ, এই জন্য তিনি জ্ঞেয়

নহেন ; তাঁহার অন্য জ্ঞাতা নাই বলিয়াই তিনি জ্ঞেয় নহেন—তাঁহার অস্তিত্ব নাই বলিয়া নহে।

অর্থাৎ অনাত্ম-বিষয়-সকল হইতে ভিন্ন যে জ্ঞান, তাহাই অনাত্ম বিষয়-সকলকে জানে ; কিন্তু জ্ঞান-হইতে ভিন্ন এমন কি-বস্তু আছে যাহা জ্ঞানকে জানিবে ? জ্ঞানের অন্য কোন জ্ঞাতা নাই বলিয়াই জ্ঞান অজ্ঞেয়—জ্ঞানের অস্তিত্ব নাই বলিয়া নহে। ইহাতে দাঁড়াইতেছে এই যে, জ্ঞানের অস্তিত্ব আছে অথচ সে অস্তিত্ব কাহারো উপলব্ধি-গম্য নহে, যেহেতু জ্ঞান অজ্ঞেয়। উপরের শ্লোকটিতে আত্মা অন্য কর্ত্তৃক (অর্থাৎ অনাত্মা কর্ত্তৃক) জ্ঞেয় না হওয়া অপরাধে একেবারেই অজ্ঞেয়ের অন্ধকূপে বলপূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত হইল। দ্বৈতবাদী এ ব্যাপারটি নির্ব্বিবাদে যাইতে দিতে পারে না—তাই নিম্ন-লিখিত বাদানুবাদ ;—

দ্বৈতবাদী ॥ যাহা অন্য কর্ত্তৃক জ্ঞেয় নহে কিন্তু আপনা-কর্ত্তৃক জ্ঞেয়, তাহাকে কি জ্ঞেয় বলিতে পারা যায় না ?

অদ্বৈতবাদী ॥ কেন পারা যাইবে না ? আপনা-কর্ত্তৃকই হউক, আর, অন্য-কর্ত্তৃকই হউক, জ্ঞেয় যে—সে জ্ঞেয়। এ তো অতি সহজ কথা স্পষ্ট পড়িয়া আছে।

দ্বৈতবাদী ॥ তুমি বলিতেছ—যাহা আপনা কর্ত্তৃক জ্ঞেয় তাহাও জ্ঞেয়, যাহা অন্য-কর্ত্তৃক জ্ঞেয় তাহাও জ্ঞেয়,—অজ্ঞেয়, তবে, কি ?

অদ্বৈতবাদী ॥ যাহা আপনা-কর্ত্তৃকও জ্ঞেয় নহে, অন্য-কর্ত্তৃকও জ্ঞেয় নহে, তাহাই অজ্ঞেয়।

দ্বৈতবাদী ॥ তুমি বলিতেছ আত্মা অজ্ঞেয়। তবে কি আত্মা আপনা-কর্ত্তৃক বা অন্য কর্ত্তৃক কাহারো কর্ত্তৃক জ্ঞেয় নহে ?

অদ্বৈতবাদী ॥ যখন বলিয়াছি "অজ্ঞেয়" তখন বুঝিতে হইবে যে, আপনা কর্ত্তৃকও জ্ঞেয় নহে—অন্য কর্ত্তৃকও জ্ঞেয় নহে।

দ্বৈতবাদী। কিন্তু তুমি আপনিই বলিয়াছ "অবিদিত্বা স্বমাত্মানং বাহ্যংবেদ নতু নতু ক্বচিৎ" আপনাকে না জানিয়া কেহই অন্য কোন বিষয়কে জানিতে পারে না। তোমার আপনার কথা অনুসারেই দাঁড়াইতেছে যে, আত্মা যেমন অন্যান্য বিষয়কে জানে, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকেও জানে ; তবেই হইল যে, আত্মা আপনা-কর্ত্তৃক জ্ঞেয়। আর, এইমাত্র তুমি বলিলে, যাহা আপনা-কর্ত্তৃক জ্ঞেয় তাহাও জ্ঞেয় ; অতএব তোমারই কথায় দাঁড়াইতেছে যে, আত্মা জ্ঞেয়। এখন তুমি তাহার উল্টা বলিতেছ—এখন বলিতেছ আত্মা অজ্ঞেয় ! ইহার কোন্‌টা ঠিক ?

অদ্বৈত-বাদী ॥ ও দুই কথার মধ্যে—বিরোধ তো আমি কিছুই দেখিতেছি না। আমি কি বলিয়াছি ? আমি কেবল বলিয়াছি যে, আত্মা যখন যে-কোন অনাত্ম-বিষয়কে জানে, তখন, তাহারই সঙ্গে সে আপনাকে জানে। কিন্তু যখন সে কোন অনাত্ম বিষয়কেই না জানে, তখন কি হয় ? তখনও কি সে আপনাকে জানে ? নিরুপাধিক জ্ঞানের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইদম্বৃত্তির অস্তগমন অনিবার্য্য, এবং ইদম্বৃত্তির অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে অহম্বৃত্তির অস্তগমন অনিবার্য্য। সমাধি-কালে ইদম্বৃত্তির উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে অহম্বৃত্তিও উন্মূলিত হয়, তখন কেবল মাত্র এক নিরুপাধিক জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে। জ্ঞানের অস্তিত্ব পূর্ব্বেও [illegible] ছিল, তখনও তেমনি থাকে—যথা [illegible] কেবল তাহার ইদম্বৃত্তি এবং অহম্বৃত্তি [illegible] হইয়া যায়।

দ্বৈতবাদী ॥ তুমি বলিতেছ যে, ইদম্বৃত্তি উন্মূলিত হইলে তাহারই সঙ্গে [illegible]

স্মৃত্তিও উন্মূলিত হইয়া যায়, এ কথা আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত শিরোধার্য্য করিতেছি; কিন্তু তুমি যে বলিতেছ যে, অহম্মৃত্তি অন্তর্হিত হইলেও জ্ঞানের অস্তিত্ব থাকিতে পারে—এ কথায় আমি কোন ক্রমেই সায় দিতে পারি না; তাহা শুধু নয়, যে-কারণে আমি তোমার পূর্ব্বোক্ত কথা শিরোধার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছি, সেই একই কারণে আমি তোমার শেষোক্ত কথা শিরোধার্য্য করিতে অসমর্থ হইতেছি।

অদ্বৈতবাদী॥ সে কারণ-টা কি তাহা ব্যক্ত করিয়া বলিলে ভাল হয়।

দ্বৈতবাদী॥ ব্যক্ত করিয়া বলিতে আমি যে, কুণ্ঠিত, তাহা মনে করিও না; তবে কি না—গুছাইয়া বলিতে একটু সময় লাগিবে, তাহাতে যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তবে সংকোচের অন্য কোন কারণ নাই—সমস্তই ব্যক্ত করিয়া বলিতেছি;—

কোন একটি বস্তু ধর—যেমন বৃক্ষ; বৃক্ষ মাত্রেরই এরূপ কতক-গুলি লক্ষণ থাকা চাই, যাহা শাল তাল তমাল প্রভৃতি সকল বৃক্ষেরই সাধারণ লক্ষণ; এবং সেই সাধারণ লক্ষণ-গুলির সমষ্টিকে আমরা সংক্ষেপে বৃক্ষত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। কিন্তু এরূপ একটা বৃক্ষ আমাকে দেখাও দেখি—যাহার শুদ্ধ কেবল ঐ সাধারণ লক্ষণটিই (বৃক্ষত্ব লক্ষণ-টিই) আছে, তদ্ভিন্ন বিশেষ লক্ষণ একটিও নাই? কখনই তাহা পারিবে না। যদি বট বৃক্ষ দেখাও, তবে, তাহার যেমন বৃক্ষত্ব আছে—তেমনি তাহার সঙ্গে তাহার বটত্বও আছে; যদি দেবদারু দেখাও, তবে, তাহার যেমন বৃক্ষত্ব আছে, তেমনি তাহার সঙ্গে তাহার দেবদারুত্বও আছে। এমন একটিও বৃক্ষ তুমি আমাকে দেখাইতে পারিবে না, যাহার শুধুই কেবল বৃক্ষত্ব আছে—তদ্ব্যতীত আর-কোন-কিছুত্বই নাই। বৃক্ষের এ যেমন দেখা-গেল—জ্ঞানেরও অবিকল এইরূপ। সকল বৃক্ষের সঙ্গেই যেমন বৃক্ষত্ব লক্ষণটি ক্রমাগতই লাগিয়া আছে, সেইরূপ, সকল জ্ঞানের সঙ্গেই "আমি জানিতেছি" এই জ্ঞানটি নিরন্তর লাগিয়া আছে; আত্ম-জ্ঞান সকল জ্ঞানেরই সাধারণ ধর্ম্ম। কোন বৃক্ষই যেমন শুদ্ধ কেবল তাহার সাধারণ ধর্ম্মটির (বৃক্ষত্বের) উপর ভর করিয়া তাহার বিশেষ লক্ষণটির সহিত (যেমন শালত্বের বা তালত্বের বা আর-কোন-কিছুত্বের সহিত) একেবারেই সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ কোন জ্ঞানই শুদ্ধ কেবল তাহার সাধারণ ধর্ম্মটির (অহম্মৃত্তিটির) উপর ভর করিয়া তাহার বিশেষ লক্ষণটির সহিত (ঘট-জ্ঞান, আকাশ-জ্ঞান, অন্ধকার-জ্ঞান, মনো-রাজ্য-জ্ঞান, এই প্রকার কোন-না কোন জ্ঞানের সহিত, এক কথায়—ইদম্মৃত্তির সহিত) একেবারেই সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে পারে না। বৃক্ষত্ব ভিন্ন যাহার আর কোন কিছুত্বই নাই—এরূপ বৃক্ষের অস্তিত্ব যেমন অসম্ভব, তেমনি অহম্মৃত্তি ভিন্ন যাহার আর কোন বৃত্তিই নাই এরূপ জ্ঞানের অস্তিত্ব অসম্ভব। কোন পত্রই যেমন এরূপ হইতে পারে না যে, শুদ্ধ কেবল তাহার একটি-মাত্র পৃষ্ঠা—তা'ছাড়া দ্বিতীয় পৃষ্ঠা নাই, সেইরূপ কোন বৃক্ষই এরূপ হইতে পারে না যে, তাহার কেবল বৃক্ষত্বই আছে—আর-কোন কিছুত্বই নাই,—কোন জ্ঞানই এরূপ হইতে পারে না যে, শুদ্ধ কেবল তাহার অহম্মৃত্তিই আছে—ইদম্মৃত্তি মূলেই নাই। এ বিষয়ে তোমার আমার মধ্যে মত-ভেদ নাই। তবে তুমি কেমন করিয়া এমন একটি পত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছ যাহার দুই পৃষ্ঠার কোন পৃষ্ঠাই নাই—এমন একটি বৃক্ষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছ যাহার বৃক্ষত্ব পর্য্যন্ত

নাই—এমন একটি জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছ যাহার অহম্বৃত্তি পর্য্যন্ত নাই। তোমার মত একরূপ সিদ্ধান্তের আমি কোন অর্থই খুঁজিয়া পাইতেছি না। যে-জ্ঞান নিজেই আপনাকে জানে না—সুতরাং আপনার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে না—সে জ্ঞানের অস্তিত্ব অপর ব্যক্তি কিরূপে উপলব্ধি করিবে? কেহই যে জ্ঞানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে না, সে জ্ঞান আছে—ইহা কে বলিবে? জ্ঞানই জ্ঞানের থাকিবার স্থান। জ্ঞান যদি আপনার জ্ঞানে বিদ্যমান না থাকিবে—তবে আর কোথায় থাকিবে? জ্ঞান আপনার জ্ঞানে নাই—শুধু কেবল তোমার মুখের কথাতেই আছে—এরূপ থাকিলেই বা কি, আর, না থাকিলেই বা কি? জ্ঞান নিজে আপনার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেছে না, যাহার অস্তিত্ব—সে আর উপলব্ধি করিতেছে না, অথচ তুমি বলিতেছ যে, তাহার অস্তিত্ব আছে যেন দিব্য তুমি তাহা উপলব্ধি করিতেছ! দেখিতেছ অন্ধকার—বলিতেছ আলোক! "অন্ধকারই আলোক" এ কথা তুমিই বলো, আমিই বলি, আর একজন অসামান্য মহাপুরুষই বলুন, অন্ধকার যে—সে অন্ধকারই।

অদ্বৈতবাদী॥ তুমি কি তবে বলিতে চাও যে, ইদম্বৃত্তি-শূন্য নিরুপাধিক জ্ঞানের অস্তিত্ব মূলেই সম্ভবে না? বেদে কি আছে শ্রবণ কর;—

"ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং। স বা এষ মহানজ আত্মা।"

এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে, হে প্রিয় শিষ্য! কেবল একই অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ ছিলেন। তিনি জন্মবিহীন মহান্ আত্মা।

যখন ইদং বলিয়া কিছুই ছিল না, তখন অবশ্য ইদম্বৃত্তিও ছিল না। তুমি আপনিই বলিয়াছ যে, ইদম্বৃত্তির অবিদ্যমানে অহম্বৃত্তিও থাকিতে পারে না; সুতরাং অহম্বৃত্তিও ছিল না। কিন্তু অহম্বৃত্তির অবিদ্যমানেও এক মাত্র অদ্বিতীয় জন্ম-বিহীন মহান্ আত্মা ছিলেন। প্রথমে, তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, পরমাত্মা জ্ঞানস্বরূপ এবং সৃষ্টির পূর্ব্বেও তিনি বর্ত্তমান ছিলেন, এ কথা তুমি মানো কি না?

দ্বৈতবাদী॥ ঈশ্বর জ্ঞান-স্বরূপ এবং তিনি নিত্য বর্ত্তমান এ কথা আমি একেবারেই অকাট্য বলিয়া মানি। "কথমসতঃ সৎ জায়েত" অসৎ হইতে কিরূপে সৎ উৎপন্ন হইবে—এইটিই আমার প্রথম প্রস্তাব। উৎপন্ন যাহা কিছু তাহা অবশ্যই কোন না কোন সদ্বস্তুর শক্তি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে—শূন্য হইতে অকস্মাৎ উৎপন্ন হয় নাই। উৎপন্ন জীব যত আছে তাহাদের উৎপত্তির পূর্ব্বে যখন কোন জীবই ছিল না, তখনও আকাশ ছিল—কাল ছিল—এবং আকাশ ও কাল কোন-না-কোন সত্তা এবং শক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। এইটিই প্রথম প্রস্তাব। দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে, সত্তা জ্ঞানকে ছাড়িয়া একাকী থাকিতে পারে না। তোমার আমার যদি জ্ঞান না থাকে তবে তোমার আমার সমক্ষে যেমন কোন অস্তিত্বই থাকিতে পারে না; সেইরূপ মূলেই যদি জ্ঞান না থাকে, তবে মূলেই কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যাহা কেহই কোনকালে জানে নাই, জানে না, জানিবে না, তাহার অস্তিত্ব কেবল মুখের একটা কথামাত্র—তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোন জীবই যখন উৎপন্ন হয় নাই, তখন জগতের সত্তা কাহার জ্ঞানে বিদ্যমান ছিল? সে সত্তা কাহারো জ্ঞানে বিদ্যমান ছিল না বলাও যা, আর, তাহা কোথাও বিদ্যমান ছিল না বলাও তা, একই কথা; সত্তার অর্থই বিদ্যমানতা; বিদ্যমানতা অর্থাৎ জ্ঞানে

কালই তাহা বর্ত্তমান থাকিবে। জ্ঞান-ক্রিয়ার দুইরূপ পদ্ধতি; একরূপ পদ্ধতি এই যে, অগ্রে প্রত্যক্ষ-বৃত্তি পরিস্ফুট হয়, পরে মনোবৃত্তি পরিস্ফুট হয়, পরে ধীবৃত্তি পরিস্ফুট হয়; ইহা কালিক ক্রম-পদ্ধতি। অপর একরূপ পদ্ধতি এই যে, প্রত্যক্ষ-বৃত্তি মনোবৃত্তির আশ্রয় সাপেক্ষ, মনোবৃত্তি ধীবৃত্তির আশ্রয় সাপেক্ষ,—ইহা তাত্ত্বিক পদ্ধতি। কালিক বিচারে অগ্রে প্রত্যক্ষ এবং বহির্জগৎ, পরে মন এবং অন্তর্জগৎ, পরে ধীবৃত্তি এবং আত্মা; তাত্ত্বিক বিচারে—অগ্রে আশ্রয় পরে আশ্রিত—অগ্রে আত্মা এবং ধীবৃত্তি, পরে মন এবং অন্তর্জগৎ, পরে প্রত্যক্ষ এবং বহির্জগৎ। ঈশ্বর কালের পরপার-স্থিত, এ জন্য কালিক বিচার তাঁহার সহিত সংলগ্ন হয় না। ঈশ্বরের সৃষ্টি-ক্রিয়ার সম্বন্ধে অগ্রে অন্তর্জগৎ পরে বহির্জগৎ, এই তাত্ত্বিক পদ্ধতিই সবিশেষ সংলগ্ন হয়। ঈশ্বরের আলোচনা-জগৎ তাঁহার ধী-শক্তির ফল, এবং এই বহির্জগৎ তাঁহার উৎপাদিকা শক্তির ফল; উভয়ই ইদং শব্দের বাচ্য। শাস্ত্রাদির অনেক স্থলে এরূপ পাওয়া যায় যে, এ জগৎ ত্রিগুণাত্মক কিন্তু ঈশ্বরের আলোচনা-জগৎ শুদ্ধ কেবল সত্ত্ব-গুণাত্মক—কেননা সে জগতে সকলই সুপ্রকাশ—কিছুই অপ্রকাশ নাই। শাস্ত্রানুসারে, আমাদের অন্তর্জগৎ মলিন-সত্ত্ব, অর্থাৎ অপ্রকাশ এবং চাঞ্চল্য দ্বারা কলুষিত অবিশুদ্ধ প্রকাশ, এক কথায়—মন; ঈশ্বরের অন্তর্জগৎ শুদ্ধ সত্ত্ব—অর্থাৎ সর্ব্ব-বিষয়ক পূর্ণ প্রকাশ। সেই শুদ্ধ সত্ত্বই ঈশ্বরের ইদংবৃত্তির আদিম বিষয়। আদিম বিষয় না বলিয়া মূলতম বিষয় বলিলে আরো ঠিক্ হয়—কেননা আমাদের এখানকার কালিক বিচার ঈশ্বরের মহান্ সৃষ্টি ব্যাপারের সহিত সংলগ্ন হয় না। শুদ্ধ সত্ত্ব—ঈশ্বরের ইদংবৃত্তিরই বিষয়, সুতরাং তাহা নিয়ম্য এবং পরমাত্মা তাহার নিয়ামক; মলিন সত্ত্ব (অর্থাৎ আমাদের মন) সেই শুদ্ধ সত্ত্বেরই প্রতিকৃতি, এবং জীবাত্মা পরমাত্মারই প্রতিকৃতি; সুতরাং মলিন সত্ত্ব নিয়ম্য এবং জীবাত্মা তাহার নিয়ামক। ঈশ্বরের নিয়ম্য ইদংবৃত্তিকে এবং তাঁহার সঙ্গে তাঁহার নিয়ামিকা শক্তিকে ঈশ্বর হইতে পৃথক্ করিয়া শুদ্ধ কেবল তাঁহার অহংবৃত্তির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে যাহা পাওয়া যায়, জীবের নিয়ম্য ইদংবৃত্তিকে এবং তাহার সঙ্গে তাহার নিয়ামিকা শক্তিকে জীব হইতে পৃথক্ করিয়া শুদ্ধ কেবল তাহার অহংবৃত্তির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে, অবশ্য তাহাই পাওয়া যায়; কিন্তু সে যাহা পাওয়া যায়—তাহা এখন অর্থ-শূন্য পদ যাহার কেবল একটি নাম শুদ্ধ—অর্থাৎ যাহা আকাশ-কুসুম অপেক্ষাও অসম্ভব বস্তু। ঈশ্বরের সহিত জীবের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা পরিষ্কার রূপে বুঝিতে হইলে ঈশ্বরের ঐশী শক্তি এবং জীবের ক্ষুদ্র শক্তির মধ্যে—ঈশ্বরের পরিপূর্ণ আনন্দময় শুদ্ধ সত্ত্ব এবং জীবের সুখ দুঃখ-মোহাক্রান্ত মনের মধ্যে—কিরূপ আকাশ-পাতাল প্রভেদ তাহা হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। ঈশ্বরের ইদংবৃত্তি মূল আদর্শ, আমাদের ইদংবৃত্তি তাহার অনুলিপি মাত্র। ঈশ্বর সংসারের পরপারে থাকিয়া যেরূপ লেখা লিখিতেছেন, আমরা সংসারের এ পারে থাকিয়া তাহারই দাগা বুলাইতেছি। বিজ্ঞান-বিৎ পণ্ডিতেরা ঈশ্বরের চিন্তা হইতেই চিন্তা শিক্ষা করেন, কবিরা ঈশ্বরের রচনা হইতেই রচনা শিক্ষা করেন, মনীষী মহাত্মারা ঈশ্বরের ঐশীশক্তি হইতেই ঈশিতা এবং বশিতা শিক্ষা করেন। ঈশ্বরের ঐশীশক্তিই মূল শক্তি, তাঁহার ইদংবৃত্তিই মূল ইদংবৃত্তি,—তাহার জন্য ঈশ্বর অন্য কাহারো নিকট ঋণী নহেন। তাহা

সর্ব্বাংশে তাঁহার আপনার, এজন্য তাহা সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার কর্তৃত্বাধীন। আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি সম্যক্‌রূপে আমাদের অধীন না হওয়াতে আমরা কখনো বা দুঃখে, কখনও বা মোহে, আক্রান্ত হই, এবং আমাদের শক্তির অপূর্ণতাবশতঃ—তাহা অতিক্রম করিতে কখনও বা পারি, কখনো বা পারি না। পরমাত্মার ইন্দ্রিয়বৃত্তি তাঁহার সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন সুতরাং তিনি পরিপূর্ণ আনন্দময়। যে ব্যক্তি যত তাহার পরাধীন ইন্দ্রিয়গ্রামকে (অর্থাৎ মনোবৃত্তিকে) সংযত করিয়া ঈশ্বরের ভাবে ভাবুক হয়, সে ব্যক্তির আত্মাতে ততই ঐশী শক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাহার সদ্বৃত্তিগুলিকে দ্বিগুণিত করিয়া তোলে। মনুষ্য যতই ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ এবং ভক্তিমান্ হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার অনুগত হয়, ততই তাহার নিয়ামক শক্তি প্রবর্দ্ধিত হয়; ততই সে তাহার ইন্দ্রিয়বৃত্তির উপর কর্তৃত্ব লাভ করে, ততই সে দুঃখ এবং মোহের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আনন্দামৃত উপভোগ করে। কিন্তু মনুষ্য যতই উৎকর্ষ লাভ করুক না কেন, ঈশ্বর তাহা অপেক্ষাও অনন্তগুণে উৎকৃষ্ট; এজন্য মনুষ্যের নিজের আত্মোৎকর্ষ মনুষ্যের চরম লক্ষ্যের উপযুক্ত নহে, এক কথায়—চরম আদর্শ নহে। ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতিই সাধকের মুখ্য লক্ষ্য, তাহার আপনার উৎকর্ষ তাহার আনুষঙ্গিক উপলক্ষ। সেই মুখ্য লক্ষ্যের সাধনই মনুষ্যের সর্ব্বোচ্চ কার্য্য; মনুষ্যের আত্মার উৎকর্ষ যাহা সেই লক্ষ্য-সাধনের অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহাও সেই লক্ষ্যেরই উচ্চতর সাধনের সহায় বলিয়া সমধিক প্রার্থনীয়। ঈশ্বর আমাদের আত্মার উৎকর্ষের জন্য নহেন, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধনের জন্যই আত্মার উৎকর্ষ সাধন, এইরূপ হইলেই সাধক ঠিক্ পথে দাঁড়ায়। নিষ্কাম ঈশ্বর প্রীতিই মনুষ্য জীবনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ।

ব্রাহ্মসমাজ ও অক্ষয়কুমার দত্ত।

আমরা সম্প্রতি মৃত অক্ষয়কুমার দত্তের একখানি জীবনচরিত দেখিলাম। পুস্তক তাঁহার জীবদ্দশায় রচিত [illegible] উপকরণ তাঁহারই প্রদত্ত; [illegible] সত্যের সহিত [illegible] নাই [illegible]। কিন্তু দেখিলাম, [illegible] ভ্রম [illegible] এস্থলে [illegible] হইল। [illegible] উপাহার [illegible] নাই। ব্রাহ্মসমাজের সহিত যখন অক্ষয় [illegible] যোগ ছিল, তখন তাঁহার জীবনী আমরা [illegible] সম্পূর্ণ একটা আশা রাখি। না দিবার গূঢ় কারণ যাহাই হউক কিন্তু [illegible]। ক্রমে আমরা তাঁহার জীবনচরিত দেখিলাম। পাঠ করিয়া এই জন্য বিস্মিত হইলাম যে যখন অক্ষয় বাবু নিজে ইহার উপকরণ দিয়াছেন, তখন এরূপ ভ্রম প্রমাদ ইহার ভিতর কি রূপে স্থান পাইল। ফলত ইহাতে অক্ষয় বাবুর সম্পূর্ণ সাহায্য আছে বলিয়া এই গ্রন্থপাঠে আমাদের প্রয়াস এবং ইহার ভ্রান্তি প্রদর্শনে আমাদের এই প্রস্তাবের অবতারণা। কিন্তু এই গ্রন্থে ভ্রমের সংখ্যা অল্প নয়। সকল ভ্রম দেখাইতে আমাদের সময় নাই, আবশ্যকও নাই। কোনও মহাত্মার জীবন চরিতের সহিত ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তের বিশেষ সংযোগ আছে। যখন তাহা প্রকাশ হইবে, তাহা দ্বারা আলোচ্য গ্রন্থের দোষগুলি লোকে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। আমরা আপাতত কএকটা স্থূল স্থূল বিষয়ের ভ্রান্তি দেখাইয়া ক্ষান্ত হইব।

অক্ষয়কুমারের চরিতাখ্যায়ক বলিয়াছেন, শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বৈদান্তিক ছিলেন এবং তিনি বেদের অভ্রান্তিতা স্বীকার করিতেন। তাঁহার মতেই সমাজের সকলের মত। কারণ তিনিই সকল বিষয়ের কর্তা। অক্ষয় বাবু যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হন, তখন সর্ব্বাগ্রে সমাজের ধর্ম্মমত অবিশুদ্ধ দেখিয়া মনে করিলেন, শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রান্তি দূর করিতে পারিলেই সমাজের ভ্রান্তি দূর করা হইবে। এই মনে করিয়া অক্ষয় বাবু কিছু কাল ধরিয়া তাঁহার সহিত তর্ক বিতর্ক করেন এবং বৈদান্তিক ধর্ম্মে ও বেদে ভ্রান্তি প্রদর্শন করেন।

চরিতাখ্যায়ক এই কথা লইয়া অক্ষয় বাবুর খুব গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা পাইয়াছেন কিন্তু ইহার ভিতর সত্য কি তাহার কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। এস্থলে আমরা তাহাই বলিতেছি শুনুন। কোনও একটী আকস্মিক ঘটনায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে এক সময় ঘোর একটী ঔদাস্যের ভাব উপস্থিত হয়। তন্নিবন্ধন তিনি পার্থিব সুখে অতৃপ্ত হইয়া কিছুকাল নির্জনে ধর্ম্মানুসন্ধান করেন এবং স্বচেষ্টায় আত্মার মধ্যে তাহার অনন্ত উৎস দেখিতে পান। তখনও ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার সংযোগ ঘটে নাই এবং তথাকার ধর্ম্মই বা কি তাহারও কিছু জানেন না। একদা তিনি বাড়ির মধ্যে বসিয়া আছেন এমন সময় একটা পুথির পাতা বায়ুবেগে ওলট পালট খাইয়া তাঁহার সম্মুখ দিয়া যায়। ঔৎসুক্য বশত তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ কোন অধিকার জন্মে নাই। সুতরাং ঐ পত্রে কি লেখা আছে, তাহা বুঝিবার জন্য সুপণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে ডাকেন এবং বিদ্যাবাগীশ আসিয়া তাহা ব্যাখ্যা করেন। ঐ পত্র ঈশোপনিষদের প্রারম্ভ। শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার দুই একটী মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিবামাত্র এই জন্য বিস্মিত হইলেন যে তিনি স্বচেষ্টায় যেরূপ ঈশ্বরের স্বরূপ অবধারণ করিয়াছেন, এই গ্রন্থে সুস্পষ্ট তাহাই আছে। তখন রত্ন অনুসন্ধিৎসুর রত্নের খনি-লাভের আনন্দ উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন, বেদের অন্তভাগে যখন এই, না জানি সমস্ত বেদে কি অমূল্য পদার্থ আছে। এইরূপ অনুরাগ ও আগ্রহে সমস্ত বেদ জানিতে তাঁহার ইচ্ছা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি ব্যয়ভার স্বীকার করিয়া কয়েকটী লোককে সমস্ত বেদ পড়িবার জন্য কাশীধামে পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং ও শিক্ষার সাহায্যে ঐ সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু কাল অতিবাহিত হইয়া যায় এবং ঐ সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ ও অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত তাঁহার সংযোগ হয়। তখন সমাজ মধ্যে লোকের বেদের নিত্যতায় বিশ্বাস ও বৈদান্তিক ধর্ম্ম অবলম্বনীয় ছিল। এই বিশ্বাস ও এই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের মূল রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রস্তাবে তাঁহার বাক্যে এই বিষয় সপ্রমাণ করিয়াছি। অতঃপর এই বেদ ও বেদান্ত লইয়া শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত অক্ষয়কুমার দত্তের তুমুল তর্ক উপস্থিত হয়। আমরা ইতি পূর্ব্বেই বলিলাম শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশোপনিষদে আপনার সহজ বিশ্বাসের প্রতিচ্ছায়া পাইয়া বেদ ও বেদান্তে একটী অটল শ্রদ্ধা স্থাপন করেন। সমগ্র বেদে যে কত অমৃত আছে, তাহা পান করিবার জন্য ঐ ধর্ম্ম-পিপাসুর একটা প্রাণের পিপাসা হয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বেদের উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধার আরও দুইটী কারণ ছিল। প্রথম, স্বদেশানুরাগ। বেদ এদেশের সর্ব্ব

পূজ্য ও সর্ব্বপ্রাচীন পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্র। স্মরণাতীত কাল হইতে কোটি কোটি লোক যাহার নামে মস্তক অবনত করে, দিবসের প্রারম্ভ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে সমগ্র না হউক অন্তত যাহার একটী মন্ত্র ভক্তির সহিত উচ্চারণ না করিয়া এই বিশাল রাজ্যের কোটি কোটি লোক আজিও জীবন-ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয় না। ভারতের ধর্ম্ম-সংস্থাপক ও ধর্ম্ম-রক্ষক ব্রাহ্মণের বংশে জন্মিয়া শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বভাবতই সেই বেদ রক্ষার্থ একটী অন্তরের যত্ন দাঁড়াইয়া ছিল। দ্বিতীয়ত তিনি মনে করিয়াছিলেন, রাগ দ্বেষ শূন্য সহজ জ্ঞানে যে ধর্ম্মের অনুমিতি হয়, যদি সমগ্র বেদে তাহাই পাই, তবে তো এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের আর কোনও অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে না। কারণ বেদ সকলেরই পূজ্য ও শিরোধার্য্য। একজন ধর্ম্মপ্রাণ ও বিচক্ষণ লোকের ধর্ম্মসংস্কার ও ধর্ম্মপ্রচারে যেরূপ প্রণালী আশ্রয় করা উচিত, শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু অক্ষয় বাবুর প্রকৃতি স্বতন্ত্র। তিনি পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত। এখনকার অনেক পাশ্চাত্য জ্ঞানাভিমানীর ন্যায় তাঁহারও না জানিয়া ও না পড়িয়া বেদে একটী ঘোর বিদ্বেষ ছিল। তাঁহার প্রাণগত ইচ্ছা যে তিনি ব্রাহ্মসমাজকে পাশ্চাত্য বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্র করিয়া তুলেন। কিন্তু বেদ তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাতক। এই বেদকে বহিষ্কৃত করিবার জন্য শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার ব্যাপক কাল তর্ক হয়। এক জন খনী খনন করিতে গিয়া তন্মধ্যগত রত্নপ্রভায় মোহিত ও রত্নোদ্ধারে কৃতপ্রযত্ন, এবং আর একজন তন্মধ্যে রত্ন দেখিলেন না, তৎসত্তায়ও বিশ্বাস করিলেন না, তিনি কেবল দূরে থাকিয়া তাহাকে খনি প্রবেশে নিষেধ করিতেছেন; এই স্থূল তর্কের এই টুকুই রহস্য। ফলত এই তর্ক দ্বারা নয় কিন্তু নিজের আলোচনায় এবং বারাণসী হইতে প্রত্যাগত বেদজ্ঞদিগের বেদ ব্যাখ্যায় শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বুঝিলেন, কর্ম্ম ও জ্ঞান এই উভয় কাণ্ডাত্মক বেদের সমগ্র নয় কেবল সত্য জ্ঞানই লোকের মুক্তির জন্য প্রচার করা আবশ্যক। তখন বহু দিনের নির্জ্জন চিন্তায় সহজ জ্ঞানে তাঁহার যে ধর্ম্মের অনুমিতি হইয়াছিল, তিনি উপনিষদ হইতে তাহারই অনুকূল মন্ত্র সকল অমৃতময় ভাষায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত সঙ্কলিত মন্ত্রই বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের জ্ঞান কাণ্ড।

এইরূপে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল স্বদেশানুরাগ ও অটল ধর্ম্ম-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে বেদ বেদান্তের মর্য্যাদা রক্ষা করেন এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ হইতে এতৎ সংক্রান্ত যে সমস্ত ভ্রান্ত সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছিল, আত্মতত্ত্ব বিদ্যা নামক পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা দ্বারা তাহা অল্পে অল্পে দূর করিয়া দেন। পাশ্চাত্য-জ্ঞান-দৃপ্ত অক্ষয়কুমার এইরূপে যদিও ভগ্ন-মনোরথ হইলেন কিন্তু এখনও তিনি নিরস্ত হন নাই। তিনি উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্র লইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠিত বেদোক্ত মন্ত্রে ব্রহ্মোপাসনার উপর আক্রমণ করিলেন। কি ভয়ানক আসুরিক বেদ-বিদ্বেষ! কিন্তু যে বেদোক্ত স্তুতি ও গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা যুগ যুগান্তের ঋষিগণ ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মলাভ করিয়াছেন, এই ভারতের রক্তে প্রতিপালিত হইয়া জানি না কোন্ ধর্ম্মকাম হৃদয়বান্ ব্যক্তির তাহার প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি জন্মিতে পারে। আমরা পূর্ব্বতন ঋষিদিগের তুলনায় সাধন-বিহীন ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতর। আমরা সেই অচিন্ত্যরূপ ব্রহ্মকে নূতন কি আর বলিব, কি স্তব করিব, তবে যদি ঋষিদিগের সেই পবিত্র

উচ্ছ্বাসে আপনার উচ্ছ্বাস কথঞ্চিৎ মিশাইতে পারি, এইটুকুই আমাদিগের পরম লাভ। আমরা ব্রহ্মস্তুতি ও ব্রহ্মপূজার সম্বন্ধে এই মাত্রই বুঝি। কিন্তু অক্ষয়কুমারের তাহা সহিত না। তিনি বেদমন্ত্রের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মসমাজে কেবল বাঙ্গালা ভাষায় নির্জীব উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে বহু আয়াসেও কৃতকার্য্য হন নাই। আশ্চর্য্য যে সমস্ত বেদমন্ত্রে প্রাচীন নিরাকাঙ্ক্ষ ও নিঃসঙ্গ লোকদিগের ধর্ম্মভাব জ্বলৎ ও জীবন্ত অক্ষরে প্রস্ফুটিত, যে সমস্ত মন্ত্র কোটি কোটি সাধককে পৃথিবীর পাপ তাপ জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্তির পথে লইয়া গিয়াছে, যে সমস্ত মন্ত্র যুগযুগান্তের নানা রূপ ভাব-সংস্রবে কবি-হৃদয়ের একটী স্পৃহনীয় পদার্থ হইয়া আছে; জানি না, যাঁহারা কঠোরতার বলে পুরুষার্থ লাভে ব্রতী তাঁহারা আজ কি জন্য সেই সমস্ত বেদমন্ত্র অল্লায়াসে বোধ-সুলভ করিতেও কাতর। ফলত এই বিষয় যত চিন্তা করি, ততই ইহা দ্বারা আধুনিক লোকের স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-স্নেহের একান্ত অভাবেরই পরিচয় পাই।

উপরে যাহা প্রদর্শন করিলাম, চরিতাখ্যায়ক বুঝিবেন, ইহাতে অক্ষয়কুমারের কিছুমাত্র বিজয়ীর গৌরব নাই। ফলত শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই ব্রাহ্মসমাজকে এই সমস্ত মহা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এই সূত্র ধরিয়া আজ কাল অনেক ব্রাহ্ম প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই ব্রাহ্ম ধর্ম্মে হিন্দু সঙ্কীর্ণতা আনিয়াছেন। হিন্দু সঙ্কীর্ণতা নামে এই যে একটী ইঙ্গবঙ্গীয় কথা, ইহার যে প্রকৃত অর্থ কি, কি উদ্দেশে যে ইহা প্রযুক্ত, আমরা ঠিক তাহা বুঝিতে পারি না। এমন হইতে পারে, এখন যেরূপ কোরাণ বাইবেল প্রভৃতির সত্য লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের একটা ব্যাপকতা প্রদর্শিত হইয়া থাকে, শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহা দেখান না। বোধ হয় এই অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে যে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে হিন্দুসঙ্কীর্ণতা আনিয়াছেন। কিন্তু আমরা এ কথারও অর্থ বঝি না। কারণ প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম বর্ত্তমান প্রচলিত যে একটি ধর্ম্ম অপেক্ষা অসংখ্য গুণে উদার। ইহা কোন ধর্ম্মকেই দ্বেষ করে না। তবে তুমি বলিতে পার, ইহা যদি অন্য ধর্ম্মের বিদ্বেষী নয়, তবে অন্য ধর্ম্মের সত্য ইহার নিকট আদরণীয় হয় নাই কেন। এইটী তোমার খুব বুঝিবার ভুল। অন্য ধর্ম্মের সত্য হিন্দুধর্ম্মে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণ বেদদ্বেষী ধর্ম্ম। কিন্তু যখন বৌদ্ধাচার্য্যেরা হিন্দু দার্শনিকদিগের নিকট পরাস্ত হয়, যখন এ দেশে ঐ ধর্ম্মের উচ্ছেদ-দশা উপস্থিত, সেই সময় বৌদ্ধধর্ম্মের সত্য প্রচুর পরিমাণে হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে। এ বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মের দ্বার অতি উদার। তবে তুমি বলিতে পার, ভিন্ন দেশীয় ধর্ম্মের সত্য ইহাতে নাই কেন। এ বিষয়েও আমার উত্তর আছে। যখন হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়-কাল, তখন পৃথিবীতে কোন ধর্ম্মেরই সৃষ্টি হয় নাই। যদি তখন আর কোন উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম থাকিত এবং তাহার সত্য যদি গ্রহণ-যোগ্য হইত, তাহা হইলে এই ধর্ম্ম যে তাহা লইত না, ইহা তোমাকে কে বলিল। আমি এ কথা প্রমাণ নিরপেক্ষ হইয়া বলিতেছি না। দেখ, ষড়ঙ্গ বেদের জ্যোতিষ একটী অঙ্গ। হিন্দুরা এই অঙ্গ পুষ্টির নিমিত্ত কোন রোমকাচার্য্যের নিকট অনেক জ্যোতিষিক সত্য গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা দ্বারাই বোধ হয়, যদি তৎকালে আর কোন ধর্ম্ম থাকিত তাহার সত্য গ্রহণ করা হিন্দুধর্ম্মের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। আমরা এ কথার প্রসঙ্গ করি-

তেছি, ইহা অনৈতিহাসিক কালের কথা। সেই সময় হিন্দুধর্ম্মের কি হইয়াছিল, না হইয়াছিল, সকলটা জানিবার জো নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বোধ হয়, যে জাতি বহির্ব্যাপারে একরূপ বিমুখ হইয়া কেবল আত্মোন্নতিকেই জীবনের সার জ্ঞান করিয়াছিল, সেই জাতি যে কোন স্থানেই সত্য থাক্ না তাহার যে অসমাদর করিবে, ইহা কিছুতেই সম্ভব মনে হয় না। ফলত এ বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মের দ্বার খুব উন্মুক্ত ছিল। উহা এইরূপ উদার বলিয়াই গীতাশ্রুতির জন্ম এবং তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছে, যে যেরূপে ঈশ্বরকে ভজনা করে, ঈশ্বর সেইরূপেই তাহাকে অনুগ্রহ করিবেন; কারণ কেহই তাঁহার পথ ব্যতীত অন্য দিকে যায় না। এইটুকু হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বতোমুখী উদারতার ভাব। কিন্তু প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম্ম প্রাণান্তেও এরূপ বলিতে পারে না। সেই সমস্ত ধর্ম্মের মর্ম্ম কথা এই, তুমি আমার আশ্রয়ে আইস, তবেই তোমার মুক্তি। এতদ্ব্যতীত এই হিন্দু ধর্ম্মের বীজমন্ত্র সর্ব্বত্রে সাম্য। এখন তুমি বলিতে পার তবে হিন্দুর মধ্যে এত জাতি বিদ্বেষ কেন। আমি বলিব এইটী তোমার বুঝিবার ভুল। হিন্দুধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উদার কিন্তু ইহার যা কিছু নিরোধের ব্যাপার, তাহা আচারে। হিন্দুরা ধর্ম্মসাধনের জন্য অতি [illegible]তার সহিত আচারকে রক্ষা করিয়া থাকে। [illegible] গো-মাংস প্রভৃতি দ্রব্য শারীরিক [illegible]বুদ্ধির কারণ। ইহা দ্বারা আত্ম-সংযমের ব্যাঘাত ঘটে। এই জন্য হিন্দুর শাস্ত্রোক্ত এই সকল নিষেধ মানিয়া চলা আবশ্যক। যে জাতিতে এই সমস্ত দ্রব্যের ব্যবহার, ইহারা তাহাকে ম্লেচ্ছ বা ভ্রষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করে এবং কখন কালে কোন [illegible] তাহাদের সহিত মিশে না। এই যে একটুকু বিদ্বেষের ভাব, ইহা জাতিগত নয়, জাতির আচারগত। তোমরা হিন্দুধর্ম্মের এই অংশকে সঙ্কীর্ণতা বলিতে চাও বল কিন্তু আমরা তাহা বলি না। যাহা দেশের জল বায়ুর অবস্থাভেদে ধর্ম্মসাধনের জন্য একান্ত অপরিহার্য্য আমরা তাহাকে সঙ্কীর্ণতা বলিতে পারি না। যাই হউক, হিন্দুরা বহু পূর্ব্বাবধি সকল জাতি হইতে যে একটা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া আছে, এই আচারই তাহার মুখ্য কারণ। কিন্তু যে নদী বিশাল বক্ষে বহু কাল হইতে সমুদ্রের অভিমুখে চলিয়াছে, সংস্কার না থাকিলে কালক্রমে তাহারও কোন কোন স্থান সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। আমরা এই হিন্দু আচার সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহা অতীতের। কিন্তু হিন্দুর হস্তে যখন রাজ নিয়ম নাই, ইহাদের মধ্যে যখন সংস্কারও নাই, তখন বর্ত্তমানে এই আচারে যে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণতা দাঁড়াইবে ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহার মুল নিয়ম নির্দ্দোষ। স্বদেশানুরাগী স্বজাতি-বৎসল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্মকে সর্ব্বাংশে সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা এইরূপ উদার দেখিয়া একমাত্র তাহারই সত্যে বিশ্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম্মকে পুষ্ট করিয়াছেন। এই সূত্রটুকু ধরিয়া যে তোমরা বল তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে হিন্দু সঙ্কীর্ণতা আনিয়াছেন ইহা তোমাদিগের হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি না জানার পরিচয়। এস্থলে আরও একটু কথা আছে। পূর্ব্বের অনৈতিহাসিক কালের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছি যে যখন হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়, সে সময় যদি কোনও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম থাকিত এবং তাহার সত্য যদি গ্রহণ-যোগ্য হইত, তাহা হইলে সেই সত্যে হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গপুষ্ট হওয়া অসম্ভব ছিল না। এইটুকু হিন্দুধর্ম্মের উদার প্রকৃতির পরিচয়। কিন্তু ফল কথা, হিন্দুর আত্মোন্নতির জন্য সত্য গ্রহণের আবশ্যকতা ছিল না এবং এখনও নাই। কারণ ঋষিরা

যেরূপ সাধনায় সত্য লাভ করিয়াছিলেন পৃথিবীর অন্য কোন জাতি কি সেরূপ সাধনায় কখন সত্যের আরাধনা করিয়াছিল? এতদ্দেশের সেই বিশেষ অবস্থায় যে সমস্ত উজ্জ্বল সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার তুলনায় সকল দেশের সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্য কি নিতান্ত নিষ্প্রভ নয়? উপনিষদের তুল্য ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদক গ্রন্থ কি আর আছে? তবে বাহিরে হস্ত প্রসারণের আবশ্যকতা কি? গৃহে মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণা কিন্তু জঠরজ্বালা নিবারণের জন্য অন্যের দ্বারে ভিক্ষা, ইহা কিরূপ উদারতা। শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বুঝিয়াই ভিন্ন জাতীয় ধর্ম্ম গ্রন্থের সত্যে একটা আকাঙ্ক্ষা রাখেন নাই। তবে তোমরা বলিতে পার ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন সাম্প্রদায়িক নয়, ইহা বিশ্বজনীন ধর্ম্ম, তখন সকল জাতির সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্য ইহাতে সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এবিষয়েও আমাদের বক্তব্য আছে। মুক্তির নিমিত্ত জ্ঞান ও ভক্তি দুইই চাই। জ্ঞানের উজ্জ্বল ও অক্ষয় ভাণ্ডার বেদ বেদান্ত। আর ভক্তি আমার পুরুষকার-সাধ্য। আমার চেষ্টা থাকিলেই তাহা হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় পরশস্য সংগ্রহ করা ধর্ম্মের একটা ব্যবসাদারি ভিন্ন আর কিছুই নয়। তবে তোমরা বলিতে পার, পৃথিবীর সকল জাতিকে ব্রাহ্মধর্ম্মে আকর্ষণ করা আমাদের লক্ষ্য। এই জন্য সকল জাতির সকল ধর্ম্ম গ্রন্থের সত্য সংগ্রহ ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশেষ প্রয়োজন। প্রত্যুত্তরে আমি বলিব, আবার যদি বুদ্ধ বা চৈতন্যের ন্যায় একজন চরিত্রবান লোক জন্মেন, তবে তাঁহার মুখে সকল জাতিকে [illegible] করিবার এই একটা দম্ভের কথা শোভা পায়; কিন্তু [illegible] তোমরা স্বগৃহে [illegible], ভ্রাতা[illegible] পারিলে না, তোমাদের মুখে [illegible] কথা আর শোভা পায় না। এখন স্বদেশের অসংখ্য লোক প্রকৃত ধর্ম্মের অভাবে হাহাকার করিতেছে। আগে তাহাদিগকে শান্ত কর, পরে বিদেশ। কিন্তু বলিতে কি, তোমরা নানা উপকরণে ধর্ম্মের যে এক অদ্ভুত খিচুড়ি পাকাইয়াছ, তাহার নামে স্বদেশের লোক তাহার ত্রিসীমায় আসিতে চায় না। হায় এই কি তোমাদের স্বদেশানুরাগ।

যাক্, এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ আবশ্যক। চরিতাখ্যায়ক বলিয়াছেন; একবার, জগদ্বন্ধু পত্রিকায় বেদ অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র নয়, এই কথা লেখা হইয়াছিল। অক্ষয় বাবু তাহার প্রতিবাদে অস্বীকার করাতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সেই মত খণ্ডন করেন। জগদ্বন্ধু পত্রিকায় যে কি লেখা হইয়াছিল, এখন তাহা জানিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমরা চরিতাখ্যায়কের নির্দেশ ক্রমে তত্ত্ববোধিনীর প্রত্যুত্তর পাঠ করিয়া দেখিলাম। এ বিষয়ে যাহা বক্তব্য, তাহা পরে বলিতেছি; কিন্তু অগ্রে জিজ্ঞাস্য, জগদ্বন্ধু পত্রিকার প্রতিবাদ যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর করিয়াছিলেন, এ কথার মুল কি? চরিতাখ্যায়ক, বলিবেন, ইহা অক্ষয় বাবুর মুখের কথা। কিন্তু চরিতাখ্যায়ক জানিবেন, মুখের কথা যথা তথা খাটে না। প্রামাণিক কাল, প্রমাণ অপেক্ষা করে। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ লোকের মনে বেদান্ত ও বেদসংক্রান্ত একটা ভ্রান্ত সংস্কার বদ্ধমুল করিয়া যান। শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাজে যোগ দিয়া ক্রমশ সেই সংস্কার দুর করিয়াছিলেন। কিন্তু চরিতাখ্যায়কের বাক্য-প্রমাণে জগদ্বন্ধু পত্রিকায় কস্যচিৎ জিজ্ঞাসোঃ [illegible] প্রত্যুত্তরে তত্ত্ববোধিনীতে [illegible] লেখা হইয়াছিল; যদি তাহা

শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে তাহাতেও বিশেষ দোষ দেখিতেছি না। ফলত জগদ্বন্ধু পত্রিকায় লিখিত অংশের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া চরিতাখ্যায়ক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভ্রান্ত বলিবার বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছেন। কিন্তু চরিতাখ্যায়ক দেখুন, জগদ্বন্ধু পত্রিকার প্রত্যুত্তরে কি বলা হইয়াছে। ইহাতে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সার এই—পরমেশ্বর মনুষ্য মাত্রেরই মনে সামান্যত ধর্ম্মজ্ঞানের সামর্থ প্রদান করিয়াছেন কিন্তু মোহ বা ভ্রান্তিবশতঃ তাহা কদাপি আচ্ছন্ন হয়; সকল সময়ে জ্ঞানের প্রকৃত স্ফূর্ত্তি হয় না। এই সময় মহাজনের বাক্য বিশেষ ফলোপধায়ক হইয়া থাকে। এই মহাজনকে তপস্বী ঋষিই বল বা বেদান্তের ব্রহ্মাই বল, তাঁহার কথিত বাক্য বা বেদ দীপবৎ মোহান্ধকার দূর করিয়া দেয়। এই প্রতিবাদের উপসংহারে এই একটী কথাও আছে—পক্ষপাত ও মোহশূন্য হইয়া বেদ-জ্ঞানকে আলোচনা করিলে তন্মধ্যে যুক্তি-সাধ্য সমুদায় বিষয় আমাদিগের বুদ্ধিনিষ্পন্ন সিদ্ধান্তের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হয়। এই প্রকার প্রত্যুত্তরে যে কি দোষ, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ইহা অতি স্পষ্ট কথা যে সকলেরই হৃদয়ে ধর্ম্ম বুঝিবার শক্তি আছে, কিন্তু অবস্থা ও শিক্ষার দোষে সকলের এই শক্তির প্রকৃত স্ফূর্ত্তি হয় না। এই জন্য ঋষিবাক্য স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহা আমাদের বুদ্ধিনিষ্পন্ন সিদ্ধান্তের সহিত ঐক্য করিয়া লওয়া আবশ্যক। চরিতাখ্যায়ক দেখিবেন, ইহাতে বেদের দাসত্ব করিবার কোন কথা বলা হয় নাই। ধর্ম্মে মনুষ্য-বুদ্ধিরই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার দেওয়া হইয়াছে। আর ঐ প্রত্যুত্তরে যে ব্রহ্মা শব্দ আছে তাহার টিপ্পণীতে ব্রহ্মা শব্দে ঈশ্বরের গুণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা দর্শনতত্ত্বদিগকে এই কথার ইঙ্গিত করা হইল যে প্রকৃতি ঈশ্বরের গুণ বা শক্তি। বেদান্তে তাহাই [illegible] ব্রহ্মানামে অভিহিত আছে। এই [illegible] অন্তর্দৃষ্টি ভেদে দুই প্রকার। ব্রহ্মাতে প্রথম বেদের আবির্ভাব ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য এই মনুষ্যের ধর্ম্ম-বোধ এই প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হয়। এখন চরিতাখ্যায়ক [illegible] দেখুন তিনি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণের দ্বারা শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভ্রান্ত বলিয়া স্থির করিতে চান, তাহার বল কতদূর।

চরিতাখ্যায়ক [illegible] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সাধারণের নিকট [illegible] প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা যে নিতান্ত অমূলক, এই স্থলে তাহার একটী সজোর প্রমাণ দেই। এবং ইহা [illegible] সপ্রমাণ হইবে যে অক্ষয় বাবু দ্বারা সমাজ হইতে বেদ-সংক্রান্ত ভ্রান্ত সংস্কার অপনীত হয় নাই। সজীব প্রমাণ ভক্তিভাজন বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বাবু। তিনি এক সময় এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

But we cannot approve of the length to which the thick and thin panegyrists of Akshoya Babu are going in their praise of those services. They say that he was the sole cause of the abandonment by the Somaj of the erroneous doctrine of the infallibility of the Vedas. Now the old Brahmos did not believe the revelation of the Vedas as they represent them to have done. We quote in support of our assertion the following passages from the Vedantic Doctrines Vindicated:

"The Vedas having existed from a time when Indian literature and, indeed, all literatures were only (as it were) in a state of germination, it is impossible to prove the divine origin of these sacred works by any historical testimonies, the value of which was not understood all the time, or indeed, by any other evidence than what they themselves afford

by the drift and tendency, the *reasonableness and cogency* of the doctrines taught in them."

"The only ground on which the truth of any system of belief can be maintained is that founded on the nature of the doctrines inculcated by it.

If the doctrines of theology and the principles of morality taught in the sacred volumes referred to appear to be consonant to the dictates of sound reason and wisdom, if those tenets and precepts carry the unmistakable character of truth in them the man who has received them and continues to place his trust in them, will have no reason to fear the vituperative surmises of ungodliness in respect to his religion.

"The knowledge derived from the sources of inspiration deals with eternal truths, which require no other proof than what the whole creation and the mind of man unperverted by fallacious reasonings afford in abundance."

The above passages are quoted from the very pamphlet, in which the revelation of the Vedas is principally maintained. We quote another passage from a work published by a Christian Missionary no testimony can be more strong than this one afforded by the missionary of another religion

Though the Brahmos claim the Vedas as a revelation of divine truth, they look primarily upon the works of nature as their religious teacher. From nature they learned first and because the Vedas, as they assert agree with nature, therefore they regard them as inspired. Rev. Mullen's Essay on Vedantism Brahmoism and Christianity.

Now it was certainly not a heroic feat on the part of Akshay Babu to induce people whose opinions were so lax with respect to the authority of the Vedas as a revelation to reject the doctrine of their infallibility.

চরিতাখ্যায়ক আর এক স্থলে বলিয়াছেন শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সময় স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা ঈশ্বরারাধনার বিধি দেন এবং শ্রীধর ন্যায়রত্ন দ্বারা কাঁচড়াপাড়ার কোন এক বৈদ্য পরিবারে তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ করান। প্রকৃত কথা এই। একদা শ্রীধর ন্যায়রত্ন আসিয়া তাঁহাকে কহেন, কাঁচড়াপাড়ার কোন বৈদ্য পরিবারের কোন কোন স্ত্রীলোক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রণালী-ক্রমে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে অসমর্থ। তাঁহাদিগকে আমি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিতে বিধি দিয়াছি। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন যে অশিক্ষিত স্ত্রীদিগের পক্ষে নিরীশ্বর ও উপাসনা-শূন্য হইয়া থাকা অপেক্ষা হৃদয়ের ভক্তি ভরে পুষ্প-চন্দনাদি দ্বারা ব্রহ্মের পূজা করাও বরং ভাল। প্রকৃত কথা এই মাত্র। চরিতাখ্যায়ক বুঝিবেন ইহাতে ব্রাহ্মসমাজে ফুল চন্দন ও নৈবেদ্যের ছড়াছড়ি করার কোনও প্রসঙ্গ হয় নাই। অক্ষয় বাবু ইহার যে কি নিবারণ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

চরিতাখ্যায়ক আর এক স্থলে এই ভাবের একটী বলিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজের যা কিছু আধ্যাত্মিক সংস্কার সমস্তই কেবল অক্ষয় বাবুর বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে সাধিত হয়। প্রত্যুত্তরে ইচ্ছা না থাকিলেও কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা একটী কঠোর কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। অক্ষয় বাবুর যখন ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংযোগ, তখন হইতেই তাঁহার ভাবে ও কার্য্যে তিনি ইংরাজীতে যাহাকে বলে সংশয়বাদী তাহাই ছিলেন। পুরাতন তত্ত্ববোধিনীর প্রতি পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখ, যতগুলি তাঁহার রচিত ব্রহ্মস্তোত্র আছে তাহাতে কেবল 'নবকিসলয়োদ্বেলিত' প্রভৃতি ললিত পদবিন্যাসের ঘটা পাইবে কিন্তু কুত্রাপি গভীর হৃদয়ের সৌন্দর্য্য ও সৌরভ নাই। তিনি কখন ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে বিশ্বাস করেন, কখন নাও করেন। কখন প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার করেন, কখন নাও করেন*। এইরূপ ভাব ও

* আমরা এই সম্বন্ধে [illegible] জীবন চরিত হইতে একটী রহস্যপূর্ণ যুক্তি পাইলাম। তাহা এই—একদা অক্ষয় বাবু কোন স্থলে আহূত হইয়া প্রার্থনার [illegible]

সংস্কারের যখন তাঁহার নেতা, তখন তাঁহার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক সংস্কার স্বীকার করা বা মনে করা আমরা মহাপাপ বিবেচনা করি। তিনি যে ভাব লইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা ধর্ম্মের ঘোর প্রতিপন্থী। তদ্দারা ধর্ম্মসংস্কার কখনই হইতে পারে না। তাঁহার বিশ্বাস সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বাবু আমাদিগকে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

The Babu long ago abjured his belief in Brahmoism and turned an agnostic. This change in his opinion could be proved by passages in his work on Hindu sects—

He abjured Brahmoism long ago, but he was tenaciously fond of appropriating to himself the sole glory of having introduced certain reforms in the Somaj, the doctrines of which he latterly hated. This was rather inconsistent in that eminent man, the glory of our country.

উপসংহারে একটী কথা বলি। অক্ষয়কুমার দত্ত এক জন বিদ্বান্ বিচক্ষণ ও সুলেখক ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থাবলী দ্বারা বঙ্গদেশের যে প্রভূত উপকার হইয়াছে, ইহা কে না স্বীকার করিবে? তিনি যে বঙ্গভাষার সম্যক্ পুষ্টি সাধন করিয়া যান, ইহাও অপলাপ করিবার নয়। ফলত তিনি আমাদেরই অক্ষয় বাবু এবং এই আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংযোগ হওয়াতে তাঁহার ভাবী উন্নতির বীজ রক্ষিত হয়, এই সমস্ত কথা স্মরণ করিলে আমাদিগেরই বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে। কিন্তু তাঁহার দুরাশা কখনই উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। তিনি যাহা নহেন, আপনাকে তাহাই বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। এই বুঝিয়া [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার জীবনের বহুর [illegible] [illegible] ভ্রম

[illegible]

প্রদর্শন করিলাম। এক্ষণে অনুরোধ চরিতাখ্যায়ক যেন পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ সংশোধিত আকারে প্র[illegible] করেন। ইহাতে ধর্ম্মের মর্য্যাদা ও সত্যেরও মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে।

বালকের প্রার্থনা।

দয়াময়! আমাদের এত ক্ষুদ্রত্বেও তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর না। আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার আদেশ লঙ্ঘন করি তথাপি তুমি আমাদিগকে তোমার স্নেহময় অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান দান কর—তোমারি পবিত্র সিংহাসনের নিকটে পাতকীকে দাঁড়াইতে দাও। আমাদের লজ্জা নাই—মহত্ত্ব নাই—মনুষ্যত্ব নাই, তাই আমরা তখনও ক্ষুদ্রত্ব পরিত্যাগ করিতে পারি না—স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া সত্যকে প্রাণের সঙ্গে আলিঙ্গন করিতে পারি না। নীচতা ক্ষুদ্রাশয়তা তখনও আমাদের হাড়ে হাড়ে মিশিয়া থাকে। তোমার কৃপা ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই—আমাদের হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা স্বার্থপরতা বিনাশ করিয়া তোমার [illegible] উপযুক্ত কর।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০এ কার্ত্তিক সোমবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়স্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিন ঘণ্টার পর ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীশ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব।

অদ্যকার উৎসব আমাদের অন্তঃকরণে এই সত্যটি মুদ্রিত করিয়া দিতেছে যে, ঈশ্বরোপাসনাই মনুষ্য জীবনের সার উদ্দেশ্য। কিন্তু যে-কোন উদ্দেশ্য হউক না কেন তাহা সাধন করিতে গেলেই কতকগুলি আয়োজনের প্রয়োজন হয়। সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা উপভোগ করিতে হইলে গৃহ এবং আর আর উপকরণের আয়োজন আবশ্যক। ঈশ্বরোপাসনা নির্ব্বিঘ্নে সাধন করিতে হইলে, আনুসঙ্গিক নানাবিধ আয়োজনের প্রয়োজন হয়; ধর্ম্ম অর্থ এবং কাম তিনেরই প্রয়োজন হয়, কিন্তু অর্থ এবং কাম ধর্ম্মের অনুগত হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। অর্থ-কষ্ট দ্বারা যদি আমাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত থাকে, ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বারা যদি আমাদের মন অস্থির থাকে, তবে তাহা ঈশ্বরোপাসনার পক্ষে বড়ই বাধা-জনক; কিন্তু অধর্ম্ম-দ্বারা যদি আত্মা কলুষিত থাকে তবে তাহা আরো ভয়ানক; আমরা বিপদে পড়িলে ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারি, কিন্তু পাপাচরণ করিলে আমাদের যে পথও বন্ধ হইয়া যায়। আমরা যদি অন্যের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করি, তবে কোন লজ্জায় আমরা ঈশ্বরের করুণার প্রার্থী হইব, আমরা যদি অপবিত্র বিষয়ে নিমগ্ন থাকি তবে কিরূপে আমরা পরমাত্মার পরম পবিত্র প্রেম-দৃষ্টির অনুপম জ্যোতি সহ্য করিব? অতএব ঈশ্বরোপাসনা নির্ব্বিঘ্নে সাধন করিতে হইলে ধর্ম্মের আয়োজন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয়; দরিদ্র ব্যক্তি অর্থকষ্টে বিভ্রান্ত হইয়াও ঈশ্বরকে ডাকিতে পারে, তৃষার্ত্ত পথিক মরুভূমির মধ্যে পড়িয়াও ঈশ্বরকে ডাকিতে পারে; কিন্তু পাপী ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রেম মুখ "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহা ভয়ানক দেখে; পাপী ব্যক্তি বিশুদ্ধ প্রেমের দিকে তাকাইতে পারে না। অতএব ঈশ্বরোপাসনার অধিকারী হইতে হইলে অনুতপ্ত চিত্তে পাপ হইতে নিবৃত্ত হওয়া এবং আগ্রহ সহকারে ধর্ম্মের আয়োজন করা নিতান্ত পক্ষেই আবশ্যক। নিতান্ত বিষয়ী লোকেরা একদিকে ভোগেচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য অর্থ উপার্জ্জন করেন, আর এক দিকে অর্থোপার্জ্জনের সামর্থ্য-লাভ করিবার জন্য [illegible]

পযুক্ত ভোগ-দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা করেন; এই প্রকারে তাঁহারা কামোদ্দেশী অর্থ এবং অর্থোদ্দেশী কাম এইরূপ এক ঘূর্ণাচক্রে নিয়ন্ত্রিত হইয়া অষ্ট প্রহর ঘুরিতে থাকেন। আবার, অনেক ধনমত্ত ব্যক্তি ভোগেচ্ছার চরিতার্থতাকে জীবনের একমাত্র সার জানিয়া সমস্ত ধন ঐশ্বর্য্য ভোগের অনির্ব্বাপ্য জঠরানলে আহুতি দিতে থাকেন; ইহাঁদিগের প্রতি ধর্ম্মের উপদেশ এই যে,

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।"

কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার কখন নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত ঘৃত-প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় আরো বৃদ্ধিই হইতে থাকে।" সুতুষ্পূর ভোগের সাগরে যখন অর্থ ক্রমেই অধোগতি প্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন তাহা অতি ভয়ানক অধোগতি। অর্থ হইতে কামে এবং কাম হইতে অর্থে ঘুরিয়া বেড়ানো অধোগতিও নহে, উর্দ্ধগতিও নহে, তাহা ঘূর্ণাগতি; কিন্তু কামের দিকে অর্থের একটানা স্রোত প্রকৃত পক্ষেই অধোগতি। ঘূর্ণা-গতির অর্থের দিক্ অপেক্ষা ভোগের দিক্ সমধিক প্রবল হইলেই তাহা অধোগতিতে পরিণত হয়; আর, তাহা ধর্ম্মের অধীন হইলেই উর্দ্ধগতিতে পরিণত হয়। ধর্ম্মই কেবল অর্থ এবং কাম উভয়েরই গতি উর্দ্ধদিকে—ঈশ্বরের দিকে—ফিরাইয়া দেয়। ঈশ্বর-প্রীতিই ধার্ম্মিক ব্যক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য এবং তাঁহার ধর্ম্ম অর্থ এবং কাম তিনই সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়। ঈশ্বরোপাসনাই ধার্ম্মিক ব্যক্তির জীবন; ঈশ্বর-প্রীতি সে জীবনের অন্তরঙ্গ এবং ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন সে জীবনের বহিরঙ্গ। তেমনি আবার, ধর্ম্মই সেই প্রিয়কার্য্য সাধনের অন্তরঙ্গ; অর্থ এবং কাম তাহার বহিরঙ্গ। ধার্ম্মিক ব্যক্তি ন্যায় পূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জন করেন, অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত হ'ন না; বৈধরূপে ভোগেচ্ছা চরিতার্থ করেন, অপবিত্র কার্য্যে লিপ্ত হ'ন না; সাধ্যানুসারে লোকের হিত-সাধন করেন, কাহারো প্রতি অহিতাচরণ করেন না; এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি আপনার আত্মাতে ঈশ্বরের প্রেমমুখ-চ্ছবি দিন দিন স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর-রূপে দেখিতে পা'ন; তাঁহার অনুরাগ দিন দিন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতররূপে ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত হয়; ক্রমে তিনি সমস্ত পাপতাপ হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সহিত কামনার সমুদায় ফল উপভোগ করেন।

ধর্ম্ম যে, অর্থ এবং কামের একেবারেই বিরোধী, তাহা নহে। ঈশ্বরোপাসনাই ধর্ম্মের পরম লক্ষ্য; এজন্য যাহা ঈশ্বরোপাসনার পথে বাধা-জনক, তাহা কখনই ধর্ম্মের উপদেশ হইতে পারে না। ধর্ম্ম কখনই এমন কথা বলে না যে, অর্থোপার্জ্জনে যত্ন করিও না; কেননা দারিদ্রের অশান্তিতে মনুষ্যের মন ঈশ্বরোপাসনার অনুপযোগী হইয়া পড়ে। ধর্ম্ম এমনও কথা বলে না যে, আদৌ অন্ন ভোজন করিও না; কেননা অরুচি পূর্ব্বক বিস্বাদু অন্ন ভোজন করিলে শরীর মন সুস্থ থাকে না, ইহাতেও ঈশ্বরোপাসনার ব্যাঘাত জন্মে। ধর্ম্ম কেবল এই বলে যে, অন্যায় পূর্ব্বক অর্থ উপার্জন করিও না; অস্বাস্থ্য-কর দ্রব্য ভোজন করিও না; কেননা তাহা হইলে মনো-দর্পণে মালিন্যের সঞ্চার হইবে, ও আত্মাতে ঈশ্বরের আবির্ভাব ঢাকা পড়িয়া যাইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এমনও কথা বলেন যে

"আমৃত্যোঃশ্রিয়মন্বিচ্ছেৎ নৈনাং মন্যেত দুর্লভাং।"

"আমরণ ধন-সম্পত্তির চেষ্টা করিবেক, তাহা দুর্লভ মনে করিবেক না।" কিন্তু এই যে, আমরণ ধনসম্পত্তির চেষ্টা, ইহা কিসের জন্য? শুদ্ধ কি কেবল ভোগেচ্ছা চরিতার্থ

আপনার প্রতি মনো-নিবেশ করি। ঐ আপত্তি-টি প্রথম সিদ্ধান্তের প্রাণে আঘাত করিতে উদ্যত,—ইহার পরিহারের উপায় কি?

আপত্তির পরিহার।

প্রথম সিদ্ধান্ত যদি এরূপ বলিত যে, আমাদের আপনার আপনার প্রতি আমাদের মন সর্ব্বক্ষণই স্পষ্ট রূপে এবং বলবৎরূপে নিবিষ্ট থাকে, অথবা, আমরা আপনারা মন এই আমাদের মুখ্য অনুধ্যানের বিষয়, তবে ঐ আপত্তি-টি প্রথম সিদ্ধান্তের পক্ষে নিতান্তই মারাত্মক হইত। তাহা হইলে পরাক্ষাকে সাক্ষী মান্য করিলেই, প্রথম সিদ্ধান্ত-টি একেবারেই প্রমাণ-বিরুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ পাইত; কারণ, প্রায়শই এইরূপ ঘটে যে, আপনাদিগকে আমরা অতি অল্পই গ্রাহ্য করি। কিন্তু অল্প গ্রাহ্য করা স্বতন্ত্র, আর, একেবারেই অগ্রাহ্য করা স্বতন্ত্র। বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত কেবল এই মাত্র বলে যে, যে কোন জ্ঞাতা হউক্ না কেন, জ্ঞাতাই ক্ষণমাত্রও নিতান্ত আত্ম-জ্ঞান বর্জ্জিত—নিতান্ত আত্ম বিস্মৃত—হইতে পারে না; যখন তাহার মন বাহ্য বিষয়ে আত্যন্তিক নিমগ্ন—তখনও নহে। আত্ম-বিস্মৃতির মাত্রা যত উচ্চেই চড়ানো হউক্ না—তাহা আংশিক এবং কৃত্রিম বই আর কিছুই হইতে পারে না, তাহা ঐকান্তিক হইতে পারে না—বাস্তবিক হইতে পারে না। যাহার যে প্রত্যক্ষ ক্রিয়া, যাহার যে ভাবনা, তাহা তাহার আপনারই প্রত্যক্ষ ক্রিয়া—আপনারই ভাবনা; সুতরাং প্রত্যক্ষ মাত্রেতেই—ভাবনা-মাত্রেতেই—আত্মাপেক্ষা নিগূঢ়-রূপে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, যখন আমরা বাহ্য বিষয়েতে প্রগাঢ় রূপে নিমগ্ন থাকি তখনও আমরা আত্মজ্ঞান হইতে একেবারেই বিনাকৃত হই না। বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নিরস্ত এবং ইহার জন্য সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত। আমাদের জাগ্রৎকালের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে—আমাদের সমস্ত জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে—আত্মজ্ঞানের একটি প্রশান্ত-বাহী নির্ব্বিবাদী স্রোত বহিয়া চলিতেছে, এবং সেই আত্মজ্ঞানই আমাদের আর আর সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তি-ভূমি।* আমাদের হস্ত-স্থিত কোন বস্তুর বা কার্য্যের প্রতি আমাদের মনের পোনেরো আনা উনিশ গণ্ডা তিন কড়া অংশ নিবিষ্ট থাকে থাকুক্—আমাদের মনের এক কড়া না হয়ে অল্পাংশ তো আমাদের আপনাদের প্রতি নিবিষ্ট থাকে? তাহা হইলেই হইল; আমাদের পক্ষ-সমর্থনের জন্য ঐ টুকুই যথেষ্ট—আর কিছুই আমরা চাহি না।

ঘনিষ্ঠ সহবাস অবজ্ঞোপেক্ষার কারণ কেন?

এই তো আমরা দেখিলাম যে, আমাদের সজ্ঞান অবস্থায় আমরা আপনারা কোন কালেই আমাদের আপনার দৃষ্টি হইতে সরিয়া পড়ি না; তবে কেন আমাদের এরূপ মনে হয় যে, আমরা প্রায়শই আত্ম-বিস্মৃত হই—আপনাকে যে আমরা দেখিয়াও দেখি না। তাহার কারণ আর কিছু না—মনুষ্য-প্রকৃতির নিয়মই এই যে, ঘনিষ্ঠ সহবাস অবহেলার প্রসূতি। যাহা আমরা সর্ব্বদা দেখি শুনি তাহা আমাদের গণনার মধ্যে আসে না; আর যাহা কিছু আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহার নূতনত্বের তার-

---

* পঞ্চদশীর নিম্ন-লিখিত বচন-টি এই কথারই সহোদর;—

"অহংপ্রত্যয় ...জ্ঞানমিদং ত্বেরতি স্ফুটং। অবিদিত্বা স্বমাত্মানং বাহ্যবেদ্য ন তু তৎ ক্বচিৎ॥"

ইহার অর্থ

বাহ্য বিষয়ক যত কিছু জ্ঞান—সমস্তই আত্মজ্ঞান-সাপেক্ষ। আপনাকে না জানিয়া কেহই বাহ্য বিষয়কে জানিতে পারে না।

তম্য অনুসারেই তাহার প্রতি আমাদের মনোযোগের তারতম্য হয়। যাহার দর্শন দুর্লভ, তাহাতেই আমাদের মন আকৃষ্ট হয়; আর, যাহা আমরা অষ্টপ্রহরই দেখিতেছি, তাহার প্রতি আমাদের তাচ্ছিল্য জন্মে। যাহা নূতন তাহাই আমাদের চক্ষুকে চমকিত করে; যাহা আমাদের চির-পরিচিত তাহা আমাদের চক্ষে লাগে না। আষ্টপ্রহরিক ব্যবহারের ন্যায়—মনশ্চক্ষু ঘোলাইয়া দিতে—কৌতূহলের আগ্রহ মন্দাইয়া দিতে—এমন আর কেহই নাই। ইহার উদাহরণ যেখানে সেখানে পড়িয়া আছে। এখানে কেবল এই মাত্র বলা আবশ্যক যে, যাঁর যেই সম্মুখে যাহাই কেন উপস্থিত হউক না—তাহারই অপেক্ষা তিনি আপনার সহিত অধিক পরিচিত, তাই তাহারই অপেক্ষা তিনি আপনার প্রতি অল্প মনোযোগী। আমরা প্রতিজনেই আপনার নিকট নিরন্তর উপস্থিত—তাই আপনাকে দেখিয়াও দেখি না।* আমাদের জ্ঞানের মূল নিয়মকে আমরা এরূপ অবিচ্ছেদে মানিয়া চলি যে, আমরা তাহাকে লক্ষ্যই করি না। আমাদের মনের যেরূপ প্রচলিত ভাব গতি, তাহাতে আমরা আপনারা যেন আমাদের জ্ঞানের নিকট কেহই নহি। এটি, আপনার সহিত আপনার গলাগলি ঘনিষ্ঠতার—নিরবচ্ছিন্ন সহবাসের—চির পরিচয়ের—অনিবার্য্য ফল। যে সূত্রে মনুষ্য আপনার জ্ঞানে আপনি বাঁধা, তাহা যতই কেন সূক্ষ্ম হউক না, কোন কালেই তাহা ছিন্ন হইতে পারে না।

আত্মাবহেলার দ্বিতীয় কারণ ইন্দ্রিয়ের অগম্যতা। ৭॥

এখানে আর একটি বিষয় বিবেচ্য; সে-টি এই যে আমাদের জ্ঞানের অভ্যন্তরে দুইটি প্রদেশ দেখিতে পাওয়া যায়; একটি প্রদেশ উপস্থিত উপস্থিত ইন্দ্রিয়-গম্য [illegible] সকলেতেই ভূম্যীভূত, সুতরাং [illegible] ইন্দ্রিয়-গম্য, আর একটি প্রদেশ কেবল [illegible]ই গম্য—ইন্দ্রিয়ের অগম্য; যে প্রদেশটি অতীন্দ্রিয় তাহা অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গম্য প্রদেশটি সমধিক বল-সহকারে আমাদের মন আকর্ষণ করে। মনুষ্য আপনার শরীরকে দর্শন করিতে পারে, স্পর্শ করিতে পারে; কিন্তু আপনাকে দর্শন করিতেও পারে না, স্পর্শ করিতেও পারে না। শরীরের ন্যায় আত্মা ইন্দ্রিয়-গম্য নহে। আমাদের মন স্বভাবতই ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সমূহে বলবদ্‌রূপে বাঁধা পড়িয়া যায়; এজন্য আমাদের সাংসারিক কর্ম্ম কার্য্যের সময়—মনের অষ্ট প্রহর-সুলভ প্রাকৃত অবস্থায়—আমরা আপনার প্রতি অতি অল্পই মনোনিবেশ করিতে অবসর পাই। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, দুই কারণে আমরা আপনার প্রতি এত অল্প মনোযোগী;—এক কারণ এই যে, ঘনিষ্ঠতা অবহেলার প্রসূতি; আর এক কারণ এই যে, আত্মা ইন্দ্রিয়ের অগম্য।

প্রথম সিদ্ধান্তের বিরোধী একটি সিদ্ধান্তের খণ্ডন। ৮।

কোন কোন দর্শনকারকে এখনকার এ সিদ্ধান্তের বিরোধী মত অবলম্বন করিতে দেখা যায়। ইঁহারা বলেন এই যে, প্রথমে আমরা কেবল ইন্দ্রিয়-সংক্রান্ত উপলব্ধিগুলিই (অর্থাৎ বহির্বিষয়ের ছাপগুলিই)

* বেদান্ত দর্শনে "দশম পুরুষ-ন্যায়" নামক আত্ম-বিস্মৃতির একটি উদাহরণ প্রসিদ্ধ আছে, সেটি এই;—দশজন ব্যক্তি এক সঙ্গে নৌকারোহণ পূর্ব্বক নদী পার হইয়া আপনাদের সংখ্যা নির্ণয় করিতে লাগিলেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য—যিনিই গণনা করেন তিনিই আপনাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতর নয় জনকে গণনা করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন, ও "আর এক জন কোথায়" বলিয়া বিভ্রান্ত হ'ন; এটি কাহারো মনে হইতেছে না যে, তিনি আপনিই দশম ব্যক্তি। পঞ্চদশীতে আছে—

"নব সংখ্যা হৃতজ্ঞানো দশমো বিভ্রমাত্তদা।
ন বেত্তি দশমোঽস্মীতি বীক্ষ্যমাণোঽপি তাম্নব॥"

দশম ব্যক্তি আপনি ছাড়া নয় জনকে দেখিয়াও নয় সংখ্যায় এরূপ বিভ্রান্ত হইতেছেন যে, ইহা তিনি দেখিতেছেন না যে, তিনি নিজেই দশম।

জ্ঞানে উপলব্ধি করি; তাহার পর, যত-
ক্ষণ না পুনর্ব্বার সেই উপরক্তি-গুলিকে
চিত্ত ক্ষেত্রে আনয়ন করি, ততক্ষণ আমরা
আপনাকে তাহাদের জ্ঞাতা বলিয়া উপলব্ধি
করি না। ইঁহারা আমাদিগকে এক প্রকার
অসাধ্য সাধন করিতে বলেন;—যে সকল
উপরক্তির উপস্থিতি-কালে আমরা তাহা-
দিগকে আপনার বলিয়া উপলব্ধি করি নাই,
সেই সকল উপরক্তির অনুপস্থিতি কালে
তাহাদিগকে আপনার বলিয়া স্মরণ করিতে
বলেন। পূর্ব্বে যাহা সাক্ষাৎ-জ্ঞানে উপস্থিত
হয় নাই, পশ্চাতে তাহা কেহই স্মরণ করিতে
পারে না। যদি সেই উপরক্তি-গুলির উপ-
স্থিতি-কালে তাহাদিগকে আমরা আপনার
বলিয়া না জানিলাম তবে পরে তাহাদিগকে
কেমন করিয়া আপনার বলিয়া স্মরণ করিব?
স্মরণ বলিতে এখানে আর তো কিছুই নয়—
সেই উপরক্তিগুলির সহিত আমাদের সম্বন্ধ
যাহা আমরা পূর্ব্বে উপলব্ধি করিয়াছি তাহা-
রই স্মরণ; কিন্তু আপনাকে উপলব্ধি না করিয়া
আপনার সহিত অন্য কোন কিছুর সম্বন্ধ
উপলব্ধি করা অসম্ভব; অতএব যদি পরে
ভাবিয়া দেখিলে এইরূপ প্রতিপন্ন হয় যে,
ঐ উপরক্তি-গুলি আমাদের আপনার আপ-
নার সম্বন্ধেই ঘটিয়াছিল, তবে তাহাদের
প্রথম উপস্থিতি-কালে অবশ্য তাহাদিগকে
আমরা আপনার আপনার বলিয়াই উপলব্ধি
করিয়াছিলাম। সাক্ষাৎ জ্ঞান পূর্ব্বে যাহা
বলিয়াছে, স্মরণ তাহাই পুনরাবৃত্তি করিতে
পারে; স্মরণ অজ্ঞাত-পূর্ব্ব নূতন কোন কথাই
বলিতে পারে না। স্মরণের একটি কথাও
নিজের কথা নহে, তাহার সকল কথাই শেখা
কথা; আর, পূর্ব্ববর্ত্তী সাক্ষাৎ জ্ঞানই স্মর-
ণের একমাত্র শিক্ষা গুরু। কথিত উপরক্তি-
গুলির প্রথম উপস্থিতির সময় আমরা নাকি
আমাদের আপনা আপনাকে সেই উপরক্তি
গুলির গৃহীতা বলিয়া উপলব্ধি করি, তাই
তাহাদের স্মরণের সময় আমরা আপনা-
আপনাকে তাহাদের গৃহীতা বলিয়া স্মরণ
করি। তবেই হইতেছে যে, তাহাদের
প্রথম উপস্থিতি-কালেও তাহাদিগকে আমরা
আপনার বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলাম—
সুতরাং তখন-হইতেই আমাদের আত্ম জ্ঞান
কার্য্য করিয়া আসিতেছে।

[illegible] তত্ত্বটির [illegible] বলিয়াই প্রথম সিদ্ধান্তের
[illegible] গুরুত্ব ॥ ৯ ॥

প্রথম সিদ্ধান্তটিকে পর-পরবর্ত্তী আর
আর সিদ্ধান্ত হইতে বিযুক্ত করিয়া শুদ্ধ যদি
[illegible] দৃষ্টি নিবদ্ধ করা
[illegible] অকিঞ্চিৎকর [illegible]
[illegible] সমস্ত [illegible]
ভিত্তি-ভূমি—এবং পর পরবর্ত্তী সকল [illegible]
গুলির [illegible] অবলম্বন—এই ভাবে যদি
তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তবে তাহার
মাহাত্ম্য [illegible] এবং তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যা
[illegible] করিতে পারা যায় না। এই সি-
দ্ধান্তটি [illegible] এবং সর্ব্ববাদী সম্মত—
[illegible] সংহিতার সকলই
নির্ভর করিতেছে। [illegible] স্থৈর্য্যেই সমস্ত
তত্ত্বটির [illegible] ইহার পতনেই সমস্ত তত্ত্বটির
পতন। এ সিদ্ধান্তটির নিজের [illegible] তেমন-
কোন অর্থ-গৌরব না দেখিয়া, জিজ্ঞাসু ব্যক্তি
[illegible] যে, "এইটুকু [illegible] বেঁধে
গিয়েছে কেবল [illegible] পণ্ডশ্রম—এক আঁচড়েই [illegible]
[illegible]।" তিনি হয় তো মনে
করিবেন যে, "আমার সমস্ত জ্ঞান এবং সমস্ত
প্রত্যক্ষ-ক্রিয়া আমার নিজের" এই তো এক-
রত্তি কথা, কিন্তু ইহার ঘটা ও আড়ম্বর দে-
খিলে মনে হয় যে, কি না জানি ব্যাপার!"
জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে আমরা এই বলি যে,
তিনি এগোন, পরে পরে কি আসিতেছে
তাহা দেখুন, তাহার পর যাহা বলিবার হয়—

সিদ্ধান্তই অসত্যে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। একদিকে প্রচলিত মনোবিজ্ঞান, আর এক দিকে যথার্থ তত্ত্ব-জ্ঞান; মনোবিজ্ঞান লৌকিক-চিন্তা-সুলভ ভ্রম-সিদ্ধান্তের পক্ষ অবলম্বন করে, তত্ত্বজ্ঞান বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রকৃত তত্ত্ব সকলের পরিচয় প্রদান করে; প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটি মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি-ভূমি, প্রথম সিদ্ধান্তটি তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তি-ভূমি; দুয়ের মধ্যে যে, কিরূপ মর্মান্তিক বিরোধ, তাহা দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে ফুটিয়া বাহির হইবে।

সপক্ষ এবং প্রতিপক্ষ দুইরূপ সিদ্ধান্তের
ভেদ চিহ্ন ॥ ১৫ ॥

সপক্ষ এবং প্রতিপক্ষ দুইরূপ সিদ্ধান্তের বৈপরীত্য স্পষ্টরূপে নির্দেশ করিতে হইলে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, যাহা আমরা সত্য সত্যই ভাবি—সপক্ষ সিদ্ধান্ত তাহাই আমাদিগকে বলে; আর, যাহা আমরা ভাবি ভাবি, কিন্তু বাস্তবিক ভাবি না, তাহাই প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত আমাদিগকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বলে; অর্থাৎ সপক্ষ সিদ্ধান্ত বাস্তবিক চিন্তার পরিচায়ক, প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত কাল্পনিক চিন্তার পরিচায়ক। তাহার সাক্ষী;—প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত বলিতেছে যে, আমরা আপনাকে না জানিয়াও অন্যান্য বস্তু জানিয়া থাকি; সহসা এইরূপ আমাদের মনে হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা একটি অসম্ভব ব্যাপার। সহসা আমরা ভাবি যে, আমরা আপনাকে না জানিয়াও অন্যান্য বস্তু জানিয়া থাকি; অথবা সে একই কথা—আমরা একটি স্ববিরোধী ব্যাপার ভাবি,—বাস্তবিক যে, ভাবি, তাহা নহে—কেননা যাহা স্ববিরোধী তাহার ভাবনা হইতেই পারে না—যেন ভাবিতেছি এইরূপ একটা ভান করিয়া মনকে প্রবোধ দিই মাত্র। কিন্তু সপক্ষ সিদ্ধান্ত যাহা বলে, তাহা আমরা সত্য-সত্যই ভাবি—সত্য সত্যই জানি।

পিথাগোরীয় সাংখ্য সিদ্ধান্তের সহিত প্রথম
সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য ॥ ১৬ ॥

অজ্ঞেয় কি-প্রকারে জ্ঞেয়-রূপে পরিণত হয়—তাহারই নিয়ম প্রথম সিদ্ধান্তে ব্যক্ত হইল। আপনাকে উপলব্ধি করা হউক—তাহা হইলেই সমস্ত বিষয় (সম্ভবতঃ) উপলব্ধি-সাধ্য হইবে—জ্ঞান-সাধ্য হইবে; আর আপনাকে অনুপলব্ধি করা হউক্—তাহা হইলে কোন বিষয়ই উপলব্ধি সাধ্য হইবে না—জ্ঞান সাধ্য হইবে না। পিথাগোরসের একটি [illegible] যে, একটি সিদ্ধান্ত যে, সংখ্যাই [illegible] বর্তমান সিদ্ধান্তের [illegible] যায়। প্রকৃতপক্ষে যদি জ্ঞানের [illegible] করিয়া ভাবা যায়, [illegible] তাহার না একত্বই থাকে—না অনেকত্বই থাকে, তাহা হইলে কোন কিছু [illegible] এক বলিতে পারা যায় না কোন কিছু [illegible] বলিতে পারা যায় না; কারণ, [illegible] না অনেককে, না অনেক [illegible] এক সূত্রে [illegible], ততক্ষণ কোন [illegible] এক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না; একত্ব যখন [illegible], তখন অনেকত্বও [illegible]; কেননা, অনেকত্ব [illegible] প্রবাহ—অনেকের প্রত্যেকটি এক হওয়া চাই, নতুবা তাহারা অনেক হইতে পারে না; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানকে সরাইলে—জ্ঞানের যোগ-সূত্র প্রত্যাহরণ করিলে—প্রকৃতিতে ঐকান্তিক অ-স্বতন্ত্রতা ভিন্ন আর কিছুই থাকে না—একত্বও থাকে না—অনেকত্বও থাকে না। প্রকৃতি যদিবা আমাদিগকে বস্তু আনিয়া দেয়—তথাপি "এক" বস্তু আনিয়া দিতে পারে না। পিথাগোরস এই কথা বলেন। ইহাঁর মতে জ্ঞাতাই কেবল বস্তুতে একত্ব আরোপ করিতে পারে; এমন নহে যে, জ্ঞাতা অনেকত্বে একত্বের আরোপ করে (কেননা অনেকত্বের

গোড়াতেই একত্ব রহিয়াছে—একত্ব ভিন্ন অনেকত্ব হইতেই পারে না) ; তবে কি ? না যাহা "একও নহে—অনেকও নহে" এইরূপ জ্ঞান-বিরুদ্ধ ব্যাপার, তাহাতেই জ্ঞাতা একত্ব আরোপ করে ; আর, সেইরূপ করিয়াই অজ্ঞেয়কে জ্ঞেয় করিয়া তোলে, অর্থ-শূন্য প্রমাদ রাজ্যকে জ্ঞান-রাজ্য করিয়া তোলে।

পিথাগোরীয় মতের বিপরীত অর্থ-বোধ ॥ ১৭ ॥

পিথাগোরসের এই মতটির অনেকে আশ্চর্য্যরূপ উল্টা অর্থ বুঝিয়া থাকেন। এই মতের ব্যাখ্যা-কর্ত্তারা সচরাচর এইরূপ বুঝিয়া আসিতেছেন যে, প্রকৃতি পূর্ব্বাহ্নেই বস্তু-সকলের সংখ্যা গণনা করিয়া ঠিক্‌ঠাক্‌ করিয়া রাখিয়াছে ; সেই সকল বস্তু যখন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন আমরা তাহাদিগকে পুনর্গণনা করি মাত্র ; এরূপ একটা অকিঞ্চিৎকর কথা একজন উচ্চ-শ্রেণীর তত্ত্বজ্ঞের মুখ হইতে বাহির হওয়া যেন সত্য সত্যই সম্ভবে ! কেমন করিয়া বস্তু-সকল অজ্ঞেয়তা হইতে জ্ঞেয়ত্বে উপনীত হয়—এইটিই এখানকার প্রশ্ন ; ইহার কি এই উত্তর যে, জ্ঞেয়ত্বে উপনীত হইবার পূর্ব্ব হইতেই তাহারা জ্ঞেয় হইয়া বসিয়া আছে ? তবে, জল কিরূপে বরফ হয়—ইহা বুঝাইবার সময় ব্যাখ্যা-কর্ত্তা এই বলিয়াই নিশ্চিন্ত থাকুন্‌ না কেন যে, জল পূর্ব্ব হইতেই বরফ হইয়া আছে। তাহা তো আর হইতে পারে না—জলের পূর্ব্বতন তরল অবস্থা হইতেই তাঁহাকে তাঁহার ব্যাখ্যার গোড়া পত্তন করিতে হইবে। এরূপ সত্ত্বেও, পিথাগোরসের ঐ যে একটি সিদ্ধান্ত যে, জ্ঞেয়বস্তু সংখ্যামূলক, উহার অর্থ উল্টাইয়া দিয়া উহাকে হাস্যাস্পদ করিয়া দাঁড় করানো হইয়াছে। সংখ্যা (অর্থাৎ একত্ব বা অনেকত্ব) বস্তু-সকলের জ্ঞান-বহির্ভূত অবস্থাতেও বস্তু-সকলের গাত্রে জড়িত থাকে—এ কথা পিথাগোরসের কথা নহে। তাহা যদি হইত, তবে বস্তু সকল গোড়াগুড়িই জ্ঞেয় হইত ; তাহা হইলে "অজ্ঞেয় কি প্রকারে জ্ঞেয়-রূপে পরিণত হয়" এরূপ একটা প্রশ্নই উঠিতে পারিত না। পিথাগোরসের সাংখ্য সিদ্ধান্ত অসম্পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু উহা প্রাচীনকালের একটি প্রগাঢ় চিন্তার ফল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পিথাগোরসের সিদ্ধান্তের সার মর্ম্ম যেটি, সেইটিই উড়াইয়া দিয়া আধুনিক পণ্ডিতেরা উহাকে নিতান্তই অর্থ শূন্য করিয়া ছাড়িয়াছেন।

পিথাগোরীয় নিয়মের ব্যাখ্যা ও তাহার যুক্তি ॥ ১৮ ॥

এই প্রথম সিদ্ধান্তে যে নিয়মটি বিন্যস্ত হইল, তাহা পিথাগোরীয় সাংখ্য নিয়মের উৎকৃষ্টতর ব্যাখ্যা, এবং স্পষ্টতর বিকাশ। কোন বস্তুকে আত্মার নিকট জ্ঞাত হইতে হইলেই সে বস্তুকে, হয় এক, নয় অনেক, নয় অনেকের সমষ্টি, বলিয়া জ্ঞাত হইতে হইবে, কিন্তু এক-আত্মার সহিত সম্পর্ক সূত্রেই জ্ঞাতব্য বিষয় এক বলিয়া অবধারিত হইতে পারে ; আর, জ্ঞাতব্য বিষয়-সমূহের প্রত্যেকে এক বলিয়া অবধারিত হইলে, তবেই তাহারা সাকল্যে অনেক বলিয়া অবধারিত হইতে পারে ; পুনশ্চ এক আত্মার সহিত সম্পর্ক সূত্রেই অনেক-বস্তুর সমষ্টি অনেকাত্মক এক বলিয়া অবধারিত হইতে পারে।

জর্ম্মান দেশীয় তত্ত্বজ্ঞদিগের গ্রন্থে বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের পূর্ব্বাভাস ॥ ১৯ ॥

মাঝখানকার অন্যান্য সদৃশ যে যে সিদ্ধান্ত সকল উল্লঙ্ঘন করিয়া আমরা জর্ম্মান দেশীয় তত্ত্বজ্ঞদিগের গ্রন্থে আমাদের এই প্রথম সিদ্ধান্তের পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাই। বর্ত্তমান সংহিতা এই প্রথম সিদ্ধান্তটিকে যতই কেন নূতন বিষয়ে নূতন ভাবে প্রয়োগ করুক না, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহা যে, সর্ব্বাংশেই

আশাহীনকে আশা প্রদান করা, অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানালোক বিস্তার করা—নিঃস্বার্থভাবে এই সকল করিয়া সন্তুষ্ট থাকাই আমাদের জীবনের কার্য্য।

(৫)

বিদ্বেষ ভাব দূর করিয়া প্রেমকে আলিঙ্গন কর; কেননা ঈশ্বরের রাজ্যে বিদ্বেষ ভাবাপন্নের মঙ্গল নাই।

(৬)

অসংখ্য লোকের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করা মহত্ব নহে; অসংখ্য লোকের সেবা করাই মহত্ব।

(৭)

ধনী কে? তিনিই ধনী যাঁহার ঈশ্বর প্রদত্ত সকল ক্ষমতা, সকল বৃত্তি গুলি সর্ব্বদা পবিত্র ও সুস্থ অবস্থায় অবারিত ও সামঞ্জস্যীভূত ভাবে কার্য্যে নিযুক্ত।

(৮)

অতি সামান্য বিষয়েও ন্যায়ের আদেশানুসারে কার্য্য কর, তাহা হইলে প্রধান বিষয়ে ন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য করা অসম্ভব হইবে।

(৯)

জগৎ হইতে অসত্য ও অমূলক সংস্কার দূর করাই প্রতিভান্বিত ব্যক্তির কার্য্য।

(১০)

যদি কোন ব্যক্তি মানুষকে ঘৃণা করে অথচ বলে যে সে ঈশ্বরের প্রেমিক, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।

(১১)

সম্মুখে যে কার্য্য পাইবে তাহাই করিবে, তাহা হইলে তৎপরে কি করিতে হইবে তাহা জানিতে পাইবে।

(১২)

মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই মঙ্গল সম্পাদন করিবে, তাহা হইলে মঙ্গল তোমার সহকারী হইবে।

(১৩)

স্বর্ণ ও রৌপ্য অপেক্ষা কত মূল্যবান পদার্থ এই পৃথিবীতে রহিয়াছে, কিন্তু মানুষ কি মূঢ়! সে প্রকৃত মূল্যবান পদার্থ আহরণে চেষ্টিত হয় না।

(১৪)

যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে সে কখন নিরাশ হয় না।

(১৫)

সকল মানুষের যদি ঈশ্বরের উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে কেহই দুঃখ শোকে কাতর হইত না।

(১৬)

তুমি যখন লোকের দুঃখ দূর করিবার জন্য যত্ন করিতেছ না, তখন তুমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিও না যে "হে ঈশ্বর মানব জাতির দুঃখ মোচন কর," কেন না তুমি ঐ প্রার্থনা করিবার অধিকারী নহ।

(১৭)

এখানে তুমি ঈশ্বরের আশ্রিত, পরকালেও তাঁহার নিকটতর আশ্রয়ে তুমি বাস করিবে, তবে হে মানব, কেন ভীত হইতেছ?

(১৮)

যাহার যতটুকু ঈশ্বরবত্তা, তাহার ততটুকু সৌন্দর্য্য।

(১৯)

পবিত্র অবিকৃত হৃদয়ই সর্ব্বোত্তম উপদেষ্টা; ঈশ্বরই সর্ব্বোত্তম বন্ধু; সময়ই সর্ব্বোত্তম শিক্ষাদাতা; জগতই সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ।

(২০)

বিশাল সৌরজগৎ যেমন ঈশ্বরের অনন্তত্বের পরিচয় দেয়, তেমনি এক পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র বালুকণাও তাঁহার মহত্তা প্রকাশ করে।

(২১)

প্রেমই মানব জীবন আদি ও অন্ত।

(২২)

কে জ্ঞানী হইতে পারে? যিনি সকল বস্তু ও সকল লোকের নিকট হইতে সত্য গ্রহণ করেন।

(২৩)

সত্যের প্রতি প্রেম যতই দৃঢ় হইবে, ততই তুমি ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইবে।

(২৪)

সর্ব্বাপেক্ষা মধুর কি? প্রেম। সর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বরস্বরূপ কি? ধর্ম্ম জীবন। সর্ব্বাপেক্ষা মহান কি? ঈশ্বর। সর্ব্বাপেক্ষা সুখদায়ক কি? ঈশ্বর স্বরূপ চিন্তা, ও পরোপকার।

(২৫)

অন্যকে কষ্ট দেওয়া অপেক্ষা আপনি কষ্ট ভোগ করা ভাল, মানুষ তাহা বুঝে না।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ পৌষ রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার পর বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজের ঊনত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীমহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সরস্বতীকুল ১৮১৮ } সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একাদশ কল্প

চতুর্থ ভাগ

পৌষ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭

৫২১ সংখ্যা

১৮০৮ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৬ অগ্রহায়ণ রবিবার ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭।

আচার্য্যের উপদেশ।

আমরা যদি আমাদের সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, আমরা বাহিরের সমস্ত জগতেরই অধীন। সূর্য্যমণ্ডলের কোথায় কি সাম্যের ব্যতিক্রম হয়—পৃথিবীতে আমরা তাহার ফল ভোগ করি; কোন্ দেশের কোথায় কি বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহার তরঙ্গ আসিয়া আমাদের ক্ষুদ্র কুটীরের ভিত্তি-মূল কাঁপাইয়া দেয়। সুখ-সৌভাগ্যেরও তরঙ্গ জগতের এক প্রান্তে উত্থিত হইলে, তাহার আর-এক প্রান্ত তাহা জানিতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এইরূপ অপরিহার্য্য অধীনতা-শৃঙ্খলে আপাদ মস্তক জড়িত হইয়াও মনুষ্য পারতপক্ষে আপনার পরাধীনতা স্বীকার করিতে চাহে না। মনুষ্য আপনার পরাধীনতার স্মারক চিহ্ন জীবনের প্রতি ঘটনাতেই অঙ্কিত দেখিতেছে এবং মুহুর্মুহু তাহার ফল ভোগ করিতেছে—অথচ আপনার পরাধীনতা স্বীকার করিতে তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়। এরূপ হয় কেন? ইহার অবশ্য কোন নিগূঢ় কারণ থাকিবে। শুষ্ক-তার্কিক সে কারণ-টিকে কুসংস্কার বলিয়া এক কথায় উড়াইয়া দেন; তিনি বলেন যে, স্বাধীনতা-স্পৃহা মনুষ্যের একটা দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র,—পুরাণে কথিত আছে যে, অতীব পুরাকালে পর্ব্বতেরা পক্ষ-বিশিষ্ট ছিল,—পরে ইন্দ্রের নিক্ষিপ্ত বজ্রে তাহাদের পক্ষ বিধ্বস্ত হইয়া গেল; স্বাধীনতা স্পৃহা মনুষ্যের অসংযত মনোবৃত্তির পক্ষ-স্বরূপ,—বিজ্ঞানের বজ্রে তাহা ছিন্ন-মূল হইয়া ধরাশায়ী হয়। বিজ্ঞান স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছে যে, সমুদায় জগৎ কঠোর কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলায় ওত-প্রোত,—মনুষ্য জগৎছাড়া নহে, সকল বস্তু যেমন পরাধীন—মনুষ্যও সেইরূপ পরাধীন। বিজ্ঞান যে, অজ্ঞানের দলে মিশিয়া উচ্চৈঃস্বরে পরাধীনতার জয়-কীর্ত্তন করিবে—ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে,—কেননা অজ্ঞানের দল-পোষণ চিরকালই প্রসিদ্ধ; আশ্চর্য্য যাহা—তাহা আর-এক বিষয়; চারিদিকের পরাধীনতার মধ্য হইতে স্বাধীনতায় ভর করিয়া বিজ্ঞান কিরূপে অঙ্কুরিত এবং বর্দ্ধিত হইতে পারিল—ইহাই আশ্চর্য্য।

বিজ্ঞান মনুষ্যের স্বাধীনতার বিপক্ষে মুখে যাহাই বলুক না কেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার সপক্ষেই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। স্বাধীন চিন্তাই বিজ্ঞানের প্রাণ; বিজ্ঞান যদি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কোন কথা বলে, তবে সে তাহার আপনার প্রাণে আপনি আঘাত করে; বাস্তবিক বিজ্ঞান তাহা বলে না। বিজ্ঞানের ভিতরকার কথা এই যে, কোন বস্তুই এমন নহে যে, তাহা একেবারেই পরাধীন কিম্বা একেবারেই স্বাধীন,—জগতের সকল বস্তুই পরস্পরাধীন। যাঁহারা বিজ্ঞানের ভিতরকার কথা জানেন না, তাঁহারা হঠাৎ মনে করিতে পারেন যে, পৃথিবীই সূর্য্যের অধীন—সূর্য্য পৃথিবীর অধীন নহে। কিন্তু বিজ্ঞান আর-এক কথা বলে। বিজ্ঞান বলে এই যে সূর্য্যের অনতিদূরে সমস্ত সৌর জগতের ভার-কেন্দ্র অবস্থিতি করে; সেই ভার-কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে সূর্য্যের মহৎ আকর্ষণে যেমন পৃথিবী ঘুরিতেছে—পৃথিবীর ক্ষুদ্র আকর্ষণেও সেইরূপ সূর্য্য ঘুরিতেছে। মনুষ্যের গার্হস্থ্য এবং সামাজিক ব্যাপারে এই পরস্পরাধীনতা আরো জাজ্বল্যতর-রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এক দিকে শিশু যেমন মাতার অধীন—আর এক দিকে মাতা তেমনি শিশুর অধীন; শিশুর একটু কিছু হইলেই মাতার প্রাণ বাহির হইয়া যায়। এক দিকে প্রজা যেমন রাজার অধীন, আর-এক দিকে রাজা তেমনি প্রজার অধীন; প্রজার দুর্ভিক্ষে রাজার রাজত্ব ঘুচিয়া যায়। সকল বস্তু পরস্পরাধীন—এ কথার অর্থই এই যে, প্রত্যেক বস্তু এক-অংশে স্বাধীন—আর এক অংশে পরাধীন। রাজা সর্ব্বাংশে প্রজার অধীন নহে—প্রজাও সর্ব্বাংশে রাজার অধীন নহে; যে অংশে প্রজা রাজার অধীন—সে অংশে রাজা প্রজার অধীন নহে—সুতরাং সে অংশে রাজা স্বাধীন; তেমনি আবার, যে অংশে রাজা প্রজার অধীন—সে অংশে প্রজা রাজার অধীন নহে—সুতরাং সে অংশে প্রজা স্বাধীন। পৃথিবী যে অংশে আর-সমস্ত সৌর জগতের অধীন, সেই অংশেই পৃথিবী পরাধীন; কিন্তু যে অংশে আর সমস্ত সৌর জগৎ পৃথিবীর অধীন—যে অংশে পৃথিবীর ভাল মন্দের উপর সমস্ত সৌর জগতের ভাল মন্দ নির্ভর করে—সে অংশে পৃথিবী স্বাধীন। সকল বস্তুই একাংশে স্বাধীন, আর এক অংশে পরাধীন। স্বাধীনতা সকল বস্তুরই অন্তরঙ্গ, পরাধীনতা সকল বস্তুরই বহিরঙ্গ। কিন্তু আর আর বস্তুর সহিত মনুষ্যের প্রভেদ এই যে, মনুষ্যের আত্মাতে সেই স্বাধীন অন্তরঙ্গ প্রদেশটি জ্ঞানোজ্জ্বল পরিস্ফুট ভাব ধারণ করিয়াছে। মনুষ্য আপনার স্বাধীনতার মর্ম্ম-রস আপনি আস্বাদন করিয়া অবগত হইয়াছে—প্রাণ গেলেও আর সে তাহাকে ছাড়িতে পারে না; মনুষ্য আপনার স্বাধীনতাকে জ্ঞানের মুষ্টি-মধ্যে পাইয়াছে—সর্ব্বসংহারী মৃত্যুও সে মুষ্টি হইতে সে অমূল্য রত্নটিকে কাড়িয়া লইতে পারে না। মনুষ্য শত সহস্র শৃঙ্খলায় আপাদমস্তক জড়িত হইয়াও আপনার পরাধীনতা স্বীকার করিতে কেন-যে এত পরাঙ্মুখ, তাহা এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে। মনুষ্য আপনার অভ্যন্তরে এমনি একটি অপূর্ব্ব চক্ষু দেখিতে পায় যে, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে প্রাণান্তেও মনুষ্যের মুখ হইতে এ কথা বাহির হইতে পারে না যে, "আমি পরাধীন।" সেই চক্ষুটি মনুষ্যের অন্তরাত্মা। মনুষ্যের চতুর্দ্দিকে পরাধীনতার ঝঞ্ঝাবাত তুমুল কোলাহলে বহিয়া যাইতেছে—কিন্তু তাঁহার অন্তরের শান্তি নিকেতনে স্বাধীনতা নিরন্তর জাগিতেছে—সে অগ্নি কিছুতেই নির্ব্বাণ হইবার নহে।

জগতের প্রত্যেক বস্তুই একাংশে স্বাধীন আর এক অংশে পরাধীন ; মনুষ্যও সেইরূপ একাংশে স্বাধীন—আর এক অংশে পরাধীন; কিন্তু মনুষ্যের স্বাধীনতা জ্ঞান-জ্যোতিতে প্রদীপ্ত, আর আর-বস্তুর স্বাধীনতা অজ্ঞান-অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন। জ্ঞানবান্ মনুষ্য এবং অজ্ঞানাচ্ছন্ন বাহ্য প্রকৃতি উভয়ে পরস্পরাধীন ; মনুষ্য একাংশে প্রকৃতির অধীন, আর-এক অংশে প্রকৃতিকে আপনার অধীনে চালনা করিতেছে,—ইহাই উভয়ের পরস্পরাধীনতা। এই পরস্পরাধীনতার মূল অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ পরমাত্মাই সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন পুরুষ—মনুষ্য যে অংশে তাঁহার সহিত যোগযুক্ত সেই অংশে স্বাধীন, এবং যে অংশে তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন সেই অংশে পরাধীন। জগতের সমস্ত স্বাধীনতা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ভূমা মহান্ পুরুষের মঙ্গল-জ্যোতির উচ্ছ্বাস ; এবং সমস্ত পরাধীনতা সেই মঙ্গল জ্যোতির ছায়া। কর্ম্মচারী যেমন কর্ম্মক্ষেত্রে পরাধীন এবং বাটিতে আসিয়া স্বাধীন, মনুষ্য সেইরূপ সংসার-ক্ষেত্রে পরাধীন—ঈশ্বরের অমৃত নিকেতনে স্বাধীন। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম কখনই জগৎকে পরের রাজ্য মনে করেন না—তাই আপনাকে পরাধীন মনে করেন না। জগৎ তাঁহার পিতার রাজ্য বন্ধুর রাজ্য—তাই তাঁহার আপনার রাজ্য ; তিনি জগতে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করেন—স্বাধীনভাবে সকল বস্তুর নিগূঢ় তত্ত্ব অন্বেষণ করেন—পাপের আবর্ত্ত ভিন্ন আর কোথাও তাঁহার বারণ নাই ; বালক যেমন পিতাকে স্বাধীন-ভাবে সকল বস্তুরই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করে, মনুষ্য সেইরূপ করিয়া ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রকৃতির সমস্ত তত্ত্ব একে একে অবগত হয়। ঈশ্বরের ভক্ত সন্তানের নিকট সকল জগৎই আপনার। শুষ্ক বিজ্ঞান বলিতে পারে যে, সূর্য্য তো তোমা-হইতে লক্ষ যোজন দূরে অবস্থিতি করিতেছে, সে আবার তোমার আপনার হইল কিরূপে ? শুদ্ধ কেবল ঘটনা-ক্রমে—দৈবগতিকে—সে তোমার চক্ষুর উপকারে আসিতেছে—এ ভিন্ন আর কিছুই নহে।” ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি যে, আকাশের [illegible]ক্ষিক ব্যবধানকে, বিজ্ঞান, তুমি যদি সত্য সত্যই অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান মনে কর, তবে তুমি এখনও প্রকৃত বিজ্ঞানের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছ ; তোমার যখন চক্ষু ফুটিবে তখন স্পষ্ট দেখিতে পাইবে যে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কেহ কাহারো পর নহে। শুষ্কবিজ্ঞান্ যন্ত্র-ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে জানে না—তাই সে যন্ত্র [illegible]রিয়াই অস্থির ; তাহার জড়ীভূত চক্ষে—চন্দ্রের মধুর জ্যোৎস্না পদার্থ-বিশেষের কম্পন বই আর কিছুই নহে ; মনুষ্যের প্রাণের কথা কণ্ঠনলী-যন্ত্রের উচ্ছ্বাস বই আর কিছুই নহে। কিন্তু যাঁহাদের চক্ষু আছে তাঁহারা দেখিতে পা'ন যে, সূর্য্য চন্দ্র তারকা ওষধি বনস্পতি সকলে মিলিয়া এক অনুপম শোভা উদ্গীরণ করিতেছে; যাঁহাদের কর্ণ আছে তাঁহারা শুনিতে পান যে, সূর্য্য নবানুরাগে উদিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিতেছে “আনন্দিত হও;” চন্দ্র মধুময় জ্যোৎস্নায় তাঁহাদিগকে বলিতেছে আনন্দিত হও;” মুক্ত সমীরণ মৃদু-হিল্লোলে তাঁহাদিগকে বলিতেছে “আনন্দিত হও” ; এবং ওষধি বনস্পতি গ্রীবা নত করিয়া মর্ম্মর ধ্বনিতে সেই কথারই পুনঃ পুনঃ অনুমোদন করিতেছে। এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানাং অসম্ভেদায়—লোক ভঙ্গ নিবারণার্থে পরমাত্মা সেতু-স্বরূপ হইয়া সমস্ত ধারণ করিতেছেন, তাই সকলেই সকলের মঙ্গল-ধ্বনিতে সমস্বরে কণ্ঠ মিলাইয়া যোগ দিতেছে। সমস্ত মঙ্গল সমাচার পরম পিতারই প্রেরণা। কিন্তু

যে ভাগ্যবান ব্যক্তি সাক্ষাৎ সেই প্রাণদাতার অমৃত আশ্বাস-বাণী প্রাণের অভ্যন্তরে শুনিতে পা'ন, তিনি সংসার-সমুদ্র নিমেষে তরিয়া যা'ন। তিনি মর্ত্তলোকে থাকিয়াই ব্রহ্ম-লোকে বাস করেন। তিনি বলেন "এষ ব্রহ্মলোকঃ" এই ব্রহ্মলোক; "তস্মাৎ বা এতং সেতুং তীর্ত্বা" সংসারের সেতু উত্তীর্ণ হইয়া "অন্ধঃ সন্ অনন্ধো ভবতি" অন্ধ যে সে অনন্ধ হয় "বিদ্ধঃ সন্ অবিদ্ধো ভবতি" বিদ্ধ যে—সে অবিদ্ধ হয়, "উপতাপী সন্ অনুপতাপী ভবতি" উপতাপী যে—সে অনু-পতাপী হয়; "তস্মাৎ বা এতং সেতুং তীর্ত্বাহপি নক্তং অহরেবাভিনিষ্পদ্যতে" এই সেতু উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি দিবা হইয়া উঠে, "সকৃৎ বিভাতোহ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ" এই ব্রহ্ম-লোক একবার এক-যে জ্যোতিতে উদ্ভাসিত—চিরকালই সেই জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্।" ব্রহ্মলোক পরমাত্মার জ্যোতির্ম্ময় রাজ্য; তাহাই মনুষ্যের স্বাধীনতার মূল আবাস স্থান। সূর্য্য যেমন তাহার কিরণ-সকলের নিলয়স্থান; ব্রহ্মলোক সেইরূপ সমস্ত জগতের সমস্ত স্বাধীনতার নিলয়স্থান—মুক্তির নিজ নিকেতন।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদের বন্ধু, তাই তোমার নিকট আমরা প্রার্থনা করিতেছি তুমি আমাদিগকে পাপ তাপ হইতে মুক্ত কর, ও তোমার প্রসন্ন মুখছবি আমাদের আত্মাতে প্রকাশিত কর। সুখে দুঃখে সকল সময়েই তুমি আমাদের পিতা, সকল সময়েই তুমি আমাদের বন্ধু, তুমি আমাদের নিকটে থাকিয়া আমাদের মুমূর্ষু আত্মাতে প্রাণদান কর; তোমাকে না দেখিলে আমরা বিষাদের অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া মোহ-শয্যায় অবসন্ন হইয়া পড়ি—তুমি দর্শন দান করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

দর্শন-সংহিতা—জ্ঞান-তত্ত্ব।

সিদ্ধান্ত ॥ ২ ॥

জ্ঞানের বিষয়।

আমরা সচরাচর যাহাকে বলি—জ্ঞানের বিষয়, জ্ঞানের বিষয় তাহা ছাড়া আরো কিছু অধিক। আশয়-সহকৃত বিষয়ই বিষয়—প্রত্যক্ষের কিম্বা ভাবনার বিষয় একদিকে—এবং জ্ঞাতা আপনি একদিকে—এই দুয়ের সমষ্টিই বিষয়; ইহার কমে বিষয় হইতে পারে না।

প্রমাণ।

জ্ঞানের মূল নিয়ম যাহা পূর্ব্ব সিদ্ধান্তে অটল-রূপে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা এই যে যে-কোন বস্তু হউক না কেন তাহাকে জানিতে হইলে তাহার সঙ্গে আপনাকে না জানিলেই নয়। ইহা যখন স্থির যে, সম্মুখস্থিত বিষয়কে এবং আপনাকে এক-সঙ্গে না জানিলে সম্মুখস্থিত বিষয়কে জানা হইতে পারে না—তখন তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রত্যক্ষের কিম্বা চিন্তার বিষয় একদিকে—এবং জ্ঞাতা আপনি একদিকে, এই দুয়ের সমষ্টিই জ্ঞানের সমগ্র বিষয়—জ্ঞানের প্রকৃত বিষয়; অথবা, আমরা যাহা কিছু জানি তাহাই আশয়-সহকৃত বিষয়; তাহাই প্রত্যক্ষের কিম্বা ভাবনার বিষয় এবং তাহার সঙ্গে আর একটি বস্তু—সেটি জ্ঞাতা আপনি। অতএব জ্ঞাতা আপনি বিষয় মাত্রেরই একটি সমগ্র এবং সার-ভূত অংশ।*

অপিচ; মনে কর যেন—একটি প্রত্যক্ষের কিম্বা ভাবনার বিষয় উপলব্ধি করা হইতেছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে আপনাকে উপলব্ধি করা হইতেছে না। এরূপ ঘটনা প্রথম সিদ্ধান্তের বিরোধী; কেননা, প্রথম

* অর্থাৎ, [illegible]—সমগ্র বিষয়; সুতরাং বিষয়ের একটি [illegible] ও আর-একটি অংশ বটে।

সিদ্ধান্ত বলে এই যে, আত্ম-জ্ঞান সকল জ্ঞানেরই সঙ্গের সঙ্গী, ও তাহাকে ছাড়িয়া কোন জ্ঞানই সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু প্রথম সিদ্ধান্ত অটল-রূপে সংস্থাপিত হইয়াছে—কুত্রাপি তাহার অন্যথা হইতে পারে না; অতএব আমাদের জ্ঞান-সন্নিধানে যাহা যখন উপস্থিত হয়—আমরা আপনারাও তাহার অন্তর্ভূত; আর, জ্ঞান-মাত্রেরই জ্ঞানের বিষয়—তিনি-যাহা-কিছু-জানিতেছেন-তাহার-সঙ্গে-তিনি আপনি—এ-ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

মন্তব্য এবং ব্যাখ্যান।

"তিনি যাহা কিছু জানিতেছেন-তাহার সঙ্গে-তিনি-আপনি" এই সাতটি শব্দকে সমাস-বদ্ধ করা হইল কেন ॥ ১ ॥

সর্ব্ব সাধারণতঃ জ্ঞান-মাত্রেরই বিষয় কি, তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিবার জন্য ঐ সাতটি শব্দকে সমাস সূত্রে গাঁথিয়া এক করিয়া দেওয়া হইল। উহারা যদি পৃথক্ পৃথক্ বিন্যস্ত হইত, তবে, সর্ব্ব-শুদ্ধ ধরিয়া উহারা যে, একটি-মাত্র জ্ঞানের বিষয় প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা পাঠকের তেমন বোধ-সুলভ হইত না। আমাদের কথা কাহারো মনোনীত হউক বা না হউক্—কিন্তু কেহ যে, তাহার অর্থ এক বুঝিতে আর বুঝিবেন—সে পথ আমরা রাখি নাই।

বিষয় বলিতে জ্ঞানের সমগ্র বিষয় বুঝিতে হইবে ॥ ২ ॥

বিষয় বলিতে এখানে জ্ঞানের এককালীন সমগ্র বিষয় বুঝিতে হইবে; যে-কোন মুহূর্ত্তে যাহাকিছু আমাদের জ্ঞান-সন্নিধানে উপস্থিত হয়, তাহার আপাদ মস্তক সমস্তটাই বিষয়-শব্দের বাচ্য। আমরা, উপস্থিত বিষয়ের বিশেষ কোন-একটি অংশের প্রতি, অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রা মনঃসমর্পণ করিতে না পারি এমন নহে। উপস্থিত বিষয়ের যে অংশটি বাহ্য-বস্তু, সেই অংশটিতে আমরা বেশী মাত্রা মনঃসমর্পণ করিও বটে। কিন্তু তাহা বলিয়া সেই অংশটিই যে সমগ্র বিষয়, তাহা নহে; তাহাকে বিষয় না বলিয়া বিষয়াংশ বলাই উচিত। বিষয়ের যে অংশটি বাহ্য বস্তু, দার্শনিক ভাষায় তাহা পরাক্ Objective অংশ, বা পরাচ্য অংশ, বলিয়া অভিহিত হইতে পারে; তদ্ভিন্ন তাহার আর একটি অংশ—যাহার প্রতি সচরাচর আমরা অতি অল্পই মনোনিবেশ করি কিন্তু যাহাকে ছাড়িয়া কোন জ্ঞানই সিদ্ধ হয় না—দার্শনিক ভাষায় তাহা প্রত্যক্ Subjective অংশ বা প্রতীচ্য অংশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে; প্রত্যক অংশ এবং পরাক্ অংশ, অথবা যাহা একই কথা—প্রতীচ্য অংশ এবং পরাচ্য অংশ এই দুয়ের সমষ্টিই সমগ্র বিষয়। * অথবা

* প্রত্যক অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে বলে Subjective—পরাক্ Objective।

"যে পরাগ্‌দর্শিনো বালাঃ প্রত্যগ্‌বোধ বিবর্জ্জিতাঃ।
কুর্ব্বতে কর্ম্ম ভোগায় কর্ম্ম কর্ত্তুঞ্চ ভুঞ্জতে॥"

পঞ্চদশী।

পরাগ্‌দর্শী (অর্থাৎ বাহ্য-দর্শী) প্রত্যগ্‌বোধ শূন্য (অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি শূন্য) বালকেরা ভোগের জন্যই কর্ম্ম করে এবং কর্ম্মের জন্যই ভোগ করে।

প্রাক্ শব্দ হইতে যেমন প্রাচী শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, প্রত্যক্ শব্দ হইতে সেইরূপ প্রতীচী শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রতীচী শব্দের চলিত অর্থ—পশ্চিম দিক্। উদীয়মান সূর্য্যকে সম্মুখ করিয়া দাঁড়াইলে পশ্চাৎ দিক্ এবং পশ্চিম দিক্ একই হইয়া দাঁড়ায়: পশ্চাৎ শব্দ এবং পশ্চিম শব্দ উভয়ের মূল-ধাতু একই। প্রতীচী শব্দের গোড়ার অর্থ—প্রতিকূলবর্ত্তী; পশ্চিম দিক পূর্ব্বদিকের প্রতিকূলবর্ত্তী তাই—প্রতীচী। প্রত্যক্ শব্দের মৌলিক অর্থ এই:—প্রতীপং (অর্থাৎ প্রতিকূলে) অঞ্চতি (গমন করে) ইতি প্রত্যক্। এখন প্রত্যক্ শব্দের দার্শনিক অর্থ কি—তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে;—উপনিষদে আছে—

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ আবৃত্ত চক্ষুরমৃতত্ব মিচ্ছন্॥" ইহার অর্থ;—

যাহা একই কথা সচরাচর যাহাকে আমরা বিষয় বলি তাহা বিষয়ের একাংশ-ভিন্ন আর কিছুই নহে, যদিচ সেই অংশটির প্রতি আমরা বেশী মাত্রা মনঃ সমর্পন করি। আশয়-সহকৃত বিষয়ই প্রকৃত পক্ষে বিষয়, কেন না তাহাই সর্ব্বাঙ্গীন বিষয়। সচরাচর যাহাকে আমরা বিষয় বলি, তাহাকে বিষয় না বলিয়া বিষয়ের পরাচ্য অংশ বলিলেই ঠিক্ হয়, আর, সচরাচর যাহাকে আমরা আশয়-মাত্র—অর্থাৎ শুদ্ধ কেবল জ্ঞানের আধার-মাত্র—বলি, তাহাকে বিষয়ের প্রতীচ্য অংশ বলিলেই ঠিক্ হয়। কিন্তু সচরাচর আশয় এবং বিষয়ের মধ্যে যেরূপ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ের ঐকান্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটানো হইয়া থাকে, তাহাতে, বিষয়ের মধ্য হইতে আশয় একেবারেই বাদ পড়িয়া যায়; সুতরাং ওরূপ ঐকান্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভ্রমাত্মক এবং স্ববিরোধী, আর, তাহা তত্ত্বজ্ঞান-পথের বিষম একটি বিঘ্ন।*

জ্ঞানের ভিত্তিমূলের প্রতি প্রণিধান-সূত্রে জ্ঞানের বিষয় কিরূপ নূতন আকার ধারণ করে ॥৩॥

জ্ঞানের ভিত্তিমূলের অবধারণ যাহা প্রথম সিদ্ধান্তে হইয়া চুকিয়াছে, তাহাতে করিয়া বিষয়ের অর্থ অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইবারই কথা। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে সেই পরিবর্ত্তনটি স্পষ্টাক্ষরে প্রকটিত হইয়াছে। সচরাচর, বিষয় বলিতে আমরা বিষয়ের একাংশ মাত্র বুঝিয়াই ক্ষান্ত থাকি। শুদ্ধ কেবল যাহা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহাকেই আমরা বিষয় বলি—তাহার সঙ্গে আমরা আপনারা যে জড়িত আছি তাহা আমরা দেখি না। এ-যাবৎকাল বিষয় বলিতে আমরা আত্ম-ব্যতিরিক্ত বিষয়ই বুঝিয়া আসিতেছি; এখন-অবধি বিষয় বলিতে আমরা আত্ম সহকৃত বিষয় বুঝিব।

প্রচলিত গণনা এবং দার্শনিক গণনা ॥৪॥

জ্ঞানের ভিত্তিমূলের বিবেচনা-গতিকে বিষয়ের কিরূপ অর্থ-পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা স্পষ্ট রূপে রাখিতে হইলে, বিষয় এবং আশয়ের প্রচলিত গণনা-পদ্ধতি, আর, তাহাদের দার্শনিক গণনা-পদ্ধতি, দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কিরূপ তাহা দেখা আবশ্যক। বৃত্তান্তটি এই যে, আমরা আপনাকে জানিতেছি এবং চতুর্দিকস্থ বিষয় সমূহ জানিতেছি; প্রচলিত গণনা-পদ্ধতি এই যে, যে-প্রণালীতে আমরা এক বস্তুকে আর আর বস্তু হইতে ভিন্ন বলিয়া গণনা করি, সেই প্রণালীতে আমরা আপনা-আপনাকে আর-আর বস্তু হইতে ভিন্ন বলিয়া গণনা করি। দার্শ-

স্বয়ম্ভূ পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়-সকলকে বহির্মুখ করিয়া দিয়াছেন, তাই তাহারা পরাক্ (Objective world) দর্শন করে। কোন কোন ধীর অমৃতত্ব ইচ্ছা করিয়া বাহির হইতে চক্ষু ফিরাইয়া প্রত্যক্ আত্মাকে দেখিয়াছেন।

বাহ্য বিষয় হইতে মনশ্চক্ষু ফিরাইয়া আত্মাকে দেখিতে হয়, এজন্য উপমাচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, বহির্বিষয় সম্মুখবর্ত্তী, আত্মা তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী—তাই প্রত্যক্। প্রত্যক্ আত্মা—কিনা জ্ঞানের পশ্চাৎ-আশ্রয়-স্বরূপ (back-ground) আত্মা; Subject কিনা জ্ঞানের ভিত্তিমূল স্বরূপ আত্মা; উভয়ের মর্ম্মার্থ একই। পরাক্ শব্দ প্রত্যক্ শব্দের প্রতিযোগী শব্দ, কাজেই তাহার ইংরাজী প্রতি-শব্দ, Objective, এ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। প্রত্যক্ শব্দের আর একরূপ অর্থ করা যাইতে পারে,—প্রতিবেশী বলিতে নিকটতম অধিবাসী বুঝায়; প্রত্যক্ বলিতে জ্ঞানের নিকটতম বিষয় বুঝিলেও তাহার উপরি-উক্ত মর্ম্মার্থের কোন ব্যত্যয় হয় না। এই কারণে Subjective part ইহার অনুবাদ—প্রত্যক্ অংশ অথবা প্রতীচ্য অংশ, Objective part ইহার অনুবাদ পরাক্ অংশ অথবা পরাচ্য অংশ, এইরূপ হইলেই ঠিক্ হয়।

* শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বেদান্ত-ভাষ্যের উপক্রমণিকায় স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "ন তাবদয়ং একান্তেনা বিষয়:" বিষয়ী একান্তই যে বিষয় নহে, তাহা নহে; "অস্মৎপ্রত্যয় বিষয়ত্বাৎ" যেহেতু বিষয়ী অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয়।

নিক গণনা-পদ্ধতি কিন্তু—আর-এক রূপ। মনে কর তিনটি বহির্বস্তু, স্, ৎ, র্, এই তিনটি হসন্ত অক্ষর দ্বারা সংজ্ঞিত হইল, এবং জ্ঞাতা আপনি "অ" এই অক্ষর দ্বারা সংজ্ঞিত হইল। প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, ঐ তিনটি বহির্বস্তুকে একে একে গণনা করিয়া তাহার পর আপনাকে গণনা করিলেই চলিতে পারে; তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, প্রথম, স; দ্বিতীয়, ৎ; তৃতীয়, র; চতুর্থ, অ। কিন্তু দার্শনিক গণনা-পদ্ধতি আর এক প্রকার—তাহা এই;—প্রথম, স্+অ; দ্বিতীয়, ৎ+অ; তৃতীয়, র্+অ; সংক্ষেপে—প্রথম, স; দ্বিতীয়, ত; তৃতীয়, র; অর্থাৎ (১) অকার-সহকৃত (কিনা আত্ম-সহকৃত) স, (২) অকার-সহকৃত ৎ, (৩) অকার-সহকৃত র। গণনা-কালে যে মুহূর্ত্তে আমরা "স্" এই বস্তুটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করি সেই মুহূর্ত্তেই তাহা "স" হইয়া দাঁড়ায়—অর্থাৎ অকার সহকৃত (কি না আত্ম-সহকৃত) হইয়া দাঁড়ায়; তাহার পর যখন সে বস্তুটিকে ছাড়িয়া "ৎ" এই বস্তুটির প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করি তখন তাহা "ত" হইয়া দাঁড়ায়; এইরূপ, যে-কোন মনুষ্যের যে-কোন জ্ঞান হউক না কেন—আত্ম-সহকৃত যাহা-হউক-একটা-কিছু সেই জ্ঞানের সেই মুহূর্ত্তের সমগ্র বিষয়। যদি, স্, ৎ, র্, এই তিনটি বস্তুকে আমরা একই মুহূর্ত্তে যুগপৎ গ্রহণ করি, তাহা হইলে দার্শনিক গণনায়—স্+ৎ+র্+অ, এক কথায়—স্ত্র, এইরূপ দাঁড়াইবে। আমি-বাচক ঐ যে অ, উহা সকল গণনারই বীজ মাত্রা, উহা বিষয়-মাত্রেরই অপরিহার্য্য অংশ, এবং জ্ঞান-মাত্রেরই ভিত্তি-মূল।

দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত ॥৫॥

দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত লৌকিক চিন্তার অনবধানিতা হইতে প্রসূত, এবং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায়—দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য জাজ্জ্বল্য-রূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠে; তাহা এই;—

প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত ॥৬॥

সচরাচর যাহা বিষয় বলিয়া অবধারিত হইয়া থাকে তাহাই সমগ্র বিষয়, বিষয়ের বিষয়ত্ব শুদ্ধ কেবল উহাতেই পর্য্যাপ্ত। প্রত্যক্ষের বা চিন্তার বিষয়—আত্ম-সহকৃতি হইতে বিচ্যুত হইলেও, তাহার বিষয়ত্বে কোন দোষ স্পর্শে না। আত্ম-চ্যুত বিষয়ও বিষয়।

বিষয়ের একটি অংশের প্রতি চক্ষু মুদিয়া তাহার আর-একটি অংশকে তাহার সর্ব্বাংশ মনে করা, লৌকিক চিন্তার অনবধানতা ভিন্ন আর কিছুই নহে; দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে এই লৌকিক ভ্রমটির সংশোধন করা হইল; প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের অনবধানতা—জ্ঞানের ভিত্তি-মূলের প্রতি; দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের অনবধানতা—বিষয়ের অংশ-বিশেষের (প্রতীচ্য অংশের) প্রতি। প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের ভ্রম এইটি যে, জ্ঞান আপনার ভিত্তি মূলের আশ্রয় ব্যতিরেকেও—আত্ম-জ্ঞান ব্যতিরেকেও—সিদ্ধ হইতে পারে। দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের ভ্রম এইটি যে, বিষয়ের প্রতীচ্য অবয়বটির অবিদ্যমানেও তাহার বিষয়ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। •

প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত অসত্য, তাই, দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত অসত্য ॥৭॥

যদি প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত সত্য হয়, তবে দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের ভিত্তি মূল পর্ব্বতের ন্যায় অটল। কিন্তু প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের বিনিপাতে দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের কোথাও আর দাঁড়াইবার স্থান নাই। জ্ঞানের ভিত্তি-মূলের আশ্রয়-ব্যতিরেকেও—আত্ম-জ্ঞান ব্যতিরেকেও—যদি কোন বিষয়কে জানা কোন জ্ঞাতার পক্ষে সম্ভব-সাধ্য হইত, তাহা হ-

হইলে, বিষয়ের প্রতীচ্য অংশ বাদ দিয়া তাহার পরাচ্য অংশ-টুকু স্বতন্ত্র উপলব্ধি করাও তাঁহার সাধ্য-সুলভ হইত। কিন্তু প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত প্রথম সিদ্ধান্তের বিরোধী—জ্ঞানের একটি স্বতঃসিদ্ধ এবং অবশ্যম্ভাবী সত্যের বিরোধী—এ জন্য তাহা সত্য হইতে পারে না; আর, দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, এজন্য তাহাও অসত্য এবং স্ববিরোধী বলিয়া তিরস্কার্য্য। ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, আমাদের প্রথম সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য স্বীকার করিতে হইলে, দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটিকে কোন মতেই রক্ষা করিতে পারা যায় না। যাঁহারা আমাদের গোড়ার কথাটিতে গ্রীবা অবনত করিয়াছেন,—জ্ঞানের বিষয়-মীমাংসার বেলায় তাঁহারা যে, লৌকিক চিন্তার পক্ষ অবলম্বন করিবেন, সে পথ একেবারেই অবরুদ্ধ; অগত্যা তাঁহাদিগকে দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের পক্ষ আশ্রয় করিতেই হইবে।

ঐ প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত মনোবিজ্ঞানেরও মত ব্যক্ত করিতেছে॥

জ্ঞানের বিষয়-সম্বন্ধে, দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত মনুষ্যের একটি প্রকৃতি-সুলভ ভ্রম ব্যক্ত করিয়াই ক্ষান্ত নহে—উহা মনোবিজ্ঞানেরও মত ব্যক্ত করিতেছে। মনোবিজ্ঞান আশয় এবং বিষয়ের মধ্যে কেবল এইরূপ একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংস্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হয় যে, একটি জানিতেছে—আর একটিকে জানা হইতেছে,—প্রথমটি আশয়—দ্বিতীয়টি বিষয়; এ-ভিন্ন, কোথাও সে এরূপ কথা বলে না যে, যখন বিষয়কে জানা হইতেছে তখন সেই সঙ্গে আশয়কেও জানা চাই,—কোথাও এরূপ কথা বলে না যে, জ্ঞাতার সঙ্গাশ্রয়-ব্যতিরেকে বিষয়ের বিষয়ত্বই সিদ্ধ হয় না। প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তে দেখা গিয়াছে যে, প্রচলিত মনোবিজ্ঞান লৌকিক চিন্তার দলে মিশিয়া জ্ঞানের ভিত্তিমূল দেখিয়াও দেখে না—এইটি মনোবিজ্ঞানের প্রথম সোপান-পংক্তি; দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তে দেখা গেল যে, মনোবিজ্ঞান লৌকিক চিন্তার সম্পূর্ণ অনুবর্তী হইয়া জ্ঞেয় বিষয়ের প্রধান একটি অংশ দেখিয়াও দেখে না এবং তাহার আর-একটি অংশকে তাহার সর্ব্বাংশ বলিয়া অবধারণ করে—ইহাই মনোবিজ্ঞানের দ্বিতীয় সোপান-পংক্তি। এখানেও মনোবিজ্ঞানের কথা-গুলা গোলমেলে। মনোবিজ্ঞান স্পষ্ট এ কথা বলে না যে, আশয়কে না জানিয়াও বিষয়কে জানা যাইতে পারে; তবে কি? না—"যে জানে সেই আশয় এবং যাহাকে জানা হয় তাহাই বিষয়" এই কথাটির উপর মনোবিজ্ঞান আপনার মতের সমস্ত ভর সংস্থাপন করাতে—প্রকারান্তরে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, যে জানে তাহাকে—অর্থাৎ জ্ঞাতাকে—না জানিলেও বিষয়-জ্ঞান নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারে। যাহাই হউক্—পরে পরে ক্রমশই প্রকাশ পাইবে যে, এখনকার প্রচলিত মনোবিজ্ঞান কার্য্যতঃ দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তেরই মতাবলম্বী, অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক্—প্রকারান্তরে—মনোবিজ্ঞান দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য অস্বীকার করে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের কথা অতীব সুস্পষ্ট; তাহা এই যে, আশয়-সংস্কৃত বিষয় ভিন্ন জ্ঞানের বিষয় হইতেই পারে না; এটা কেবল একটা কথার কথা নহে কিন্তু নিতান্তই অবশ্যম্ভাবী—কোন্ জ্ঞানেই ইহার অন্যথা সম্ভবে না; এবং ইহার বিপরীত পক্ষ নিতান্তই স্ববিরোধী এবং অর্থ-শূন্য।

পত্র।

দেওঘর ২০ কার্ত্তিক, ব্রা, সং ৫৭।
৫ নবেম্বর, ১৮৮৬ শাল।

মান্যশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু দুকড়ি ঘোষ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ২২ অক্টোবরের মুদ্রিত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানে আমি ছাড়া দুইটী মাত্র ব্রাহ্ম ও দুইটী ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি আছেন। তাঁহারা আপনার পত্র সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিতে অভিলাষী নহেন।

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ শিক্ষা, স্বভাব ও রুচি অনুসারে এক একটী প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি হেলিয়া পড়া বিচিত্র নহে। কেহ ব্রাহ্ম থাকিয়া বৈদান্তিক ধর্ম্মের প্রতি হেলিয়া পড়েন, কেহ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি, কেহ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি। ক্রিয়া কলাপেও ঐরূপ। কেহ সম্পূর্ণরূপে নূতন পদ্ধতি অনুসারে গার্হস্থ্য ক্রিয়া সম্পাদন করেন, কেহ বা পুরাতন পদ্ধতি অল্পাংশ পরিবর্ত্তন করিয়া তাহা অনুসরণ করিতে ধর্ম্মের হানি বোধ করেন না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই প্রকার সকল লোকই আছেন। এই প্রকার সকল লোকই এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই সংজ্ঞার সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন, কিন্তু আপনারা যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার ও প্রচারকের কর্ত্তব্য প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ঐ বিশ্বজনীন প্রকৃতি ব্যাহত হইবে।

আপনার প্রেরিত পত্রী পাঠ করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না যে আপনারা ব্রাহ্ম কাহাকে বলেন। আপনারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মতসারে বিধি দিয়াছেন "ধর্ম্ম ও জাতি নির্ব্বিশেষে সকল শাস্ত্র ও ব্যক্তির উপদেশ হইতে সাদরে সত্য গ্রহণ করিবে।" আমি জিজ্ঞাসা করি যদি কোন ব্যক্তি আধ্যাত্মিক ধনের জন্য অন্য কোন জাতির নিকট যাইবার আবশ্যক নাই মনে করিয়া, আমাদিগের ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় কেবল হিন্দুশাস্ত্র হইতে সত্য গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে আপনারা ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করিবেন কি না। বোধ হয় করিবেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসারে আপনারা বিধি দিতেছেন "ধর্ম্ম ও জাতি নির্ব্বিশেষে সকল শাস্ত্র ও ব্যক্তির উপদেশ হইতে সাদরে সত্য গ্রহণ করিবেক।"

আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসারে লিখিয়াছেন "ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছাতে সম্মিলিত হওয়াই মুক্তি।" কোন ব্রাহ্ম যদি বলেন যে পাপ তাপ ও সংসারিক দুঃখ ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্তি পূর্ব্বক চিরকাল ব্রহ্মানন্দ উপভোগই যথার্থ মুক্তি (জীবন্মুক্তি এই মুক্তির অন্তর্ভূত) তাহা হইলে আপনারা তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করিবেন, কিনা? বোধ হয় করিবেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসারে আপনারা লিখিয়াছেন "ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছাতে সম্মিলিত হওয়াই যথার্থ মুক্তি।"

আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসারে লিখিয়াছেন "বিবেক বাণী ঈশ্বরের ইচ্ছা।" উহাতে ঈশ্বরানুপ্রাণনের কথা কোন স্থানে উল্লেখ করেন নাই। যে বিষয়ে কিছু থাকা কর্ত্তব্য, যেহেতু তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী প্রধান মত। কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিলে ঈশ্বরানুপ্রাণন বুঝায় না। যদি কোন ব্রাহ্ম ঈশ্বর আমাদিগকে জ্ঞানালোক ও ধর্ম্মবল প্রেরণ করেন এবং আমাদিগকে শুভ বুদ্ধিতে নিযুক্ত করেন এবং বিশ্বাস করেন তাহা হইলে

তাঁহাকে আপনারা ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করিবেন কি না।

আপনারা প্রচারকদিগের কর্ত্তব্যে লিখিয়াছেন "ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মান ধর্ম্ম-প্রচারকেরা গ্রহণ করিবেন না।" ঈশ্বর-প্রাপ্য সম্মান কাহাকে বলেন ? আমাদিগের দেশীয় প্রথানুসারে যদি কোন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম-প্রচারককে প্রণিপাত করেন তাহা ঈশ্বর-প্রাপ্য সম্মান মনে করেন কি না ? যদি কেহ ঐরূপ প্রণিপাত করেন তাহা হইলে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য বলিয়া গণ্য করিবেন কি না ? এই বিষয়ে আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিলে ভাল হয়।

আপনারা লিখিয়াছেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক "অনুষ্ঠানে জাতিভেদ প্রশ্রয় দিবেন না।" যদি আমাদিগের ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় কোন একান্ত ব্রহ্মপরায়ণ ধার্ম্মিক ব্যক্তি অনুষ্ঠানে জাতিভেদ পালন করেন তাহা হইলে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য বলিয়া গণ্য করিবেন কিনা ? বোধ হয় করিবেন না। কিন্তু অনেক ব্রাহ্ম এমন আছেন যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে সামাজিক বিষয়ে যাঁহার যেমন বিবেচনা ও রুচি সেইরূপ কার্য্য করিলে ব্রাহ্মের কর্ত্তব্যের কোন হানি হয় না।

আপনারা লিখিয়াছেন যে "ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠানে বিবেক বা নীতির অবমাননা করা হয় তাহাতে যোগ দিবেন না।" এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে যদি কোন ব্রাহ্ম আপনার কন্যার চরিত্র পবিত্র রাখিবার জন্য নিজের বিবেক অনুসারে ত্রয়োদশ বৎসরে তাঁহার বিবাহ দেন তাহা হইলে আপনাদিগের দৃষ্টিতে তিনি বিবেক ও নীতির অবমাননা করেন কি ? যদি আপনারা বলেন যে অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য এবং অধিক বয়সে বিবাহ দিলে চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষার কোন হানি হয় না তাহা হইলে বক্তব্য এই যে অনেক ব্রাহ্ম এমন আছেন যাঁহারা বলেন অধিক বয়সে বিবাহ দিলে চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা কঠিন হয়, অতএব রজোদর্শন হইলেই বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। আপনারা তাঁহাদিগের বিবেকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবেন কি না ?

যদি কোন ব্রাহ্ম স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র পবিত্র রাখিবার জন্য নিজের বিবেকানুসারে গমনাগমন বিষয়ে তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা দিতে অনিচ্ছুক হয়েন তাহা হইলে সে অনিচ্ছা আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ জ্ঞান করেন কি ? বোধ হয় করেন. কিন্তু অনেক ব্রাহ্ম এমন আছেন যাঁহাদিগের বিবেক বলে যে নারী-চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা জন্য এরূপ স্বাধীনতা প্রদান অবিধেয়। তাঁহাদিগের বিবেক প্রতি আপনারা সম্মান করিবেন কি না ?

যদি আমাদিগের প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় কোন একান্ত ব্রহ্মপরায়ণ ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণবংশীয় ব্রাহ্ম কেবল কৌলিক রীতির অনুরোধে পৌত্তলিকতার সহিত কোন সংশ্রব না রাখিয়া আপনার পুত্রের উপবীত দেন তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন কি না ?

এইরূপ আপনাদিগের প্রেরিত ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার ও প্রচারকদিগের কর্ত্তব্য ধরিয়া শত শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে এইরূপ কোন ব্রাহ্মের মত হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলা যায় কি না, এবং এরূপ কার্য্য করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য বলা যায় কি না ? যদি কোন বিশেষ সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট মত অথবা কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ না করিলে কোন ব্যক্তি ব্রাহ্ম নহেন অথবা ব্রাহ্ম

ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য না করেন বলা যায় তাহা হইলে সাম্প্রদায়িকতার একশেষ হয়। এইরূপ সাম্প্রদায়িকতা অন্য ধর্ম্মে পোষায়, ব্রাহ্মধর্ম্মে পোষায় না। রামমোহন রায় ব্রাহ্ম শব্দের সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি ঐ শব্দের "ব্রহ্মের উপাসক" এই অর্থ করিতেন। সামাজিক বিষয়ে কোন ব্যক্তির যে মত হউক না কেন, কোন প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি কোন ব্যক্তির পক্ষপাত থাকুক না কেন, নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরের উপাসক হইলেই তিনি তাহাকে ব্রাহ্ম বলিতেন। আমরা যদি ব্রাহ্ম শব্দে আর কিছু বুঝি তাহা হইলে ঐ শব্দের ব্যবহার আমাদিগের পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ঐ শব্দের সৃষ্টিকর্ত্তা যে অর্থে উহা ব্যবহার করিতেন আমরা সেই অর্থ প্রসারণ করিতে পারি, সঙ্কোচ করিবার কোন অধিকার নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজ যতদূর পারেন ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা রক্ষা করিতেছেন। জাতি, সম্প্রদায়, মত নির্ব্বিশেষে যে কেহ নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনা করিতে অভিলাষী হন আদি ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপাসনা করিতে পারেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অনুষ্ঠানপদ্ধতি আছে বটে কিন্তু যে ব্রাহ্মেরা তাহা অনুসরণ না করেন, নিজের বিবেকানুসারে প্রাচীন পদ্ধতি কেবল আচার মাত্র জ্ঞান করিয়া তদনুসারে গার্হস্থ্য ক্রিয়া সম্পাদন করেন তাঁহারা ব্রাহ্ম নহেন এমত আমরা বলি না। আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজ আছে, কিন্তু তাহা বীজ মাত্র। প্রত্যেক ব্রাহ্ম আপনার জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে তাহা বিকশিত করিয়া লইতে পারেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবের সঙ্গে মিল থাকিলেই হইল। উদারতা বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান প্রকৃতি অনেকটা আদি ব্রাহ্মসমাজের ন্যায়। যদি আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা রক্ষা করিতে চাহেন তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান প্রকৃতি অব্যাহত রাখুন। যদি কোন বিশেষ মত আপনারা প্রচার করিতে চাহেন আপনাদিগের মধ্যে যাঁহারা সেই বিশেষ মতাবলম্বী (কোন বিশেষ মতের অনুবর্ত্তী লোক ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অবশ্যই পাইবেন কারণ আমি দেখিয়াছি এক একটী ব্রাহ্ম এক একটী সম্প্রদায়) তাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অব্যাহত রাখিয়া একটী প্রচার সভা সংস্থাপন করিয়া তাহাকে 'প্রচারক সভা' এই মাত্র নাম দিয়া সেই বিশেষ মত প্রচার করিতে পারেন তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সাধন ও প্রচারকের কর্ত্তব্য সাধন নির্দ্ধারণ করিবেন তাহা থাকিবে না। থাকিলেও আপনাদিগের মধ্যে হইতেই যে দল উঠিবে তাহারা পরিবর্ত্তন করিবে। এইরূপ পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন চলিবে। কমিটি সবকমিটির অবধি থাকিবে না। অতএব ব্রাহ্মসমাজকে মতবদ্ধ (Creed bound) করিতে চেষ্টা করা বৃথা, বিশেষতঃ আপনারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে এরূপ শৃঙ্খল-বদ্ধ করা উচিত হয় না। তাহাতে সকল প্রকার ব্রাহ্মের স্থান পাওয়া কর্ত্তব্য, আসল বিষয়ে মিল থাকিলেই হইল।

নিবেদক

শ্রী রাজনারায়ণ বসু।

পুঃ উপরে যে সকল আধ্যাত্মিক অথবা সামাজিক কথা উত্থাপিত হইল সেই সকল বিষয়ে আমার নিজের মত কিছু প্রকাশ করিলাম না। যাহা বলিলাম তাহা সাধারণতঃ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলাম।

এই পত্রের প্রাপ্তি সংবাদ দিলে এবং তাহা আপনাদিগের ২০ নবেম্বরের সভায় পাঠ করিলে পরম বাধিত হইব।

বিবিধ।

আমরা গত ভাদ্র মাসের তত্ত্ববোধিনীতে সালঙ্কার সত্যের অপকারিতা দেখাইবার নিমিত্ত একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। পুনা প্রবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় গত আশ্বিন মাসের ধর্ম্মপ্রচারকে তাঁহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন পৌরাণিকেরা রূপকচ্ছলে যে সমস্ত নীতি শিক্ষা দিয়াছেন তদ্দ্বারা লোকের যথেষ্ট উপকার হয় ইত্যাদি। দীননাথ বাবু আমাদের প্রবন্ধ বোধ হয় মনোভিনিবেশ দৃষ্টিতে দেখেন নাই। তাহা হইলে তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ লোকের কদাচ এরূপ ভ্রম হইত না। পুরাণে এবং অন্যান্য কাব্যে রূপোপাখ্যানাদির ন্যায় রূপকের আশ্রয় লইয়া অনেক উচ্চ নীতির উপদেশ দ্বারা যে জগতের উপকার হইয়াছে আমরা তাহা অস্বীকার করি না। রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ পাঠে বুঝা যায় যে নীতি গল্পের মধ্যে থাকিলে লোকের হৃদয়স্পর্শী হয় কিন্তু আমাদের বক্তব্য অন্য প্রকার। আমরা কহিয়াছিলাম উপনিষদ যেরূপ সরল ভাব ও ভাষায় ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন পুরাণ সেরূপ পারেন নাই। তিনি রূপক বা অলঙ্কারের আশ্রয় লইয়া এই হইয়াছে যে লোকে অগ্রে সেই অলঙ্কারের আভায় মোহিত হইয়া যায়। তাহার অভ্যন্তরে কি যে সত্য আছে তাহার অনুসন্ধানে আর তাহার অবসর হয় না। আমরা এই কথার উল্লেখ করিয়া রাধা কৃষ্ণের মূর্ত্তিকে প্রমাণস্থলে আনিয়াছিলাম এবং এই প্রচ্ছন্ন সত্যে লোকের যে কতদূর অনিষ্ট হইয়াছে তাহাও দেখাইয়াছি। আমরা এস্থলে দীননাথ বাবুর প্রতীতির নিমিত্ত প্রাচীন গ্রন্থ হইতে এইরূপ আরও একটী প্রচ্ছন্ন সত্যের নিদর্শন দেখাইতেছি। বাস্তবিক ইহা দ্বারা লোকের বুদ্ধি মোহ জন্মিবার সম্ভাবনা আছে কি না তিনি আপনিই বুঝিয়া দেখুন। বিষ্ণুস্মৃতিতে একস্থলে ব্রহ্মধ্যান অভ্যাস করিবার উপদেশ আছে। গ্রন্থকার প্রথমে স্পষ্ট কথায় বলিলেন আত্মাতে ঈশ্বরকে না দেখিলে মুক্তি নাই। কিন্তু এই ব্রহ্মধ্যান সহজ নয়। এই বুঝিয়া তিনি প্রথমে কহিলেন স্থূল পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম আকাশে সমাধি অভ্যাস কর তাহা হইলে ব্রহ্মধ্যানে সিদ্ধ হইবে। অর্থাৎ তিনি মনে করিয়াছিলেন স্থূল পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ভূতে সমাধি অভ্যাস সহজ হইবে। কারণ পৃথিবী অপেক্ষা জল ব্যাপক, জল অপেক্ষা তেজ ব্যাপক, তেজ অপেক্ষা বায়ু ব্যাপক, বায়ু অপেক্ষা আকাশ ব্যাপক। এই ব্যাপক আকাশকে যে চিত্তে ধারণ করিতে পারিবে সে এই পঞ্চভূতের অতীত অথচ ইহার অন্তর্ব্বর্ত্তী অরূপী ব্যাপক ব্রহ্মকে ধ্যান করিতে পারিবে। প্রথমে এইরূপ উপদেশ দিয়া তিনি ধ্যানসৌকর্য্যের নিমিত্ত আবার কহিলেন যদি ইহাতেও সমাধি অভ্যাস না হয় তাহা হইলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিকে ধ্যান করিবে। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে শঙ্খ চক্রাদি আকাশাদি ভূতের স্মারকচিহ্ন। যিনি এই চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি অবলম্বনে ধ্যান অভ্যাস করিবেন তিনি যথার্থ মূর্ত্তিমাত্রকে ধ্যান করিলে চলিবে না কিন্তু যে ব্রহ্ম এই আকাশাদি ভূতের অতীত অথচ ইহাতে ব্যাপ্ত এই বিষ্ণুমূর্ত্তি অবলম্বনে সেই ব্যাপক ব্রহ্মকেই ধ্যান করিতে অভ্যাস করিবে। এখন দীননাথ বাবু বুঝিয়া দেখুন এই অলঙ্কারে প্রচ্ছন্ন সত্য দ্বারা জগতের অনিষ্ট আছে কি না। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নিরাকার সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের ধ্যান। তিনি প্রথমে স্পষ্টই বলিলেন আপনার আপনার আত্মাতে এই ব্রহ্মদর্শন

এই ঘোর বিপ্লবের সময় সভা সমিতি বা যে কোন উপায়ে হউক যিনি এই হিন্দুজাতির বিনাশোন্মুখ ধর্ম্ম রীতি নীতি রক্ষার সূচনা করিবেন তিনি বাস্তবিক এ দেশের একজন পরম বন্ধু। অনেকের সংস্কার ইংরাজী শিক্ষা দেশের উপকার ও অপকার দুই করিতেছে। আমরাও তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু এই বৃদ্ধ হিন্দুর ন্যায় যিনি ইংরাজী ভাষায় উচ্চ শিক্ষা পাইয়া স্বদেশানুরাগের এইরূপ উচ্চ আশা হৃদয়ে ধারণ করেন আমরা তাঁহাকে রত্নের ন্যায় মস্তকে বহন করিতে প্রস্তুত আছি। যথা হিন্দু সমিতিতে হিন্দু সাধারণের হৃদয়ে কিরূপ ভাব মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইবে রাজনারায়ণ বাবু তাহার একটু নিদর্শন দিয়াছেন। আমরা আগ্রহের সহিত নিম্নে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"হিন্দু নাম আমরা কখনই পরিত্যাগ করিতে পারি না। হিন্দু নামের সঙ্গে কত হৃদয়গ্রাহী ও মনোহর ভাব জড়িত রহিয়াছে। হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই সরস্বতী-নদী-তীর-বাসী আদিম আর্য্যদিগের বরণীয় মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়, যাঁহারা ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের নিকট সম্বন্ধ অনুভব করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—

"ত্বং হি নো পিতা বসো ত্বং হি নো মাতা," "সখা পিতা পিতৃতমঃ পিতৃণাম" "স্বাদ সখ্যং সাধ্বী প্রণীতি" "ত্বং অস্মাকং তবাস্মি।"

"তুমি আমাদিগের পিতা, তুমি আমাদিগের মাতা," তুমি সখা, পিতা, পিতৃগণের মধ্যে পরম পিতা," "তোমার বন্ধুতা অতি সুস্বাদু," "তুমি আমাদিগের আমরা তোমার।" হিন্দুনাম উচ্চারিত হইলে আমাদিগের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই তিত্তির ঋষির বরণীয় মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, যিনি বলিয়া গিয়াছেন,

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যোবেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোহশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।"

যিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ পরম ব্রহ্মকে আপনার হৃদয়াকাশে স্থিত বলিয়া মানেন, তিনি সেই জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত সকল কামনা উপভোগ করেন।" হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদিগের মনচক্ষু সম্মুখে সেই বরণীয় আর্য্যমূর্ত্তি মাণ্ডুক্য আসিয়া উপস্থিত হয়েন, যিনি বলিয়াছেন, "শান্তং শিবমদ্বৈতং" তিনি শান্তস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ এবং অদ্বৈত স্বরূপ।" যখন আমরা এই হিন্দু নাম উচ্চারণ করি, তখন আমাদিগের স্মৃতিক্ষেত্রে ব্রহ্মবর্চ্চাম্বরজটা-কলাপধারী ব্যাসের বরণীয় মূর্ত্তি আসিয়া আবর্ত্তিত হয়, যিনি বলিয়াছেন. "আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ।" "আপনার মঙ্গলের যাহা প্রতিকূল, পরের প্রতি তাহা করিবে না।" যখন আমরা এই হিন্দু নাম উচ্চারণ করি, তখন আমাদিগের মনশ্চক্ষু সম্মুখে মধুরস্বভাব অথচ স্বাধীনাত্মা বশিষ্ঠের বরণীয় মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, যিনি বলিয়াছেন,

"যুক্তিযুক্তং উপাদেয়ং বচনং বালকাদপি অন্যং তৃণমিব ত্যাজমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা।"

"বালক যদি যুক্তিযুক্ত বাক্য বলে, তাহা উপাদেয়; আর স্বয়ং ব্রহ্মা যদি অযুক্তিযুক্ত বাক্য বলেন, তাহাও তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে।" হিন্দুনাম উচ্চারিত হইলে, আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই নবীন দুর্ব্বাদলশ্যাম ধীর প্রশান্ত-মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়েন, যিনি পিতৃসত্যপালন নিমিত্ত চতুর্দ্দশ বৎসর কাল অরণ্যে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন ও সংযত মনের এবং পরস্পর বিপরীত গুণের সামঞ্জস্যের সর্ব্বোত্তম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে, আমাদের মানসক্ষেত্রে সেই নন্দের নন্দন

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হয়েন, যিনি জ্ঞানীর শিরোমণি, প্রেমিকের শিরোমণি, যিনি ধর্ম্মবক্তার প্রধান, যাঁহার কথিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সকল কালের সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুকর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মান্য হইয়া আসিতেছে এবং বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার কালেও ভারতবর্ষে ও য়ুরোপখণ্ডে উভয়ত্রই স্বীয় প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছে; যিনি ভক্তি ও প্রেমধর্ম্মের সংস্থাপক অথচ রাজনীতিজ্ঞ ও কৌশলীদিগের চূড়ামণি, যাঁহার বিচিত্র মহিমা কবীন্দ্র সকল স্বীয় স্বীয় রচিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থে যথোপযুক্ত রূপে বর্ণন করিতে পরাস্ত হইয়াছেন, যাঁহার পরমাদ্ভুত চরিত্র মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ সূক্ষ্মরূপে ব্যবচ্ছেদ করিতে চিরকালই হারি মানিয়াছেন ও মানিতেছেন। হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে, আমাদিগের মনশ্চক্ষু সম্মুখে যুধিষ্ঠির আসিয়া আবির্ভূত হয়েন, যাঁহার নাম ভারতবর্ষে ধর্ম্ম শব্দের প্রতিবাক্যস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দুনাম উচ্চারিত হইলে, সেই অলোক-সামান্য পুরুষ আমাদিগের মনশ্চক্ষু সম্মুখে উপস্থিত হয়েন, যিনি যুধিষ্ঠিরকে আপনার মৃত্যুসাধনের উপায় বলিয়া দিয়া অসাধারণ মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং শরশয্যার কঠোর যন্ত্রণার মধ্য হইতে পাণ্ডবদিগকে অশেষ অমূল্য ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ নাম উচ্চারিত হইলে, সেই মহামনা রাজর্ষি জনক আমাদিগের স্মৃতিক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েন, যিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী থাকিয়াও, এক মুহূর্ত্ত অধ্যাত্ম যোগ হইতে স্খলিত হইতেন না। এই নাম উচ্চারণ করিলে, মহাত্মা পুরুরবাকে স্মরণ হয়, যিনি এলেক্‌জাণ্ডারের নিকট শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া বন্দীভাবে নীত হইলে এবং এলেক্‌জাণ্ডার "তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিব" এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, "এক রাজা অন্য রাজার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে, সেইরূপ করিবেন" এই উত্তর দিয়াছিলেন। হিন্দু নাম কি মনোহর। ঐ নাম কি আমরা কখন পরিত্যাগ করিতে পারি? এই নাম ঐন্দ্রজালিক প্রভাব ধারণ করে; এই নাম দ্বারা বাঙ্গালি, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, রাজপুত, মাহারাট্টা, মান্দ্রাজী—সমস্ত হিন্দুগণ একহৃদয় হইবে; তাহাদিগের সকলের এক প্রকার উন্নত কামনা হইবে; সকল প্রকার স্বাধীনতালাভ জন্য তাহাদের সমবেত চেষ্টা হইবে। অতএব যে পর্য্যন্ত আর্য্যশোণিতের শেষ বিন্দু আমাদিগের শিরায় প্রবাহিত হইবে, সেই পর্য্যন্ত আমরা এ নাম পরিত্যাগ করিব না। * * * *

* * * * *

মহদ্বাক্য।

(২৬)

মঙ্গল সাধনই ধর্ম্মের প্রাণ।

(২৭)

উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রধান সহায় কি? সত্যানুসন্ধিৎসা।

(২৮)

যে ভয়ের বশীভূত সে ঘোর দুঃখের ভাগী। ঈশ্বরের রাজ্যে ভয় করিবার কিছুই নাই।

(২৯)

ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে স্বর্গে যাইতে হয় না, স্বর্গ তাঁহার হৃদয়ে আপনা হইতেই অবতীর্ণ হয়।

(৩০)

ধার্ম্মিক ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রসাদের অধিকারী হয়েন এবং তাঁহা কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়েন।

(৩১)

জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ জন্য ধনোপার্জ্জন, ধনোপার্জ্জনের জন্য জীবন নহে। এই সহজ সত্যটি কত লোক ভুলিয়া রহিয়াছে।

(৩২)

আমি প্রায় কখন দুঃখে পড়িয়া অসন্তোষ প্রকাশ করি নাই। একবার দারিদ্র্য জন্য পাদুকা আহরণ করিতে পারি নাই তজ্জন্য অনাবৃত পদে বহু পথ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল বলিয়া বড় কষ্ট হইয়াছিল। যখন ঐ কষ্টে বড়ই অবসন্ন হইয়াছিলাম, তখন একটী ধর্ম্মালয়ে প্রবেশ করিয়া বিপদহীন একটী ব্যক্তিকে দেখিতে পাই। তাহার দশা দেখিয়া আমি পাদুকার অভাব ভুলিলাম এবং ঐ ব্যক্তির সহিত তুলনায় আমার প্রতি ঈশ্বর যে দয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম।

(৩৩)

ঈশ্বর পাপীর একমাত্র অকৃত্রিম বন্ধু।

(৩৪)

জগতের উচ্চতা ও গম্ভীরতা তোমারই মধ্যে বিলয় পাইয়াছে, হে ঈশ্বর, আমি জানি না তুমি কি? যাহা তুমি তাহাই তুমি।

(৩৫)

যে আপনাকে অসুখী মনে করে, সেই [illegible] অসুখী।

(৩৬)

সেই ব্যক্তিই নিরাপদ, যে সরল ও [illegible] সম্পন্ন।

(৩৭)

আমরা অনন্ত উন্নতির অধিকারী, ইহাই ঈশ্বরের সুন্দরতম নিয়ম।

(৩৮)

যে মানুষের পার্থিব পদ যত উচ্চ তাহার অধীনতা [illegible] কম।

(৩৯)

যে স্বীয় বিবেক শক্তি হারায়, সে সকলই হারায়।

(৪০)

ধর্ম্ম কার্য্য প্রথমতঃ বড়ই কঠিন ব্যাধা বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ঈশ্বরের এমনই করুণাময় নিয়ম, যে যে ব্যক্তি বদ্ধপরিকর হইয়া ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হয় এবং ধর্ম্ম কার্য্য সাধন করিতে থাকে, তাহার পক্ষে ধর্ম্ম সাধন কিছুকাল পরেই সহজসাধ্য হয় এবং আরও কিছুকাল পরে সুখকর ও আনন্দকর হইয়া উঠে।

(৪১)

তুমি মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেছ না বলিয়া বিমর্ষ হইও না। ঈশ্বর সকলকে সমান করিয়া প্রস্তুত করেন নাই। তোমার যেরূপ ক্ষমতা, যেরূপ সুবিধা তাহারই উপযুক্ত ব্যবহার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাক—ঈশ্বর তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন না।

(৪২)

প্রকৃত ও স্থায়ী উন্নতি অনেক বিলম্বে ও অনেক কষ্টে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমাদিগের চরিত্র আমাদিগের চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যের সমষ্টির ফল। অতএব এই তিনটিকেই নিয়মিত ও সুপরিচালিত করিবে।

কেবল সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাসে চরিত্র গঠিত হয় না। ইচ্ছার বল চাই, আত্মত্যাগের ক্ষমতা চাই, [illegible] চাই। তদ্ব্যতীত চরিত্র উন্নত হইতে পারে না।

[illegible]

জ্যোতি।

কিরিয়ে আনিতে প্রাণ থামিয়াছে গান,
হসিত কুসুম দল গিয়াছে মরিয়া।
ললিত বাঁশরী আর বাজে না কো কোথা
বিরহ-বিষাদে সব গিয়াছে ভরিয়া।
শ্যামল প্রান্তর নাই, মরুময় স্থান
চারিধারে আর—আর নাহি গায় কেহ;
আঁধার গহ্বরে শুধু পিশাচের দল
করিছে বিকট নৃত্য—টুটে প্রেম স্নেহ।
থেকে থেকে ভীমরবে কাঁপাইছে ধরা,
ছড়াইছে চারিদিকে গরলের রাশ;
অমৃত লুকায়ে আছে গরলের ভয়ে
অমৃত বিহীন হ'য়ে হৃদয় হতাশ।
কোথায় জ্যোতির্ময়—অনন্ত মহান
আইস—চাহিয়া দেখ হৃদয়ের পান;
তোমার জ্যোতির কণা কর এরে দান
উদিবে অরুণ জ্যোতি, নিশি অবসান।

দুর্ব্বল আপনা জানি কর হাহাকার।
কিন্তু জেন দয়াময় সহায় তোমার॥
একান্তে করহ ইচ্ছা পেতে ধর্ম্ম-বল।
সে ইচ্ছা তোমার হবে অবশ্য সফল॥
তাঁর ইচ্ছা এই—তাঁর প্রত্যেক সন্তান।
তাঁর পথে—ধর্ম্ম-পথে হবে আগুয়ান॥
তিনি প্রিয় পুত্র কন্যা সবার অন্তরে।
দেন শুভ যোগ মতি তরিবার তরে॥
হৃদয় খুলিয়া কর তাঁরে আবাহন।
লৌহের কবাট হৃদি না কর বেষ্টন॥
আসিবেন হৃদি তব জানিহ নিশ্চয়।
ডাকিলে যে দেখা দেন—সেই দয়াময়॥
হৃদয় তাঁহারে তুমি করহ অর্পণ।
করিবেন তাহা তিনি অবশ্য গ্রহণ॥
কুপুত্র যদ্যপি চায় পিতার শরণ।
বলে "অপরাধ ক্ষম—দাও শ্রীচরণ"॥
বিমুখ তাহারে পিতা কভু নাহি হ'ন।
করেন তাহারে লয়ে ক্রোড়ে আলিঙ্গন॥
পরম পিতার হয় সেরূপ ব্যভার।
পাপী তাপী সেই চায় ক্ষমা পায় তাঁর॥
প্রেম-অগ্নি যিনি দেখি ভকতের চিতে।
চাহেন সে অনলেরে ক্রমিক বার্দ্ধিতে॥
তব অনুরাগে তিনি করি বারি দান।
করিবেন একেবারে তাহারে নির্ব্বাণ?
যদি চাও তাঁর ধর্ম্ম করিতে বজায়।
বলে না দিবেন তিনি তাহার উপায়?
পাপ হ'তে উদ্ধারিতে যদি ডাক তাঁরে।
হাত ধরি তুলি নাহি ল'বেন তোমারে?
তাঁর কাছে গিয়া তুমি করিলে ক্রন্দন।
নাহি করিবেন তব অশ্রু বিমোচন?
পথ-হারা হয়ে যদি ভীষণ গহনে।
কাতর পরাণে তাঁরে ডাক এক মনে॥
শুনিবেন নাহি তিনি—তোমার বচন।
কাছে আসি না দিবেন অভয় শরণ?
তিনি যে করুণাময় কাতর-তারণ।
অগতির গতি তিনি পতিত-পাবন॥
তাঁর দিকে এক পদ যদ্যপি বাড়াও।
"পিতা লও কোলে" বলি তাঁর পানে চাও॥
দেখিবে সহস্র পদ হয়ে অগ্রসর।
তোমারে লবেন কোলে আসিয়া সত্বর॥
আমাদের কণা মাত্র প্রীতি যদি পান।
সেই প্রীতি করিবারে আরো বর্দ্ধমান॥
শত ধার প্রীতি-সুধা করেন বর্ষণ।
অন্তরে বাহিরে সদা দিয়া দরশন॥
এস সবে মলিনতা করি বিসর্জ্জন।
সরল হৃদয়ে যাই তাঁহার সদন॥

প্রার্থনা।

দয়া করি কর নাথ। জীবন জীবন!
তোমারে জীবন যেন করি সমর্পণ॥
তুমি হে জ্যোতির জ্যোতি! আলোকে তোমার।
বিনাশ বিনাশ মম হৃদয় আঁধার॥
তোমা পানে আমি যেন চাহি নিরন্তর।
থেকোনা থেকোনা নাথ! দূরে অন্তর॥
দীন হীন মলিনতা করি পরিহার।
একান্ত অধীন এবে হইনু তোমার॥
বিষয়ের মায়া-জালে আর না ভুলিব।
তোমার চরণছায়া আর না ছাড়িব॥
এ জীবন তোমাতেই সমাধ করিব।
নব নব ভক্তি হারে তোমারে পূজিব॥
আমার সর্ব্বস্ব নাথ! করহে গ্রহণ।
আমার সর্ব্বস্ব হও এই আকিঞ্চন॥

ইতি বিংশ ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ
মহাশয়েষু।

সাদর নিবেদন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহ এত জীর্ণ হইয়াছে যে ১১ মাঘের মহোৎসবে যে প্রকার বহু লোকের সমারোহ হয় তাহাতে সাংঘাতিক বিপদের সম্ভাবনা। অতএব সাবধান হই-বার জন্য আপনারদিগকে অনুরোধ করি-তেছি যে, আগামী ১১ মাঘের প্রাতঃকালের উৎসব সমাধা করিবার জন্য অন্য কোন স্থান নির্দ্ধারিত করিতে উদ্যোগী হইবেন। ইতি ২৩ অগ্রহায়ণ ৫৭ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীজানকীনাথ ঘোষাল।

বিজ্ঞাপন।

বহুকাল হইল আদি ব্রাহ্মসমাজের গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। এখন ইহা নিতান্ত জীর্ণ। ১১ মাঘের উৎসব উপলক্ষে বহু লোকের সমাগম হয়। ইহাতে বিলক্ষণ অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। এ জন্য ট্রষ্টীরা এস্থানে ঐ উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। পরে আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষেরা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করাতে তিনি আপনার বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে মাঘোৎসবের স্থান স্থির করিয়া দিয়াছেন। অতএব আগামী ১১ মাঘ রবিবার প্রাতঃকালের ব্রহ্মোপাসনা আদি ব্রাহ্মসমাজের ত্রিতল গৃহে না হইয়া শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে হইবে। ঐ দিন সর্ব্বসাধারণে প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রধান আচার্য্য মহোদয় শ্রীচরণেষু।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিন নিকটস্থ হইয়াছে—এ উপলক্ষে সমাজ বাটীর ত্রিতল গৃহে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। কিন্তু গৃহটি জীর্ণ হইয়াছে দেখিয়া সমাজের অধ্যক্ষ ট্রষ্টী মহাশয়েরা ইহাতে বিপদের আশঙ্কা করিয়া আমাদিগকে সাবধান হইবার জন্য এক পত্র লিখিয়াছেন এবং আগামী ১১ই মাঘের প্রাতঃকালের উৎসব কার্য্য অন্য কোন স্থান নির্দ্ধারিত করিয়া তথায় সমাধা করিতে বলিয়াছেন। অতএব এক্ষণে আপনকার নিকট আমারদের এই প্রার্থনা যে আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের উক্ত কার্য্য সমাধা করিবার জন্য একটী স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া কৃতার্থ করেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় সেবক
২৫ অগ্রহায়ণ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৭ কলিকাতা। সম্পাদক।

স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক
সমীপেষু।

তোমার ২৫ অগ্রহায়ণের পত্র আমি প্রাপ্ত হইলাম। আগামী ১১ মাঘের প্রাতঃকালের ব্রহ্মোপাসনা কার্য্য সমাধা করিবার জন্য একটি স্থান নির্ণয় করিয়া দিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছ। অতএব আমার বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে তদুপযোগী স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া দিলাম। সেই স্থানে পবিত্র ব্রহ্মোপাসনা সুসম্পন্ন হইয়া গেলে আমি আহ্লাদিত হইব। ইতি ২৬ অগ্রহায়ণ ৫৭ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
প্রধান আচার্য্য।

পত্র।

পরম পূজনীয় শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহাশয় শ্রীচরণেষু।

পরম পূজনীয়েষু—

অসংখ্য প্রণাম পুরঃসর নিবেদন মিদং— ঈশ্বরপ্রসাদে ও আপনার শুভ [illegible] বেহালা ব্রাহ্মসমাজের উৎসব যথানিয়মে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। হৃদয় শোকে আবিল, কিন্তু সে দিবসের এমনই মাহাত্ম্য যে শোক তাপের লেশ মাত্র হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সকলেই অত্যন্ত উৎসাহে তেজীয়ান। বেলা ২টা হইতে উপাসক ও দর্শকদিগের সমাগম হইতে আরম্ভ হইল। এবং দেখিতে দেখিতে আনন্দের বাটীর প্রাঙ্গন পূর্ণ হইয়া গেল। পূজ্যপাদ শ্রীরাম বাবু মহাশয় সকলকে যত্ন নিয়মে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। তিনটা বাজিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সকলে ব্রাহ্মসমাজে চলিলেন। প্রথমে সঙ্গীত আরম্ভ হইল। এ বৎসর শ্রীভীমচন্দ্র রায় গানের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেহালা ও তন্নিকটস্থ পল্লীর প্রায় ২০ জন ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্লোক পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন এই জন্য তাঁহাদিগকে একমাস পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইয়াছিল। পবিত্র পারায়ণ শ্রবণে সকলেই বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা অর্থ ও তাৎপর্য্য পাঠের ভার আমার উপর ছিল। বিদেশ হইতে শ্রীশ্রীনাথ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীপ্রসন্নকুমার বিশ্বাস, শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি, শ্রীলালবিহারী বড়াল, শ্রীবেণীমাধব পাল, রসা সিঁথি ও সাহাপুর ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটী ব্রাহ্ম ও গ্রামের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত প্রাচীন লোক উপস্থিত ছিলেন। পারায়ণের সময় উপাসক ও দর্শক সংখ্যা প্রায় ৮০ জন হইবেক। পারায়ণের মুদ্রিত কার্য্য বিবরণ আপনার পবিত্র সন্নিধানে প্রেরিত হইল।

রাত্রিকালে সমাজগৃহ দীপমালায় আলোকিত হইল। উপাসক ও দর্শকসংখ্যা ৪০০ শতের অধিক হইবে। শ্রদ্ধাস্পদ গড়গড়ি মহাশয় ও বসুহাটী ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীসুখদাকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বেদীর আসন গ্রহণ করিলেন। উপাসনার ভার সুখদাবাবুর উপর এবং বক্তৃতা ও উদ্বোধনের ভার গড়গড়ি মহাশয়ের উপর থাকে। গড়গড়ি মহাশয়ের বক্তৃতায় সকলেই যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সকল বিষয়ের আয়োজন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত হইয়াছিল, কোন বিষয়েই ত্রুটি হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে প্রায় ১২৫ জন ব্যক্তি আমাদের বাটীতে আহারাদি করেন। কিন্তু [illegible] সকলেরই স্বর্গীয় পিতৃদেবের [illegible] হইয়াছিল। [illegible] আপনার [illegible] নিবেদন করিলাম।

বেহালা ব্রাহ্মসমাজ। সেবকানুসেবক
১৮০৮ শক, [illegible] শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

বেহালা ত্রয়স্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১৮ কার্ত্তিক সোমবার অপরাহ্ণ।

পারায়ণ।

১। ব্রহ্মসঙ্গীত।
২। অর্চনা। (সকলে দণ্ডায়মান হইয়া)
৩। ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে অষ্টম অধ্যায় পর্য্যন্ত সমস্বরে সংস্কৃত শ্লোক পাঠ।
৪। প্রতি অধ্যায়ের সংস্কৃত শ্লোক পাঠান্তে বাঙ্গালা অর্থ এবং স্থানবিশেষে তাৎপর্য্য পাঠ।
৫। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া স্তোত্র পাঠ।
৬। প্রণাম।
৮। ব্রহ্মসঙ্গীত।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৫ পৌষ রবিবার ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭।

আচার্য্যের উপদেশ।

যিনি আমাদের আত্মার অনন্ত-কালের উপজীবিকা, যিনি দরিদ্রের ধন, ক্ষুধাতুরের অন্ন ও তৃষিতের পানীয় যাঁহাকে পাইলে কাহারো কোন অভাব থাকে না, আত্মার সেই পরম ধনের উদ্দেশে আমরা এই উপাসনা-মন্দিরে সমাগত হইয়াছি। "রসো বৈ সঃ"—তিনি রস-স্বরূপ তৃপ্তি-হেতু; প্রাতঃকালের নবারুণ প্রভা যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-হেতু, নবোদ্বোধিত বিহঙ্গ-কোলাহল যেমন শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-হেতু, সুস্নিগ্ধ প্রাতঃসমীরণ যেমন স্পর্শেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-হেতু, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ ভূমা পরমাত্মা সেইরূপ আত্মার তৃপ্তি-হেতু। তিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—তাঁহার আলোকে আত্মার জ্ঞান-পিপাসা শান্তি-লাভ করে, তিনি আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—তাঁহার অমৃত রসে আত্মার প্রেম-পিপাসা চরিতার্থ হয়, তিনি শান্তং শিবমদ্বৈতং—তাঁহার শান্তি-পীযুষে আত্মার সমস্ত পাপতাপ ও অকল্যাণ দূরীভূত হইয়া যায়। অতএব আইস আমরা তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত হৃদয়ে আহ্বান করি। যখন আমাদের শরীরের কোন একটি অঙ্গ ব্যথিত হয়, তখন সকল অঙ্গই তাহার ব্যথা নিবারণের জন্য সচেষ্ট হয়; যখন মধুমক্ষিকার মধুচক্র অপহৃত হয়, তখন সমস্ত মধুমক্ষিকা একত্র হইয়া প্রাণ-পণ যত্নে চক্র নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়; সেইরূপ আত্মার ব্যথা নিবারণের জন্য—ভগ্ন হৃদয়কে পুনরুত্থাপিত করিবার জন্য—যদি আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণ একযোগে মিলিত হইয়া পরম প্রেমাস্পদ পরমাত্মাকে আহ্বান করে, তবে অবশ্যই ভক্তবৎসল পরমাত্মা আত্মাতে আবির্ভূত হ'ন; তখন আত্মা আশ্চর্য্যে স্তব্ধ-পুলকিত হইয়া দেখিতে পায়—তাহার পরম প্রভু এবং পরম সুহৃৎ তাহার জ্ঞানের জন্য সত্য আনিয়াছেন—হৃদয়ের জন্য প্রেম আনিয়াছেন—জীবনের জন্য মঙ্গল আনিয়াছেন—এবং তাহার নিজের জন্য তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তখন পরমাত্মাকে পাইয়া আত্মা পরম ধন প্রাপ্ত হয়—ও তাহার সকল অভাবেরই পরিসমাপ্তি হয়।

আমাদের সাংসারিক নানা অভাবের নানাদিকে লক্ষ্য; এক অভাব সমুচিত পূরণ করিতে গেলে, আর আর অভাবের প্রতি অযত্ন হইয়া দাঁড়ায়;—যে ব্যক্তি অর্থের অভাব পূরণ করিবার জন্য প্রাণ-পণ যত্ন করে সে ব্যক্তির হয় তো জ্ঞান প্রেমের অ-ভাব পূরণ করিবার অবসর থাকে না; যে ব্যক্তি জ্ঞানের অভাব পূরণের জন্য দিবা-রাত্রি কঠোর বিজ্ঞানের আলোচনায় মস্তক বিভ্রান্ত করে, সে ব্যক্তির হৃদয় হয় তো অতৃপ্তি এবং অশান্তির আলয় হইয়া উঠে; ইহার বিপরীত এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক কেবল আত্মার অভাব পূরণেই আ-মাদের সমস্ত অভাবেরই-পূরণ হয়। সাং-সারিক সমস্ত অভাবই বহির্মুখী; বহির্মুখী অভাব-সকলের প্রকৃতিই এই যে, একটির পূরণে অধিক মাত্রা যত্ন সমর্পিত হইলে অন্যগুলি নিতান্তই উপেক্ষিত হয়। কিন্তু আমরা যদি আমাদের সমস্ত অভাবের মুখ বাহির হইতে অন্তরের দিকে ফিরাইয়া দিই, তাহা হইলে সমস্ত অভাব আত্মাতে সমাহিত হইয়া একটি-মাত্র অভাবে পর্য্য-বসিত হয়;—সে অভাব কি? না পরমাত্মার জন্য আত্মার পিপাসা। এই একটি অভাব আমাদের সমস্ত অভাব-নদীর সাগর-সঙ্গম; এ অভাব-টি চরিতার্থ হইলে আমাদের সমস্ত অভাবই চরিতার্থ হয়। যে ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তির এই প্রধান অভাব-টি পরমাত্মার অপর্য্যাপ্ত প্রেমভাণ্ডার দ্বারা নিরন্তর আপূ-র্য্যমান—তাঁহার সম্বন্ধেই ভগবদ্গীতা বলি-য়াছেন

"আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ। তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমা-প্নোতি ন কামকামী।"

স্থির-প্রতিষ্ঠিত আপূর্য্যমান সমুদ্রে যেমন জলরাশি প্রবেশ করে, তেমনি কাম্য বিষয় সকল যাঁহাতে প্রবেশ করে তিনিই শান্তি লাভ করেন, যিনি কাম্য বিষয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হ'ন—তিনি নহেন।" ইহার অর্থ এই যে, পরমাত্মার জন্য আত্মার যে, কামনা, তাহা সমস্ত কামনার সাগর-সঙ্গম-স্বরূপ। আত্মা যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের—সমস্ত মনোবৃত্তির—সাগর-সঙ্গম; আত্মার পরমার্থ কামনাও সেইরূপ আমাদের সমস্ত কামনারই সাগর-সঙ্গম। যে ভাগ্যবান্ ব্য-ক্তির সেই পরমার্থ কামনাটি—অর্থাৎ ঈশ্বর-স্পৃহা—সুন্দর-রূপে চরিতার্থ হইয়াছে, তাঁ-হাকে আর কোন কামনার জন্য ভাবিতে হয় না; কেন না সমস্ত নদীর জল যেমন সাগর-সঙ্গমের অন্তর্ভূত, সেইরূপ আমাদের সমস্ত কামনা সেই এক মহা-কামনার অন্ত-র্ভূত; এই জন্য আমাদের ঈশ্বর-স্পৃহা চরি-তার্থ হইলে সকল কামনাই আপনা আপনি প্রশান্তি লাভ করে। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কাম্য বস্তুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হ'ন, তাঁহাদের কামনা কোন-ক্রমেই শান্তি-লাভ করিতে পারে না; তাঁহাদের বিক্ষিপ্ত মন এক কামনা হইতে অন্য কামনায়, অন্য কামনা হইতে অন্যতর কামনায়, আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই প্রথম কামনায় ক্রমা-গত চক্রিত হইতে থাকে,—কোন কামনাই প্রকৃত শান্তি-লাভে কৃতকার্য্য হয় না; তাই ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন

"ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।"

কাম্য বস্তু সকলের উপভোগ দ্বারা কাম-নার কখনো নিবৃত্তি হয় না—প্রভূত ঘৃত-প্রাপ্ত বহ্নির ন্যায় আরো বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু পরমাত্মার জন্য আত্মার যে, পিপাসা, এ অভাব-টি আমাদের সকল অ-ভাবেরই মূল অভাব—এজন্য এ অভাবটিকে যেমন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণের [illegible]

ন্টকে চরিতার্থ করিতে পারি এমন আর কোন অভাবকেই নহে ; আর, এ অভাবটির যতই পূরণ হয় ততই আর আর অভাবের বৈধ চরিতার্থতার পথ সহজে উন্মুক্ত হইয়া যায়। কোন বিদেশীয় ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা বলিয়াছেন যে সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরের অমৃত নিকেতন অন্বেষণ কর—আর যাহা কিছু তোমার আবশ্যক সমস্তই যথাকালে তোমাতে আসিয়া বর্ত্তিবে। ইহার অর্থ এ নয় যে, কল্যকার জন্য অদ্য আমাদিগকে ভাবিতে হইবে না—এ নহে যে, আমরা হস্তপদ গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য আপনা-আপনি সুনিষ্পন্ন হইয়া যাইবে—এ নহে যে, সংসার ছাড়িয়া বনে গিয়া ঈশ্বরান্বেষণ করিতে হইবে। আমরা যখন সংসার-যন্ত্রণায় অস্থির হই, তখন মনে হয় বটে যে, অরণ্যের নিভৃত প্রদেশে আমরা শান্তি পাইতে পারি ; কিন্তু আমাদের সংসার-যন্ত্রণার মূল কি—তাহা যদি আমরা একবার ভাবিয়া দেখি, তবে দেখিতে পাই যে, আমরা ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র হইয়া সংসার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হই বলিয়া, আমাদের সহজ কার্য্যও কঠিন হইয়া উঠে, ভাল বস্তুও বিষাক্ত হইয়া উঠে, জীবন যন্ত্রণাময় হইয়া উঠে। যেখানে কোন যন্ত্রণারই সম্ভাবনা ছিল না—বহির্মুখী অশান্ত মন সেখান-হইতেও যন্ত্রণা টানিয়া আনিয়া হৃদয়াভ্যন্তরে হলাহলের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে থাকে। এ অবস্থায় আমরা বনেই যাই, আর, গৃহেই থাকি,—কোথাও আমাদের শান্তি নাই। কিন্তু অগ্রে যদি আমরা ঈশ্বরকে হৃদয়ে আহ্বান করি, তাহা হইলে তাঁহার অমৃত বারিতে আমাদের মন এরূপ প্রশান্ত উজ্জ্বল ও সুস্নিগ্ধ হয় যে, সংসার-যন্ত্রণায় তখন আর বিষ থাকে না ; তখন আমাদের মনের ভাব ফিরিয়া যায় ; কর্ত্তব্যের পথ যাহা পূর্ব্বে আমাদের নিকট অন্ধকারাচ্ছন্ন ও জটিল বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল—তখন তাহা তিমির-মুক্ত, সরল এবং পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায় ; তখন সে পথে চলা যন্ত্রণাদায়ক হওয়া দূরে থাকুক্—তাহা তৃপ্তির আকর হইয়া উঠে। পূর্ব্বে যেরূপ মনের ভাব ছিল তাহা শান্তির মধ্য হইতেও যন্ত্রণা আকর্ষণ করিয়া আনিত, এখন যেরূপ মনের ভাব—তাহা যন্ত্রণার মধ্য হইতেও শান্তি আকর্ষণ করিয়া আনিয়া হৃদয়ে অমৃতের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে থাকে। আমাদের আত্মাতে যদি প্রাণ-স্বরূপ পরমাত্মার বিন্দুমাত্র অমৃতরস নিপতিত হয়, তবে আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয় হইতে তাহার প্রভাব বিনির্গত হইয়া বায়ুর দোষ নষ্ট করে—চক্ষুরিন্দ্রিয় হইতে তাহার প্রভা বিনির্গত হইয়া আলোকের দোষ নষ্ট করে, আমাদের চতুর্দ্দিকে পুণ্যের জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়। সমস্ত প্রকৃতির সার মন্থন করিয়া যে অমৃত পাওয়া যায়—পৃথিবী হইতে সৌরভামৃত, বারি হইতে রসামৃত, অগ্নি হইতে তেজোহমৃত, বায়ু হইতে স্পর্শামৃত, আকাশ হইতে শব্দামৃত, এইরূপ যেখান হইতে যত কিছু অমৃত মন্থন করিয়া পাওয়া যায়, সমস্ত অমৃত যদি একপাত্রে জড়ো করা যায়, তবে তাহা ঈশ্বরের প্রেমামৃতের কণা মাত্র বলিয়াও গণ্য হয় না ; অতএব যাঁহার আত্মা ঈশ্বরের প্রেমামৃতে পরিপূর্ণ হয়, তিনি যে প্রকৃতিতে নূতন প্রকৃতি বিতরণ করিবেন—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বরের প্রেমোন্মত্ত একা এক ব্যক্তি কোথায় কোন্ এক কোণে আবির্ভূত হ'ন—আর, কতিপয় শতাব্দীর মধ্যে সমস্ত পৃথিবীর শ্রী ফিরিয়া যায়। সেই দেব-স্পৃহনীয় অমৃত-রসের জন্য এখানে আমরা সবান্ধবে সমাগত হইয়াছি—তাহার

যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন না করিয়া আমরা যেন এখান হইতে না উঠি। তিনি আমাদের আত্মার অভ্যন্তরেই বর্ত্তমান আছেন—আমাদিগকে দূরে যাইতে হইবে না। প্রাণ আমাদের কত না যত্নের সামগ্রী—তবে, যিনি সাক্ষাৎ প্রাণ-স্বরূপ, তাঁহাকে কেনই বা যত্নপূর্ব্বক হৃদয়াভ্যন্তরে সঞ্চিত না করিব? তাঁহাকে আমরা আত্মার অভ্যন্তরে উপার্জ্জন করিতে পারিলে, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেই অনন্ত জীবন উপার্জ্জন করি—তিনিই অমৃত জীবনের একমাত্র উৎস। অতএব তাঁহাকে আইস আমরা হৃদয়ের সহিত আত্মার অন্তরতম নিকেতনে আহ্বান করি।

হে পরমাত্মন্—আমাদের তৃষিত আত্মার জীবন বারি। তুমি আমাদের সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করিয়া আমাদের আত্মাতে আসীন হও। আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম কামনা তোমারই পদ-তলে বিলীন হইতেছে, তোমার অমৃত বারির জন্য আমাদের প্রাণ হা হা করিয়া ক্রন্দন করিতেছে;—মাতা যেমন শিশুকে অন্ন পান দিয়া শীতল করে, বন্ধু যেমন বন্ধুকে মধুর সান্ত্বনা বাক্যে শীতল করে—সেইরূপ তুমি তোমার অমৃত প্রেমবারি বর্ষণ করিয়া আমাদের তপ্ত হৃদয়কে শীতল কর—তাহা হইলেই আমরা ইহ-কাল পরকাল—অনন্ত জীবনের মত কৃতকৃতার্থ হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ধর্ম্মের নিয়ম।

নানা দেশের নানা প্রকার আচার-ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সহসা মনে হইতে পারে যে, ধর্ম্ম-নিয়মের কিছুই স্থিরতা নাই—ধর্ম্ম কেবল একটা কথার কথা। কিন্তু সেই-সকল বিভিন্ন আচার-ব্যবহারের মধ্যে স্থির-চিত্তে তলাইয়া দেখিলে তাহার অবিকল বিপরীত দেখিতে পাওয়া যাইবে; দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সর্ব্বত্রই মনুষ্যের অন্তঃকরণে ধর্ম্মের নিয়ম ন্যূনাধিক পরিমাণে কার্য্য করিয়া আসিতেছে। আফ্রিকা-দেশের জঙ্গুলিয়ারা (Bushmen) ব্যাধ-বৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই জানে না; যাহা উপস্থিত পায় তাহাই ভক্ষণ করে; কল্য কি খাইবে অদ্য তাহা ভাবে না; খাদ্য সম্মুখে পাইলে থামিতে জানে না; উপবাস করিতেছে তো উপবাসই করিতেছে,—কিন্তু দৈব-যোগে যদি একটা বড়-রকমের শিকার সংগ্রহ করিতে পারিল, তবে তাহার সমস্তটা যতক্ষণ না উদরস্থ করে, ততক্ষণ তাহাকে ছাড়ে না; অদ্যকার পুঁজি অদ্যই পার করিয়া দেয়, কল্যকার জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখে না। ইহাদের মধ্যে যদি কোন অসাধারণ ব্যক্তি একটা শা-মোরোগের বারো আনা অংশ ধ্বংশ করিয়া চারি আনা অংশ কল্যকার জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখে, তবে সে তাহার অসামান্য কার্য্য কত-না ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা ও মনঃসংযমের পরিচয় প্রদান করে। এইরূপ কার্য্যই এখানকার এক মাত্র ধর্ম্ম কার্য্য। এ ধর্ম্ম কার্য্য—আর কিছুই নয়—কল্যকার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অদ্যকার লোভ প্রবৃত্তিকে দমন করা; এরূপ কার্য্যের লক্ষ্য স্বার্থের অধিক আর কিছুই নহে। স্বার্থ-শব্দ এখানে নিতান্ত চলিত অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে—এটি যেন সর্ব্বদা মনে থাকে। [illegible] পনি ভাল খা'ব—ভাল পর'ব, ইহাই যাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য তাহাকেই লোকে স্বার্থপর বলে; [illegible] কেবল আপনার ঐহিক কুশলই প্রধানতঃ স্বার্থ-শব্দের বাচ্য। যেখানে স্বার্থের উপরে আর কোন নিয়ামক নাই, সেখানে শারীরিক কুশল এবং মানসিক কুশল এ-দুয়ের মধ্যে অতি অল্পই

প্রভেদ। স্নেহ-প্রেমাদি বৃত্তির চরিতার্থতার উপরেই মানসিক কুশল নির্ভর করে; কিন্তু স্নেহ-প্রেমাদির লক্ষ্যের ভিতর—শুধু কেবল আপনার হিত নহে—অন্যেরও হিত—অন্তর্ভূত রহিয়াছে,—সুতরাং এ-সকল বৃত্তির পরিচালনা স্বার্থকে ছাড়াইয়া উঠে; প্রত্যুত, যেখানে শুদ্ধ কেবল আপনার শারীরিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা মনুষ্যের একমাত্র কাম্য বস্তু, সেখানে অন্যের হিতের প্রতি লক্ষ্য-সমাধানের পথ এখনো উন্মুক্ত হয় নাই; সুতরাং সেইখানেই স্বার্থের—খাঁটি স্বার্থের—নিজ মূর্ত্তি দর্শক-সন্নিধানে দেখা দেয়। এই স্বার্থোদ্দিষ্ট কায়িক কুশল-টি নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিতে হইলে লোভাদি প্রবৃত্তি-সকলকে কিয়ৎ পরিমাণে দমন করা আবশ্যক,—ইহারই নাম স্বার্থ দ্বারা প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করা; বিষয় তো এই—কিন্তু ইহাই এখানকার পক্ষে এমনি কঠিন কার্য্য যে, অতি অল্প লোকেই তাহা পারে;—যে ব্যক্তি দুই দিনের খাদ্য সম্মুখে পাইলে এক দিনেই তাহা উদরস্থ না করে, সে ব্যক্তি এখানকার অসাধারণ ব্যক্তি।

এই সকল জঙ্গুলিয়াদিগের অনতিদূরে গৃহস্থ কাফ্রীদের বসতি-স্থান। গৃহস্থ কাফ্রীদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত প্রস্ফুটিত হওয়াতে ইহারা স্বার্থের আস্বাদ বিশেষরূপে অবগত হইয়াছে। মৃগয়া-লব্ধ পশুর মাংস তো আছেই—তদ্ভিন্ন গো-দুগ্ধ ও ভুট্টা ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। হস্তীর মাংস—বিশেষতঃ হস্তীর পদ-পল্লব—ইহাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী। ইহাদের এক এক পুরুষের অনেকগুলি স্ত্রী; আর, গৃহপতির নিজের একটি স্বতন্ত্র কুটীর তো আছেই, তদ্ভিন্ন, যাহার যতগুলি স্ত্রী—তাহার আলয় ততগুলি কুটীরের সমষ্টি; আর, এক-একটি কুটীর একএকটি স্ত্রীর বাসস্থান। সেই কুটীরগুলি চক্রাকারে সন্নিবেশিত হইয়া মাঝখানকার উঠানের চারি দিক্ বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করে, ও সেই উঠানে গৃহের গরুরা মুক্ত ভাবে বিচরণ করে। এক কথায় বলিতে হইলে—এক একটি আলয় এক একটি অনাবৃত গোয়াল ঘর, ও তাহার চারিদিকের কুটীর-মণ্ডলী সেই গোয়াল ঘরের বেষ্টন-পরিধি। ইহাদের কৃষি-কার্য্য এরূপ অপকৃষ্ট যে, ইহারা হল-কর্ষণ জানে না। ইহাদের স্ত্রীরা শুদ্ধ কেবল খননাদি করিয়াই পার পায় না; ক্ষেত্রের কার্য্য, কুটীর-নির্ম্মাণ, মোট বহা, প্রভৃতি যত কিছু কষ্টকর ব্যাপার—সমস্তই স্ত্রীর স্কন্ধে চাপাইয়া, স্বামী, বাহিরে পশু-হত্যা ও গৃহে স্ত্রী-হত্যার কাছাকাছি, এই দুয়ের মধ্যে এ-পাশ ও পাশ করিয়া দিনপাত করে। স্ত্রীকে দিয়া মুটে-মজুরের কার্য্য করাইয়া লইবার জন্যই স্বামী তাহাকে ঘরে রাখে ও প্রতিপালন করে—নহিলে তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিবার কোন আপত্তি ছিল না। স্বামী আপনার স্বার্থের উদ্দেশে—যত অল্প ব্যয়ে পারে—স্ত্রীকে প্রাণে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে; ও স্বামীর উচ্ছিষ্টাবশেষ যৎ-সামান্য অন্নের একমাত্র ভরসায় স্ত্রী জীবন এবং মৃত্যুর সন্ধি-স্থলে কায়-ক্লেশে বর্ত্তিয়া থাকে। এক তো আধ-পেটা অন্ন, তাহার উপর কঠোর পরিশ্রম, তাহার উপর সন্তান প্রতিপালন, তাহার উপর সপত্নী-কলহ, তাহার উপর স্বামীর উৎপীড়ন,—স্ত্রীরা যে মধ্য-যৌবন পার হইতে-না-হইতেই বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিয়া মানব-লীলা সম্বরণ করে—ইহাতে তাহাদের কোন অপরাধ নাই; আর, বিবেচনা করিয়া দেখিলে—তাহাই তাহাদের পরম সৌভাগ্য। এই সকল গৃহস্থ কাফ্রীরা জঙ্গুলিয়াদিগের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সভ্য। পূর্ব্ব-কথিত

জঙ্গুলিয়াদের ধর্ম্ম-নিয়ম বড় জোর এই পর্য্যন্ত সম্ভবে যে, প্রবৃত্তি-বিশেষকে স্বার্থ দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে। গৃহস্থ কাফ্রীরা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে স্বার্থের নিয়মটি মানিয়া চলে; তদ্ব্যতীত, এখানকার নূতন আর-একটি ধর্ম্ম-নিয়ম এই হওয়া উচিত যে, স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে,—উচিত কেবল নয়—হইতে-করিতে কালে তাহাই হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু গার্হস্থ্যের এখানে নিতান্তই হীনাবস্থা;—কন্যা-বিক্রয়ই এখানকার কন্যা-সম্প্রদান; স্ত্রী এখানে স্বামীর সহধর্ম্মিণী হওয়া দূরে থাকুক্—দাসী অপেক্ষাও অধম। পুত্র বড় হইলে পাছে সে মাতাকে ঘরের দাসী অপেক্ষা অধিক কিছু মনে করে, এজন্য এখানকার শাস্ত্র এই যে, বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের পক্ষে মাতার বাধ্য হওয়া কা-পুরুষের লক্ষণ; কিন্তু পুত্রের গোঁপ দাড়ি উঠিতে না উঠিতেই সে যদি মাতাকে প্রহার করিতে শেখে, তবে কালে সে যে একজন বীর-পুরুষ হইবে—এ বিষয়ে আর কাহারো অণু-মাত্র সংশয় থাকে না। কোলীন্য বলিয়া একটা যে, সামগ্রী, অর্থাৎ যাহাকে আমরা সৎকুলোচিত ভদ্র ব্যবহার বলি, তাহা এখানকার ত্রিসীমায় স্থান পাইতে পারে না। ইহাদের মধ্যে কেহ যদি সুবুদ্ধি এবং স্নেহ-মমতার বশবর্ত্তী হইয়া গার্হস্থ্যের নিয়ম কিয়ৎ পরিমাণে মানিয়া চলে, স্বার্থকে কিয়ৎ-পরিমাণে গার্হস্থ্য-দ্বারা নিয়মিত করে,—স্ত্রীকে মর্ম্মান্তিক প্রহার না করে ও নিতান্ত গর্দ্দভের মত না খাটায়, তবে তাহাই আহার পক্ষে যথেষ্ঠ ধর্ম্ম-কার্য্য।

অতঃপর আরব দেশের মরুভূমির মধ্যে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক। চারি দিকে বিশাল মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে—তাহার মধ্যে এখানে তিন চারি ঘর গৃহস্থ (গৃহস্থ ঠিক নয়—তাঁবুস্থ) ও আহার বহু দূরে ঐরূপ আর কতক-গুলি ঘর, বাস করিতেছে। খর্জ্জুরের ফল, কূপের জল, উষ্ট্রের দুগ্ধ, মেষ মাংস, কদাচিৎ কখনো বা উষ্ট্রের মাংস ইহাদের জীবনের একমাত্র সম্বল। কাজেই, লোকাচার বলিয়া একটা যে, সামগ্রী, অর্থাৎ সমাজের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংঘর্ষে যেরূপ আচার ব্যবহার প্রসূত হয়—সেরূপ কোন-কিছু, এখানে স্থান পাইতে পারে না; তথাপি কুল-পরম্পরা-ক্রমে যেরূপ আচার-ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, তাহা এখানে সকলেরই সম্ভজনীয়; কুলাচারই এখানে সর্ব্ব-প্রধান নিয়ামক। কৌলীন্যের মর্য্যাদা ইহারা কিয়ৎপরিমাণে অবগত আছে; ইহার সামান্য একটি উদাহরণ এই যে, ইহাদের অনেকের নামের সঙ্গে "অমুকের সন্তান" এই ভাবের একটি উপাধি গ্রথিত থাকে,—যেমন বেন্-জামিন্ অর্থাৎ জামিন বংশের সন্তান। এই সকল অসভ্য আরবেরা যদিচ দস্যুবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই জানে না, তথাপি, শুদ্ধ কেবল কুলাচারের বশবর্ত্তী হইয়া অভ্যাগত অতিথির দেব্যাদি হরণে ক্ষান্ত থাকে;—ইহাই ইহাদের পক্ষে যথেষ্ট ধর্ম্ম-কার্য্য। এরূপ অসভ্য লোকেরা যদি কুলাচারকেই সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম-নিয়ম মনে করে—তবে তাহাদের সে কথা নিতান্ত অবজ্ঞার সামগ্রী নহে; এখানকার পক্ষে তাহা বাস্তবিকই সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম-নিয়ম—তাহা বাস্তবিকই ঈশ্বরের আদেশ; কারণ, এখানে তাহা অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ আর কিছুই হইতে পারে না। ইহাদের স্ত্রী-পুত্রেরা স্নেহ এবং যত্নের সামগ্রী—গৃহপতিরা ভক্তির পাত্র। স্বার্থ, এখানে, গার্হস্থ্যের অধীন;—শারীরিক প্রাণ মানসিক প্রাণের অধীন; মানসিক প্রাণ—অর্থাৎ স্নেহ মমতা ও অভ্যাগত অতিথির রীতিমত সৎকার না করিলে—শুধু কেবল আত্মার নয়—কিন্তু সমস্ত গৃহের অকল্যাণ হইবে, এই অভিপ্রায়

ইহারা সাধ্য-মতে অতিথি-সেবার ত্রুটি করে না। কঠোপনিষদে আছে "বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্" অগ্নির ন্যায় অতিথি গৃহে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ তাঁহাকে যদি না শান্ত করা যায় তবে তাঁহার নিশ্বাসে গৃহ দগ্ধ হইয়া যাইবে। হইলে হয় কি,—আরব দেশীয় অসভ্যদিগের আতিথ্য কিছু অদ্ভুত প্রকার;—অতিথি যতক্ষণ গৃহে থাকে, ততক্ষণ সে মস্তকের মণি; কিন্তু সেই অতিথি যখন গৃহাভিমুখে আসিতেছে—গৃহে প্রবেশ করিতে কেবল বাকি—তখন ঐ আরব তস্করেরা তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হয় না; তবে, অতিথির ভাব-লালন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া তাহার পর—তাহাকে গৃহে আনিয়া তাহার যথোচিত সংকার করে ও তাহাকে গন্তব্য পথে নিরাপদে অগ্রসর করিয়া দেয়; এই যে করে—ইহাই এখানকার পক্ষে যথেষ্ট ধর্ম্ম কার্য্য। পূর্ব্বে যে দুইটি নিয়মের কথা বলা হইয়াছে, কি না—প্রবৃত্তিকে স্বার্থ দ্বারা ও স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে, এ দুইটি নিয়ম এখানে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে প্রচলিত; তদ্ব্যতীত, এখানে নবোন্মেষিত আর-একটি ধর্ম্ম-নিয়ম এই যে, কৌলীন্য দ্বারা (অর্থাৎ কুলোচিত ভদ্রতা-দ্বারা) গার্হস্থ্যকে নিয়মিত করিতে হইবে। গার্হস্থ্য হইতে কৌলীন্য, অথবা যাহা একই কথা—ভদ্রতা, কিরূপে অল্পে অল্পে উন্মেষিত হয়, এই স্থলে তাহার প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা আবশ্যক।

গৃহপতির যখন সন্তান সন্ততি বিস্তৃত হইয়া এক গৃহের অধিবাসীরা নানা গৃহে ছট্‌কিয়া পড়ে, তখন গৃহপতি সেই সকল গৃহের মধ্যস্থলে বাস করিয়া কুলপতি হইয়া দাঁড়ান। তিনি সকলকেই আপনার সন্তান-সন্ততি জানিয়া সকলেরই মঙ্গল কামনা করেন; কাজেই সকলে তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে ও তাঁহার আদেশ পালন করে। তিনি যদি অবিবেচনা-পূর্ব্বক যাহাকে তাহাকে যাহা তাহা আদেশ করেন, তবে তাঁহার শাসন অচিরে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায়; তাহা না করিয়া, যে-সকল মঙ্গল-নিয়ম পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তাহাই তিনি আদর্শ-পদবীতে দাঁড় করাইতে প্রয়াস পা'ন। তিনি উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা এই অভিপ্রায়-টি ব্যক্ত করেন যে, "আমিই এখানে সর্ব্বে সর্ব্বা—আমার উপরে আর কেহই নাই—আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহাই করিতে পারি, তবুও দেখ—পূর্ব্ব-পুরুষদিগের মঙ্গল নিয়মের অধীনে মস্তক অবনত করিয়া আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি; অতএব সেরূপ করা তোমাদের আরো কত না কর্ত্তব্য।" কুলের কোন অবাধ্য সন্তান যদি কোন-প্রকার কুতর্ক উত্থাপন করে, তবে কুলপতি পূর্ব্বপুরুষদিগের নজির দেখাইয়া তাহার মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করেন;—তিনি হয় তো বলেন "পূর্ব্বপুরুষেরা অমুক অমুক নিয়মে চলিতেন বলিয়া তাঁহারা তিন শত বৎসর জীবিত থাকিতেন; তাঁহাদের বাহুবল এরূপ ছিল যে, সমগ্র একটা তাল-গাছ তাঁহারা অবলীলাক্রমে উৎপাটন করিয়া ফেলিতেন; তোমরাও সেইরূপ নিয়মে চলিলে তোমরাও তাঁহাদের মত আয়ুষ্মান্ বলবান্ ও বীর্য্যবান্ হইবে।" এরূপ বলবৎ এবং অকাট্য প্রমাণের উপর কাহারো আর কোন কথা চলিতে পারে না। এই স্থান-টিতেই ইতিহাস-পুরাণাদির বীজ-বপনের প্রথম সূত্রপাত হয়। এইরূপ করিয়া ক্রমে যখন কুলোচিত আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি কুলক্ষেত্রে বদ্ধমূল হয়, তখন সমস্ত গৃহের গার্হস্থ্য সেই সকল রীতি নীতি দ্বারা নিয়মিত হয়। প্রসঙ্গাধীন, এই একটি কথার

উল্লেখ। এখানে আবশ্যক মনে হইতেছে যে, যত কিছু বলা হইল সমস্তই— যুদ্ধ বিগ্রহাদি খুঁটি খোঁচা বাদ দিয়া যত সংক্ষেপে পারা যায়—বলা হইল। সমস্ত বিবরণ যদি আদ্যোপান্ত খুলিয়া বলিতে হয়, তবে তাহার এ স্থানও নহে—এ সময়ও নহে; তাহা করিতে গেলে এক-তো পুঁথি বাড়িয়া যায়, তাহাতে আবার তাহার নানা দিকে নানা ছিদ্র পাইয়া বহুতর অপ্রাসঙ্গিক কথার বন্যা আসিয়া প্রকৃত প্রস্তাবটিকে সাত হাত জলের নীচে নিক্ষেপ করিয়া দেয়। এখানকার বীজ মন্ত্র এই যে, "যৎস্বল্পং তন্মিষ্টং" যাহা অল্প তাহাই মিষ্ট।

এক গৃহ হইতে যেমন নানা গৃহ প্রসূত হইয়া সকলে একই কুল-সূত্রে গ্রথিত হয়, সেইরূপ এক কুল হইতে নানা কুল প্রসূত হইয়া সকলে একই সমাজ-সূত্রে গ্রথিত হয়। এই সময়ে কুলপতির সিংহাসনে লোকপতি আবির্ভূত হ'ন; কুলপতিদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ওজস্বী, তিনি দেশের রাজা হইয়া দাঁড়া'ন। এখন রাজসভাই সমস্ত দেশের মথিত সারাংশ এবং অনুকরণীয় আদর্শ। যে গ্রাম রাজধানীর যত নিকটবর্ত্তী, সে গ্রাম সভ্যতা-সোপানে তত অগ্রবর্ত্তী। ক্রমে রাজ-সভার সভ্যতা সমস্ত দেশময় ন্যূনাধিক পরিব্যাপ্ত হইয়া—তাহাই দেশের সভ্যতা হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু দূর দূর-স্থিত পল্লীগ্রামের প্রজারা সে সভ্যতার বড় একটা ধার ধারে না; তাহারা পূর্ব্বে যেমন স্ব স্ব কুলপতির অধীনে অবস্থিতি করিত, এখনো অনেকটা সেই ভাবেই অবস্থিতি করে। যে প্রদেশ রাজধানীর যত নিকটবর্ত্তী, সেই প্রদেশের কুলাচার ততই লোকাচার দ্বারা নিয়মিত হয়। পূর্ব্বে যে তিনটি ধর্ম্ম নিয়মের কথা বলা হইয়াছে, কি না—প্রবৃত্তিকে স্বার্থ দ্বারা, স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা, গার্হস্থ্যকে কৌলীন্য দ্বারা, নিয়মিত করিতে হইবে, এ তিনটি নিয়ম তো আছেই—তদ্ব্যতীত—এখানে নবোন্মেষিত আর-একটি ধর্ম্ম-নিয়ম এই যে, কৌলীন্যকে সভ্যতা-দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে।

সভ্যতার নূতন উদ্রেকের সময়, রাজধানীর নিকটবর্ত্তী কুলপতিদিগের প্রাধান্য রাজার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপের অভ্যন্তরে কবলিত হইয়া যায়; কিন্তু দূরবর্ত্তী কুলপতিদিগের প্রতাপ ন্যূনাধিক পরিমাণে অব্যাহত থাকে। এই-সকল অপেক্ষাকৃত স্বাধীন কুলপতিরা দলবদ্ধ হইয়া লোকপতির প্রতাপ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করে। এরূপ অবস্থায়—একদিকে লোকপতি রাজা এবং আর-একদিকে কুলপতি-ব্যূহ উভয়েই জনসাধারণকে আপনার আপনার দলে টানিতে সবিশেষ প্রয়াস পা'ন; সুতরাং লোকরঞ্জন দুই দলেরই প্রধানতম কার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফল এই হয় যে, জন-সাধারণের উপর রাজা এবং কুলপতি-ব্যূহ উভয়েরই অত্যাচারের পথ ক্রমশই সংকীর্ণ হইয়া আসিতে থাকে; অবশেষে সে পথ এরূপ অবরুদ্ধ হইয়া যায় যে, রাজা ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া রাজ্য শাসন না করিলে তাঁহার রাজত্ব কিছুতেই রক্ষা পাইতে পারে না। পূর্ব্বতন কালে আমাদের দেশের ক্ষাত্রিয়-প্রতাপ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ দ্বারা সময়ে সময়ে পরিশোধিত হইত; এজন্য এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে যে, অতীব পূর্ব্বকালে লোকপতির দল ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয় জাতিতে ও কুলপতির দল ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। কুলপতিরা যে, লোকপতির সহিত বাহুবলে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন—তাহার অতি অল্পই সম্ভাবনা; কাজেই, গত্যন্তর-বিহীন কুলপতিরা লোকরঞ্জন-কার্য্যে সমধিক মনোযোগিত

হইলেন ও প্রতাপোন্মত্ত রাজা সে দিকে ততটা মনোযোগী হইলেন না। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে, বাক্যই বশিষ্ঠ (অর্থাৎ লোককে বশ করিতে পারে—তাই বশিষ্ঠ); বাক্যকে যিনি বশিষ্ঠ জানেন তিনি জ্ঞাতি-বর্গের মধ্যে বশিষ্ঠ হ'ন (অর্থাৎ তাঁহাদিগকে বশ করেন)। ইহাতে সহজেই প্রতীয়মান হইতে পারে যে, পুরাকালে বশিষ্ঠ নামক বিশেষ একজন মহর্ষি থাকুন বা না থাকুন—কিন্তু এটা স্থির যে, ঐ নামটি প্রধান প্রধান কুলপতিদিগের উপাধি ছিল। এই সময়ে, রাজা বাহুবল দ্বারা লোকের বল-বীর্য্য বশ করিলেন, কুলপতিরা সদ্ভাব দ্বারা লোকের হৃদয় বশ করিলেন। জন-সাধারণের হৃদয় কিছু কম সামগ্রী নহে,—তাহার বলে বলী হইয়া কুলপতির শান্তাস্ত্র যে সময়ে সময়ে লোকপতির শরাস্ত্রের উপরে জয়লাভ করিবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কুলপতি-বশিষ্ঠের সহিত লোকপতি-বিশ্বামিত্রের সংগ্রামের অভ্যন্তরে কত-যে ঐতিহাসিক রহস্য মাটি-চাপা রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? বিশ্বামিত্র নামটিই ইঙ্গিতচ্ছলে ব্যক্ত করিতেছে যে, বিশ্বামিত্র কুলপতিদিগের ন্যায় মৈত্রী-দ্বারা বিশ্বের লোককে অর্থাৎ জনসাধারণকে বশ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন—কুলপতিদিগের নিজের অস্ত্রে কুলপতিদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক গুহা-গহ্বরে আর অধিক প্রবেশ না করিয়া এখানে আমার যাহা প্রকৃত বক্তব্য তাহাই বলি; তাহা এই যে, একদিকে লোকপতির দল, আর একদিকে কুলপতির দল, এই দুই দলের ঘর্ষাঘর্ষি হইতে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম সভ্য-সমাজে প্রসূত হইয়া দীপ্ত হুতাসনের ন্যায় সর্ব্বোপরি মস্তক উত্তোলন করিয়া উঠে। এই শুভ ঘটনাটি যখন উপস্থিত হয়, তখন বিশুদ্ধ ধর্ম্ম রাজারও রাজা হইয়া দাঁড়ায়। পূর্ব্বে রাজ-সভা-হইতে সভ্যতা উৎসারিত হইয়া দেশ-ময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, এখন রাজা-প্রজার মধ্য হইতে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম উদ্ভাসিত হইয়া সভ্যতাকে নিয়মিত করিতে লাগিল। এখন ধর্ম্মই প্রকৃত পক্ষে রাজা; রাজা ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী—এই মাত্র। এখনকার এই ধর্ম্মরাজ্যে রাজা যখন সিংহাসনে উপবিষ্ট হ'ন, তখন ধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়-সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়। পূর্ব্বে রাজা লোকপতি হইয়া লোকাচার ও সভ্যতা দেশ-ময় বিস্তীর্ণ করিয়াছিলেন—এখন তিনি ধর্ম্মা-বতার হইয়া ধর্ম্মের আদেশ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। মনুরাজা এইরূপ একজন রাজা ছিলেন ও মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র মানব-সমাজের একটি অদ্বিতীয় এবং অবিনশ্বর কীর্ত্তি-স্তম্ভ। তিনি কুলপতিদিগের অধিকার স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, লোকপতিরও অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন; কুলপতি-দিগের আর যোটবদ্ধ হইবার আবশ্যকতা রহিল না, সুতরাং তাঁহাদের যোট ভাঙ্গিয়া গেল; সকল শ্রেণীর লোকেরই স্ব স্ব অধি-কার সুনির্দ্দিষ্ট হইল; শান্তি-সূর্য্য অভ্যুদিত হইল, ও ধর্ম্ম-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

এতক্ষণ ধরিয়া আমরা কি ফল লাভ করিলাম তাহা একবার গণনা করিয়া দেখা যাক্। ধর্ম্ম-সোপানের প্রথম পংক্তিতে আমরা দেখিয়াছি যে, লোককে স্বার্থ-দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে, ইহাই সেখানকার একমাত্র ধর্ম্ম-নিয়ম। এক প্রকার অধম কীটাণু আছে যাহার সমস্ত শরীরটাই উদর;—এরূপ জীবের উদরকে তাহার শরীরের অঙ্গ বলিতে পারা যায় না—যেহেতু তাহার উদরই তাহার শরীর, ও তাহার শরীরই তাহার উদর; এখানে সেইরূপ স্বার্থকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিতে পারা যায় না, যেহেতু স্বার্থই এখানকার একমাত্র ধর্ম্ম। দ্বিতীয়

পংক্তিতে ও-নিয়মটি তো আছেই (কিনা স্বার্থ দ্বারা প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিতে হইবে, এই নিয়মটি), তদ্ব্যতীত—এখানে আর একটি ধর্ম্ম-নিয়ম এই যে, গার্হস্থ্য দ্বারা স্বার্থকে নিয়মিত করিতে হইবে। পূর্ব্ব পংক্তিতে ধর্ম্ম স্বার্থ-পাশে জড়িত হইয়াছিল; এখানে সেই স্থূলতম পাশ হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া ধর্ম্ম, অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম-পাশে—গার্হস্থ্য-পাশে—আটক পড়িয়া রহিল। গার্হস্থ্যই এখানে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম—স্বার্থ ধর্ম্মের অঙ্গ মাত্র। তৃতীয় পংক্তিতে ও-দুইটি ধর্ম্মের নিয়ম তো আছেই—কিনা প্রবৃত্তিকে স্বার্থ দ্বারা ও স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে; তদ্ব্যতীত, এখানে আর একটি ধর্ম্ম-নিয়ম এই যে, কৌলীন্য দ্বারা—অর্থাৎ কুলোচিত ভদ্রতা দ্বারা—গার্হস্থ্যকে নিয়মিত করিতে হইবে। এখানে গার্হস্থ্য-পাশ হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া, ধর্ম্ম, তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর পাশে—কৌলীন্য-পাশে—আটক পড়িয়া রহিল; এখানে কৌলীন্য সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-স্থানীয়, ও গার্হস্থ্য এবং স্বার্থ ধর্ম্মের অঙ্গ-স্থানীয়। চতুর্থ পংক্তিতে ও-তিনটি ধর্ম্মের নিয়ম তো আছেই—কি না প্রবৃত্তিকে স্বার্থ-দ্বারা, স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা, গার্হস্থ্যকে কৌলীন্য-দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে; তদ্ব্যতীত, এখানে আর-একটি ধর্ম্ম-নিয়ম এই যে, কৌলীন্যকে সভ্যতা-দ্বারা, অর্থাৎ লোকারাধ্য আচার-ব্যবহার দ্বারা—এক কথায় লৌকিকতা দ্বারা—নিয়মিত করিতে হইবে। এখানে কৌলীন্য-পাশ হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া ধর্ম্ম, তদপেক্ষা আরো সূক্ষ্মতর পাশে—সভ্যতা-পাশে—আটক পড়িয়া রহিল। এখানে সভ্যতাই সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-স্থানীয়, ও কৌলীন্য গার্হস্থ্য এবং স্বার্থ ধর্ম্মের অঙ্গ-স্থানীয়। যেখানে সভ্যতার উপরে—বা লোকাচারের উপরে—আর কোন নিয়ামক নাই, সেখানে লোকাচার যে, সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ হইবে তাহা হইতেই পারে না; এরূপ নির্ম্মস্তক লোকাচারের সভ্য রীতি নীতির সঙ্গে অনেক এমন কুরীতি জড়িত থাকে, যাহা বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাওয়া প্রার্থনীয়। এ পর্য্যন্ত যে-সকল ধর্ম্ম-নিয়মের কথা বলা হইল, তাহাদের কাহারো এত দূর চক্ষু ফুটে নাই যে, ভাল বস্তুকে মন্দ বস্তু হইতে বাছিয়া লইতে পারে; কিন্তু ধর্ম্ম যখন সভ্যতা-হইতেও উপরে উঠিয়া নিজের বিশুদ্ধ স্বরূপে দণ্ডায়মান হয়—আত্ম-বিস্মৃত অজ্ঞাত-বাসের বেশ ভূষা পরিত্যাগ করিয়া যখন সে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন কি ভাল ও কি মন্দ তাহা সে স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পায়। প্রথম পংক্তির স্বার্থ-ধর্ম্ম আপনার শারীরিক কুশলকে (সংক্ষেপে শরীরকে) অবলম্বন করিয়া বর্ত্তিয়া থাকে; দ্বিতীয় পংক্তির গার্হস্থ্য ধর্ম্ম স্ত্রী-পুত্রাদিকে এবং প্রধানতঃ গৃহপতিকে; তৃতীয় পংক্তির কৌলীন্য-ধর্ম্ম জ্ঞাতি বন্ধুকে এবং প্রধানতঃ কুলপতিকে; চতুর্থ পংক্তির লৌকিক ধর্ম্ম দেশকে এবং প্রধানতঃ দেশের রাজাকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তিয়া থাকে; কিন্তু পঞ্চম পংক্তির বিশুদ্ধ ধর্ম্ম দেশেরও উপরের বস্তু—তাহার অবলম্বন কে? যখন সমস্ত দেশ একদিকে ও গালিলিও একদিকে—গালিলিওর সেই অবস্থাটি এক বার মনে ভাবিয়া দেখ। সে অবস্থায় কয়-জন লোকের প্রকম্পিত আড়ষ্ট কণ্ঠ-নলী হইতে সত্য মস্তক উত্তোলন করিয়া বাহির হইতে পারে? গালিলিও যখন ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন যে, "সূর্য্য স্থির রহিয়াছে—পৃথিবী তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে" তখন তাঁহার অবলম্বন জগতের কেহই নহে—তখন অন্তরতম বিশুদ্ধ সত্যই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। এই-রূপ দেশকাল নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আর

এক মাত্র পরমার্থ। বিশুদ্ধ ধর্ম্মের নিয়ম দেশ-বিশেষে বা কাল-বিশেষে বা জাতি-বিশেষে বদ্ধ থাকিবার নহে। এইরূপ বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-নিয়ম যোগ-শাস্ত্রে "সার্ব্বভৌম মহাব্রত" বলিয়া উক্ত হইয়াছে; যথা,

"এতে তু জাতি-দেশ-কাল-সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতং"।

পঞ্চম পংক্তিতে পূর্ব্বেকার চারিটি নিয়ম তো আছেই,—কি না প্রবৃত্তিকে স্বার্থ দ্বারা, স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা, গার্হস্থ্যকে কৌলীন্য দ্বারা, কৌলীন্যকে সভ্যতা দ্বারা, নিয়মিত করিতে হইবে; তদ্ব্যতীত এখানকার আর একটি ধর্ম্ম নিয়ম এই যে, সভ্যতাকে পরমার্থ দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে; অথবা যাহা একই কথা,—লোকাচারকে সার্ব্বভৌমিক বিশুদ্ধ ধর্ম্ম দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে। পঞ্চম পংক্তিতে পরমার্থই ধর্ম্ম-স্থানীয়, ও সভ্যতা কৌলীন্য গার্হস্থ্য এবং স্বার্থ এ সমস্তই ধর্ম্মের অঙ্গ-স্থানীয়। পরমার্থ আবির্ভূত হইলে নিম্ন-নিম্ন সমস্ত পংক্তিরই শ্রী ফিরিয়া যায়; তাহার নির্নিমেষ চক্ষে পড়িয়া, সভ্যতা হইতে কুরীতির সমস্ত দলবল ঘর-দ্বার উঠাইয়া লইয়া একে একে প্রস্থান করিতে থাকে; এখন সভ্যতা শুদ্ধ কেবল সভ্যতা-মাত্রেই ক্ষান্ত থাকে না, সভ্যতা এখন সুসভ্যতা হইয়া দাঁড়ায়; সুসভ্যতার প্রভাবে কৌলীন্য সুশোভন ভদ্রতা হইয়া দাঁড়ায়; সুশোভন ভদ্রতার প্রভাবে গার্হস্থ্য এবং স্বার্থ উভয়েই নর-তর কল্যাণ-তর মূর্ত্তি ধারণ করে।

এই স্থলটিতে বিষম এক কুতর্ক উপস্থিত হইতে পারে—সে-টি এই যে, ধর্ম্ম-শব্দের অর্থ নিরাশ্রয়ই চলতি মুখে পড়িয়া আছে—তাহার অর্থের কোন ঠিকানা নাই; এক দেশে (যেমন জঙ্গুলিয়া দেশে) স্বার্থই পরাকাষ্ঠা ধর্ম্ম, আর এক দেশে স্বার্থকে দমন করাই পরাকাষ্ঠা ধর্ম্ম; তবে আর ধর্ম্মের স্থিরত্ব কোথায়? স্থিরত্ব যে কোথায়, তাহা উপরি-উক্ত ধর্ম্ম-সোপানের প্রতি একটু প্রণিধান করিলেই দেদীপ্যমান হইয়া উঠিবে। ধর্ম্ম-সোপানের পাঁচটি পংক্তির পাঁচটি ধর্ম্ম-নিয়ম পাঁচ প্রকার নহে কিন্তু একই প্রকার। মূল নিয়ম একটি মাত্র; সেটি এই যে, অন্তঃকরণের বিশেষ বৃত্তিকে সাধারণ বৃত্তি দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে। ইহা অপেক্ষা সুস্পষ্ট আর কি হইতে পারে যে, লোভাদি প্রবৃত্তি অপেক্ষা আপনার শারীরিক মঙ্গল-ইচ্ছা সাধারণ বৃত্তি; আপনার শারীরিক মঙ্গল-ইচ্ছা অপেক্ষা গৃহের মঙ্গল ইচ্ছা সাধারণ বৃত্তি; গৃহের মঙ্গল ইচ্ছা অপেক্ষা কুলের মঙ্গল-ইচ্ছা সাধারণ বৃত্তি; কুলের মঙ্গল-ইচ্ছা অপেক্ষা দেশের মঙ্গল ইচ্ছা সাধারণ বৃত্তি; দেশের মঙ্গল ইচ্ছা অপেক্ষা সার্ব্বভৌমিক বিশুদ্ধ মঙ্গল ইচ্ছা সাধারণ বৃত্তি; সুতরাং সকল পংক্তিরই ধর্ম্ম নিয়ম এই যে, বিশেষ বৃত্তিকে সাধারণ-বৃত্তি দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে। শাস্ত্রোক্ত অন্তঃকরণের বৃত্তি বিভাগের সহিত এখানকার এই ধর্ম্ম-সোপানের পংক্তি বিভাগের চমৎকার মিল রহিয়াছে। আমাদের দেশের প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে,—প্রথমে প্রাণ, তাহার পর মন, তাহার পর অহঙ্কার, তাহার পর বুদ্ধি, তাহার পর আত্মা, উত্তরোত্তর প্রধান-পদবীতে আরূঢ়। প্রথম, প্রাণ;—শরীর-রক্ষাই প্রাণের ধর্ম্ম; স্বার্থের পংক্তিতে আমরা দেখিয়াছি যে, পশুবৎ জঙ্গুলিয়াদিগের প্রাণে বাঁচিয়া থাকাই জীবনের প্রধানতম কার্য্য। দ্বিতীয়, মন;—প্রাণে বাঁচিয়া থাকা তো আছেই—তাহার উপর স্ত্রী পুত্রের মুখ-দর্শন করিয়া মনকে সুখে রাখা গার্হস্থ্যের উদ্দেশ্য। তৃতীয়, অহঙ্কার;—বাহিরের বিষয় মায়া উপরঞ্জিত হওয়া (স্ত্রীপুত্রের মুখ-

দর্শনে সুখী হওয়া) যেমন মনের ধর্ম্ম, তেমনি আপনার পৌরুষ-কার্য্যে আপনাকে প্রতিবিম্বিত দেখা অহঙ্কারের ধর্ম্ম। মনের দৃষ্টি সম্মুখ পানে—সম্মুখস্থিত বিষয়-সমূহে; অহঙ্কারের দৃষ্টি পশ্চাৎপানে,—পৌরুষ কার্য্য করিয়া অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব করিয়া—"আমি এই কার্য্য করিলাম" এই বলিয়া আপনার প্রতি ফিরিয়া দেখা, অহঙ্কারের লক্ষণ। পূর্ব্ব পুরুষদিগের কীর্ত্তির প্রতি ফিরিয়া দেখাও আপনার পৌরুষ দ্বারা সেই কীর্ত্তিতে নূতন জীবন সঞ্চার করা, আর পুত্র-পৌত্রাদিকে তাহার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা, কৌলীন্যের প্রধান উদ্দেশ্য; কৌলীন্য এইরূপ অহঙ্কার-প্রধান। এখানে এইটি দেখা কর্ত্তব্য যে, যেখানে পারমার্থিক ধর্ম্ম পরিস্ফুট হয় নাই, সেখানে কম্‌টের শাস্ত্রানুযায়ী লৌকিক ধর্ম্মই সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম ও সেখানকার পক্ষে তাহা ভাল বই মন্দ নহে; তেমনি আবার যেখানে লৌকিক ধর্ম্ম পরিস্ফুট হয় নাই, সেখানে ইউরোপের মধ্যযুগীয় অহঙ্কার-প্রধান কৌলিক ধর্ম্ম, যাহা Chivalry নামে প্রসিদ্ধ, তাহাই সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম; সুতরাং সেখানে তাহাই শ্রেয়স্কর। দেশকাল-পাত্রোচিত শোভন অহঙ্কার মনের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া নীচ প্রবৃত্তির পথ-রোধ করে—সুতরাং তাহা ভাল বই মন্দ নহে; কিন্তু যদি অহঙ্কার মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়া অযোগ্য উগ্র ভাব ধারন করে, তাহা হইলে তাহা অবশ্যই নিন্দনীয়। এমন কি, অহঙ্কারে অতি মাত্র স্ফীত হইলে, মনুষ্য উন্মাদ হইয়া উঠিতে পারে; Don Quixot-এর উপন্যাস ইহার একটি পরিপাটী উদাহরণ। অহঙ্কারের উত্তেজনায় মনুষ্যের স্পর্দ্ধা কখনো কখনো আকাশ ছাড়াইয়া উঠে,—ক্ষুদ্র মনুষ্য পরাৎপর পরমেশ্বরের স্থলাভিষিক্ত হইতে লজ্জিত হয় না,—ভেক ফুলিয়া হস্তী হওয়া ইহার কাছে কোথায় লাগে। কিন্তু "আমি ভদ্র-সন্তান" বলিয়া মনুষ্যের যে-একটা দেশ কাল পাত্রোচিত কৌলীন্য অহংকার, তাহা নিন্দনীয় হওয়া দূরে থাকুক, তাহাই ধর্ম্ম-সোপানের মধ্যম পংক্তি। চতুর্থ, বুদ্ধি;—কৌশল দ্বারা কার্য্য সমাধা করাই বুদ্ধির ধর্ম্ম; বুদ্ধির প্রধান লক্ষ্য আপনার পৌরুষের প্রতি নহে, কিন্তু কার্য্যোদ্ধারের প্রতি। একাকী সকল-কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব করিলে আপনার পৌরুষেরই পরিচয় দেওয়া হয়—কিন্তু তাহাতে কার্য্য ভাল হয় না; সকলে মিলিয়া সকলের জন্য কার্য্য করিলে আপনার আপনার পৌরুষ অনেকটা চাপা পড়িয়া যায় বটে কিন্তু তাহাতে কার্য্য যেমন ভাল হয়—তেমন আর কিছুতেই নহে; এইরূপ সুকৌশলে কার্য্য সুনির্ব্বাহ করা সভ্যতার একটি প্রধান লক্ষণ। কৌলীন্য যেমন অহঙ্কার-প্রধান, সভ্যতা সেইরূপ বুদ্ধি-প্রধান। পঞ্চম, আত্মা;—সার্ব্বভৌমিক মঙ্গল, বিশুদ্ধ মঙ্গল, পরিপূর্ণ মঙ্গল, এক কথায় পরমার্থ, বহির্জ্জগতের কুত্রাপি দৃষ্ট হইতে পারে না—আত্মাই তাহার একমাত্র বসতিস্থান। স্বার্থ যেমন শরীরের মঙ্গল, গার্হস্থ্য যেমন মনের মঙ্গল, কৌলীন্য যেমন অহঙ্কারের মঙ্গল, সভ্যতা যেমন বুদ্ধির মঙ্গল, পরমার্থ সেইরূপ আত্মার মঙ্গল। মনুষ্য-জাতির আত্মার মঙ্গল সাধিত হইলে—মনুষ্য-জাতির আত্মা সার্ব্ব-ভৌমিক বিশুদ্ধ মঙ্গল-ইচ্ছায় পরিপূর্ণ হইলে—দেশের—কুলের গৃহের—শরীরের—সমস্তেরই মঙ্গল সেই-এক মহা-মঙ্গলের অনুগামী হয়। আর একটি কথা এখানে বক্তব্য এই যে, অহংকার যেমন মনের উপর কর্ত্তৃত্ব করে—আত্মা (স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের আকর আত্মা) সেইরূপ বুদ্ধির উপর কর্ত্তৃত্ব করে; বুদ্ধি যেমন উচ্চতর মন—আত্মা সেইরূপ উচ্চতর অহং। অহঙ্কার মনের কেন্দ্রস্থানে,—আত্মা বুদ্ধির কেন্দ্রস্থানে—

অধিরূঢ়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, শাস্ত্রোক্ত অন্তঃকরণের বৃত্তিবিভাগের সহিত ধর্ম্ম-সোপানের পংক্তি-বিভাগের আগা-গোড়া মিল রহিয়াছে। এখন বক্তব্য এই যে, বিশেষ বৃত্তিকে সাধারণ বৃত্তি দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে—এ নিয়মটি এমনি স্থির যে, কোথাও ইহার বিন্দু-বিসর্গেরও অন্যথা হইতে পারে না; ইহাকে ধর্ম্ম-সোপানের যে পংক্তিতে খাটাও, সেই পংক্তিতে খাটিবে। জ্যোতিষের একটি মূল নিয়ম এই যে, গুরুমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে লঘু মণ্ডল ঘুরিবে; এই নিয়মটিকে যখন সূর্য্য-মণ্ডলে প্রয়োগ করি, তখন পাই যে, সূর্য্য বৃহত্তর আর-একটা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে; উহাকে যখন ভূমণ্ডলে প্রয়োগ করি তখন পাই যে, সূর্য্য অপেক্ষাকৃত স্থির ও পৃথিবী তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে; উহাকে যখন চন্দ্র-মণ্ডলে প্রয়োগ করি, তখন পাই যে, পৃথিবী অপেক্ষাকৃত স্থির ও চন্দ্র তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে; কিন্তু তাহা বলিয়া উপরি-উক্ত ভারাকর্ষণের নিয়ম তিন নিয়ম নহে—উহা একই নিয়ম। ইহারই অন্যায়, এ নিয়মটি একই নিয়ম যে অন্তঃকরণের বিশেষ বৃত্তিকে সাধারণ বৃত্তি দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে;—এ নিয়মটিকে প্রথম পংক্তিতে প্রয়োগ করিয়া পাইতেছি যে, প্রবৃত্তিকে আপনার শারীরিক মঙ্গল-ইচ্ছা দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে; দ্বিতীয় পংক্তিতে প্রয়োগ করিয়া পাইতেছি যে, গৃহের মঙ্গল-ইচ্ছা দ্বারা আপনার স্বার্থকে নিয়মিত করিতে হইবে; তৃতীয় পংক্তিতে প্রয়োগ করিয়া পাইতেছি যে, কুলের মঙ্গল-ইচ্ছা দ্বারা গৃহের মঙ্গল-ইচ্ছাকে নিয়মিত করিতে হইবে; চতুর্থ পংক্তিতে প্রয়োগ করিয়া পাইতেছি যে, লোকের বা দেশের মঙ্গল-ইচ্ছা দ্বারা কুলের মঙ্গল-ইচ্ছাকে নিয়মিত করিতে হইবে; পঞ্চম পংক্তিতে প্রয়োগ করিয়া পাইতেছি যে, সমস্ত মঙ্গল-ইচ্ছাকে নিরপেক্ষ সার্ব্বভৌমিক মঙ্গল ইচ্ছা দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে, ইহাই পারমার্থিক ধর্ম্ম-নিয়ম। ধর্ম্মের মূল নিয়মটি (অর্থাৎ সাধারণ বৃত্তি দ্বারা বিশেষ বৃত্তিকে নিয়মিত করিতে হইবে এই নিয়মটি) যদি ঐ পাঁচ পংক্তির একটি কোন স্থানে না খাটিত, তবেই বলিতে পারিতাম যে, ধর্ম্ম-নিয়মের কোন স্থিরত্ব নাই; কিন্তু যখন দেখিতেছি যে, ও নিয়ম-টি এমনি অটল ও অপরিবর্ত্তনীয় যে, কোথাও উহার বিন্দু-বিসর্গেরও অন্যথা হইতে পারে না, তখন কোন্ লজ্জায় এরূপ কথা মুখে আনিব যে, ধর্ম্ম নিয়মের কিছুই স্থিরতা নাই। কেহ বলিতে পারেন যে, গার্হস্থ্যও তো এক প্রকার স্বার্থ: স্ত্রী-পুত্র তো আমারই স্ত্রীপুত্র; স্ত্রীপুত্রের মঙ্গল তো আমার আপনারই মঙ্গল; ইহার উত্তর এই যে তোমার নিজের স্বার্থ (অর্থাৎ আপনি খাওয়া আপনি পরা) স্ত্রী-পুত্রের মঙ্গল-ইচ্ছা দ্বারা এরূপ ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে যে, এখন তাহাকে চেনা ভার; তোমার স্বার্থ গৃহের মঙ্গলের মধ্যে এরূপ কবলিত হইয়া রহিয়াছে যে, স্বার্থ বলিবামাত্রই গৃহের মঙ্গল তোমার মনোমধ্যে উদিত হয়; ইহাতে কেবল ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে, তোমার স্বার্থ অনেক কাল-যাবৎ গার্হস্থ্য দ্বারা নিয়মিত হইয়া চুকিয়াছে; সুতরাং তোমাকে এরূপ উপদেশ দেওয়া বাহুল্য যে, স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে; কিন্তু একজন অঙ্গুলিয়া—যে প্রথম পংক্তির ঊর্দ্ধে উঠে নাই—তাহার পক্ষে ঐ নিয়মটিই সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম-নিয়ম। কোন পংক্তির নিয়ম কাহারো পক্ষে সহজ, কাহারো পক্ষে কঠিন—কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার নিয়মত্বের এক-চুলও ব্যতিক্রম হইতে পারে না। ধর্ম্ম-নিয়মের স্থিরত্ব সংস্থাপিত হইল, এখন, আর-

একটি বিষয়ের মীমাংসা কেবল অবশিষ্ট—সেইটি হইয়া গেলেই আজিকের মত আমার বক্তব্যের পরিসমাপ্তি হয়।

স্বার্থ ধর্ম্ম-সোপানের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন পংক্তি, এবং পরমার্থ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পংক্তি। স্বার্থ সহজত্বের আদর্শ এবং পরমার্থ উৎকর্ষের আদর্শ। গার্হস্থ্য যখন স্বার্থের ন্যায় সহজ হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহাই গার্হস্থ্যের সিদ্ধাবস্থা; কৌলীন্য এবং সভ্যতা যখন স্বার্থের ন্যায় সহজ হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহাই কৌলীন্য ও সভ্যতার সিদ্ধাবস্থা; পরমার্থ যখন স্বার্থের ন্যায় সহজ হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহাই মনুষ্যের চরম সিদ্ধাবস্থা ও পরম পুরুষার্থ; আর, তাহার সাধন মনুষ্যের অনন্ত কালের উপজীবিকা। স্বার্থ যে কি—তাহা কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না; কিন্তু পরমার্থ যে কি, তাহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া না বলিলে—নানা লোকে তাহার নানা প্রকার বিপরীত অর্থ বুঝিতে পারেন। পরমার্থ কি—ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, প্রথমে পরমার্থের দিক্ নিরূপণ করা আবশ্যক। পূর্ব্ব-কথিত পংক্তি-গুলির মধ্যে যেখানে পরমার্থ প্রকাশ্য ভাবে নাই, সেখানেও পরমার্থের দিক্ আছে; অর্থাৎ সেখানে পরমার্থের ভাব পরিস্ফুট হয় নাই, সেখানেও পরমার্থের দিকে গতি চলিতেছে। স্বার্থ যদিচ পরমার্থ নহে, কিন্তু প্রকৃতি হইতে স্বার্থের দিক্ পরমার্থের দিক্; স্বার্থ হইতে গার্হস্থ্যের দিক্ পরমার্থের দিক্; গার্হস্থ্য হইতে কৌলীন্যের দিক্ পরমার্থের দিক্; কৌলীন্য হইতে সভ্যতার দিক্ পরমার্থের দিক্; সভ্যতা হইতে সার্ব্বভৌমিক মঙ্গলের দিক্ পরমার্থের দিক্। জনসাধারণের শুধু নয়—কিন্তু প্রতি জনেরই—শৈশব কাল হইতে পরমার্থের দিকে গতি চলিতে থাকে। নিতান্ত শিশুর, প্রথমে, কেবল স্তন পানের দিকেই ঝোঁক। তাহার পর সে মাতাকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করে; মাতাকে লইয়াই শিশুর গার্হস্থ্য—কেননা শিশুর নিকটে মাতাই গৃহের সর্ব্বস্ব ধন। তাহার পর শিশু পিতাকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করে। শিশুর নিকটে পিতা অপেক্ষা ক্ষমতাশীল ব্যক্তি জগতে আর কেহই নাই; কাজেই "সেই অদ্বিতীয় ক্ষমতাশীল ব্যক্তি আমার স্নেহের বশ" এই বলিয়া তাহার মনোমধ্যে অহঙ্কারের মতো একটা সামগ্রী দেখা দেয়; এ অহঙ্কার নিতান্ত শিশু-অহঙ্কার, উহার এখনো বিষ দাঁত বাহির হয় নাই—এটি যেন মনে থাকে। মাতাকে লইয়াই যেমন শিশুর গার্হস্থ্য, সেইরূপ পিতাকে লইয়াই শিশুর কৌলীন্য। দাম্ভিক কুলীন যেমন সমাজকে জ্বালাইয়া তোলে, আদুরে ছেলে সেইরূপ বাড়ি মাথায় করিয়া তোলে; প্রভেদ কেবল এই যে, শিশুর অহঙ্কার নির্ব্বিষ, সুতরাং একটুতেই শান্ত হয়,—দাম্ভিক কুলীনের অহঙ্কার বিষাক্ত সুতরাং কিছুতেই শান্তি মানে না। আমরা দেখাইলাম যে, নিতান্ত শিশুর কেবল স্তনপানের দিকেই একমাত্র ঝোঁক,—ইহাই শিশু স্বার্থ; তাহার পর সে মাতাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করে,—ইহাই শিশু গার্হস্থ্য; তাহার পর পিতাকে ভালবাসিতে শেখে, ও "পিতা, যাঁহা অপেক্ষা উচ্চ আর কেহই নাই, তাঁহার আমি স্নেহের পাত্র" এই বলিয়া অহঙ্কৃত হয়, ইহাই শিশু কৌলীন্য;—গৃহের বালকেরা এখানে কুল, ও পিতা এখানে কুলপতি। অতঃপর বক্তব্য এই যে, শিশুর কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধি হইলে সে যখন পর-গৃহের সমবয়স্কদিগের সহিত ক্রীড়া কলহ ও পাঠাভ্যাসে রত হয়, তখন অনেকের টকরাটক্করিতে তাহার অহঙ্কারের উপশম হইয়া বুদ্ধির উদ্রেক হয়, সমবয়স্কদিগের স-

হিত সদ্ভাবে মিলিত হওয়াই শিশু সভ্যতা বা শিশু লৌকিকতা। তাহার পর এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মিথ্যা কহিতে কোন কোন বালকের রসনায় বাধে; কোন কোন বালক অনর্গল মিথ্যা বকে; এইরূপ বালকগণের মধ্যেও পারমার্থিক ধর্ম্ম-ভাবের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। যে বালক মিথ্যা কহে না—পিতামাতার বাধ্য—দুর্ব্বলতর বালকের সহায়, তাহার মনোমধ্যে পরমার্থের ভাব নবোন্মেষিত হইয়াছে—এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই তো গেল বালকের,—এখন যুবার কিরূপ ধর্ম্ম-সোপান—দেখা যা'ক। শিশুর যেমন স্তনপান—যুবার সেইরূপ অর্থোপার্জ্জন—উভয়ই জীবন ধারণের জন্য, এইটি স্বার্থের পংক্তি। দেহকে কুশলে রাখিবার জন্য যেমন অন্নোপার্জ্জন, তেমনি মনকে ভাল রাখিবার জন্য বিবাহ; শিশুর যেমন মাতা—যুবার সেইরূপ স্ত্রী—মনের শূন্য যত-কিছু সমস্তই পূর্ণ করে;—এইটি গার্হস্থ্যের পংক্তি। তাহার পর বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা, আপনার প্রভুত্ব এবং কর্ত্তৃত্ব সমর্থন, ও দৃষ্টান্ত এবং উপদেশ-দ্বারা পুত্র কন্যাগণকে কুলোচিত রীতি নীতি ও বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া, জ্ঞাতি বন্ধুকে সদ্ভাব-দ্বারা বশীভূত করা, ইহাই কৌলীন্যের পংক্তি; তাহার পর দেশহিতৈষী বিজ্ঞ-মণ্ডলীর সহিত মিলিয়া-মিশিয়া দেশের হিতানুষ্ঠানে লিপ্ত হওয়া,—এইটি সভ্যতার পংক্তি; তাহার পর, আত্মার নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হওয়া, এইটি পরমার্থের পংক্তি। এখানে এইটি দেখা আবশ্যক যে, যে যে ভাব যে যে পংক্তির অধিকারস্থিত—সেই সেই ভাব যে, সেই সেই পংক্তিতে সহসা আসিয়া আবির্ভূত হয়, তাহা নহে; তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পংক্তিতে অপেক্ষাকৃত অপরিস্ফুট ভাবে বিদ্যমান থাকে—স্বপংক্তিতে আসিয়া পরিস্ফুট ভাব ধারণ করে, এই মাত্র। আর একটি কথা এখানে বিবেচ্য; সে-টি এই যে, যে পংক্তির যে-টি—সে পংক্তির সে-টি নহিলে আর কিছুতেই আশ মিটিতে পারে না। গার্হস্থ্য-ভিন্ন আর কিছুতেই—মনের—আশ মিটিতে পারে না; কিন্তু অহংকারের আশ মিটাইতে হইলে গৃহ তাহার স্থান নহে,—স্ত্রীপুত্রের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া অহঙ্কারের পেট ভরিতে পারে না—জ্ঞাতি বন্ধুকে সদ্‌গুণ-পাশে বদ্ধ করিতে পারিলেই অহঙ্কার রীতিমত পরিতৃপ্ত হয়। তেমনি আবার, পল্লীগ্রাম স্থলভ দলাদলি-ব্যাপারে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সমস্ত ঝোঁক সমর্পণ করিলে, বুদ্ধির নিতান্ত অপব্যয় করা হয়,—অথচ তাহাতে বুদ্ধির পেট ভরে না; দেশের হিতসাধন কার্য্যে বুদ্ধির যেমন উদর-পূর্ত্তি হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। এখানে আরও-একটি কথা বিবেচ্য; সেটি এই যে, উচ্চ পংক্তির অধিকার নিম্ন পংক্তিতেও বলবৎ;—লোকার্থ (অর্থাৎ দেশের মঙ্গল) বুদ্ধির স্বপংক্তি-সুলভ লক্ষ্য, কিন্তু বুদ্ধির অধিকার শুদ্ধ কেবল তাহার স্বপংক্তিতে বদ্ধ নহে—কৌলীন্য এবং গার্হস্থ্য পংক্তি ভেদ করিয়া তাহা স্বার্থ-পর্য্যন্ত প্রসারিত। ইহার ঠিক্ বিপরীত এই দেখা যায় যে, উচ্চ পংক্তিতে নিম্ন পংক্তির জোর খাটে না; বুদ্ধির পংক্তিতে অহঙ্কারের তেজ নরম পড়িয়া যায়; অহঙ্কারের পংক্তিতে স্নেহ-মমতার কোমল কলিকা মুসড়িয়া যায়; গার্হস্থ্য-পংক্তিতে স্বার্থের আড়ম্বর চাপা পড়িয়া যায়। এখানে, আর একটি দ্রষ্টব্য এই যে, সাধারণ বৃত্তি-দ্বারা বিশেষ বৃত্তির নিয়মিত হওয়া উচিত, এ কথার অর্থ কেহ যেন এরূপ না বোঝেন যে, বিশেষ বৃত্তিকে উচ্ছেদ করিয়া সাধারণ বৃত্তিকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করা উচিত;—

এমন অনেক ব্যক্তি আছেন—যাঁহারা আপনি না খাইয়া না পরিয়া—শরীরের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া—পুত্র পৌত্রাদির জন্য ক্রমাগতই অর্থ সঞ্চয় করিতে থাকেন,—এরূপ ব্যক্তি গার্হস্থ্যের অনুরোধে স্বার্থে একেবারেই জলাঞ্জলি দে'ন,—ইহা কর্ত্তব্য নহে; তাই শাস্ত্রে আছে

"প্রাপ্য চাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধ্বা চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবং।
ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু স ভবেদাত্মঘাতকঃ॥"

যিনি উত্তম মনুষ্য জন্ম এবং ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব লাভ করিয়া আপনার হিত জানেন না তিনি আত্ম-ঘাতী।

আবার, এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহাদের স্ত্রীপুত্র পরিবার কষ্টে দিনপাত করিতেছে—তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না—অথচ কৌলীন্য-অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া প্রভূত দান-কার্য্যে রত;—এরূপ কৌলীন্য গার্হস্থ্যের শোণিত শোষণ করে, তাই শাস্ত্রে আছে—

"শক্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখজীবিনি।
মধ্বাপাতো বিষাস্বাদঃ স ধর্ম্ম-প্রতিরূপকঃ॥"

যে ব্যক্তি ক্ষমতা সত্ত্বেও দুঃখজীবী স্বজনের প্রতি উপেক্ষা করিয়া পরজনে দাতৃত্ব করেন, তাঁহার সে ধর্ম্ম আপাততঃ মধু কিন্তু পরিণামে বিষ—তাহা ধর্ম্মের ভান মাত্র।

এই রূপ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে স্বার্থকে উচ্ছেদ করিয়া গার্হস্থ্যকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করা অথবা গার্হস্থ্যকে উচ্ছেদ করিয়া কৌলীন্যকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করা,—সাধারণতঃ—বিশেষ বৃত্তিকে উচ্ছেদ করিয়া সাধারণ বৃত্তিকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করা, ধর্ম্ম নহে—ধর্ম্মের ভান-মাত্র; বিশেষ বৃত্তিকে উচ্ছেদ করা নহে—কিন্তু তাহাকে সাধারণ বৃত্তি দ্বারা নিয়মিত করাই প্রকৃত ধর্ম্ম কার্য্য। পঞ্চম পংক্তির আদর্শ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ; পরমাত্মা ভিন্ন আর কোন কিছুতেই আত্মার আশ মিটিতে পারে না; এটি কেবল এখানে উল্লেখ মাত্র করিলাম, পরিশেষে ইহার প্রমাণ প্রদর্শন করিব। ফরাসিস্ দেশীয় কম্‌ট্—স্ত্রী কন্যা ও মাতা দ্বারা আত্মার আশ মিটাইতে বৃথা আয়াস পাইয়াছেন। গার্হস্থ্যের দৌড় মন পর্য্যন্ত;—আত্মার সাগর-স্পৃহা শান্ত করা সে-এক-ফোঁটা শিশিরের কর্ম্ম নহে। স্ত্রীলোক এবং প্রাকৃত লোকদিগের আত্মার তৃপ্তির জন্য, কম্‌ট্, গার্হস্থ্যকেই আদর্শরূপে বরণ করিয়াছেন,—কিন্তু পণ্ডিত লোকেরা তাহাতে ভুলিবার পাত্র ন'ন,—ইহাঁদের আত্মার তৃপ্তির জন্য তিনি 'মনুষ্যত্ব' বলিয়া একটি দেব-মূর্ত্তি সাজাইয়া তুলিয়াছেন; আর, সভ্যতার মূল-প্রবর্ত্তক পিতৃপুরুষদিগকে জড়ো করিয়া তাঁহাদের নামের মন্ত্র-বলে সেই মূর্ত্তিটির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এ চেষ্টাও বৃথা চেষ্টা; কেননা সভ্যতার দৌড় বুদ্ধি পর্য্যন্ত—তাহার উপরে নহে; সভ্যতা কিছু আর পরমার্থ নহে—যে, আত্মার পিপাসা শান্তি করিবে। লোকে কথায় বলে "দুধের সাধ ঘোলে মেটে না"——এ কথাটি দিব্য এখানে ফলিয়াছে; যে পংক্তির যেটি নহিলে নয়—সে পংক্তিতে তাহার বদলে আর-একটা কিছু আনিয়া দাঁড় করানো নিতান্তই বাল্য-ক্রীড়া। আমরা ওরূপ 'গায়ের জোর' প্রকটনে ক্ষান্ত হইয়া—স্বভাবতঃ যে পংক্তির পর যে পংক্তি আইসে, ও সত্য-সত্যই যাহাতে যে-পংক্তির অভাব-পূরণ হয়, তাহাই যথা-ক্রমে প্রদর্শন করিলাম। এইরূপ, কি পৃথিবীর নানা দেশ-বিদেশ, কি ব্যক্তি-বিশেষের জীবন, যেখানেই আমরা দৃষ্টিপাত করি না কেন—সেইখানেই দেখিতে পাই যে, স্বার্থ হইতে পরমার্থের দিকে গতিই—দৈহিক মঙ্গল হইতে আধ্যাত্মিক মঙ্গলের দিকে গতিই—জড়ত্ব হইতে মনুষ্যত্বের দিকে গতিই—প্রকৃতির অন্তরতম উদ্দেশ্য; আর, প্রকৃতিকে যদি অন্ধভাবে না

দেখিয়া চক্ষুষ্মান্ ভাবে দেখা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত; আবার, আত্মাতে যদি পরমাত্মার প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তবে বুঝিতে পারা যায় যে, তাহাই ঈশ্বরের আদেশ।

পরমার্থের দিক্ নিরূপিত হইল; এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পরমার্থ বস্তুটা কি?

জগতে যদিও নানা প্রকার অমঙ্গল রহিয়াছে, কিন্তু সকলেরই গতি যে, মঙ্গলের দিকে, ইহা সহজ বুদ্ধিতে সকলেরই ধারণা হয়; কিন্তু ইহার উপর তর্ক চালাইলে বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ ভিন্ন তাহার মীমাংসা হইতে পারে না; কিন্তু সে-সকল প্রমাণ কেবা ধৈর্য্য ধরিয়া অনুসন্ধান করে, কেবা ধৈর্য্য ধরিয়া আদ্যোপান্ত লিপিবদ্ধ করে, কেবা ধৈর্য্য ধরিয়া শ্রবণ বা অধ্যয়ন করে! সরল-বুদ্ধি বা সহজ-বুদ্ধি বিনা প্রমাণেই শ্রেয়ঃ হৃদয়ঙ্গম করে; কুটিল-বুদ্ধি বা বিকৃত বুদ্ধি বিনা-প্রমাণেই তাহা অগ্রাহ্য করে; প্রমাণ যিনি—তিনি সপক্ষ এবং বিপক্ষ দুই পক্ষেরই নিকট তাড়া খাইয়া নতশিরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও চারিদিকের জানলা কপাট বন্ধ করিয়া দে'ন। মনে কর অপরাহ্নের কোন একটি নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে দুইটা তালগাছের দুইটা ভূতল-শায়ী ছায়ার দৈর্ঘ্য মাপিয়া এইরূপ দেখা গেল যে,—ছায়া-দ্বয়ের দৈর্ঘ্য অবিকল সমান; যিনিই ঐরূপে ঐদুটা ছায়া মাপিয়া দেখিবেন তিনিই বলিবেন যে, ও-দুই বৃক্ষের আয়তন অবিকল সমান—কেহই তাহার প্রমাণ চাহিবেন না; কিন্তু যদি কেহ তাহার প্রমাণ চাহেন, তবে তাঁহাকে তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করা কি ভয়ানক কষ্টকর ব্যাপার! তিনি হয় তো জ্যামিতির নামও শুনেন নাই, অথচ তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত জ্যামিতির সমস্ত সিদ্ধান্ত-গুলির মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে হইবে; তাহার দুই পংক্তি শুনিয়াই তিনি হয় তো মর্ম্মে জ্বলিয়া বলিবেন "থাক্—যথেষ্ট হইয়াছে—আমি এখন বিদায় হই।" সহজ বিষয়ের প্রমাণ এইরূপ ভয়ানক কঠিন ব্যাপার! যাহা প্রমাণ করা কঠিন, তাহাই যে অপ্রামাণ্য—এ কথার কোন অর্থ নাই। জগতে নানা প্রকার অমঙ্গল রহিয়াছে—এইটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াই তার্কিকেরা মনে করেন যে, ঈশ্বর যে—মঙ্গল স্বরূপ নহেন—তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেখানো হইল; কিন্তু জগতে যদি সহস্র অমঙ্গল থাকে, তাহা হইলেও এটি অপ্রমাণ হয় না যে সকল অমঙ্গলেরই গতি মঙ্গলের দিকে। সকল অমঙ্গলেরই গতি মঙ্গলের দিকে—ইহাই ঈশ্বরের অসীম শক্তি এবং মঙ্গল-ভাবের পরিচয় দিতেছে। জগৎ কিছু-আর পূর্ণ মঙ্গল নহে—স্বয়ং ঈশ্বর নহে—সুতরাং জগতে ন্যূনাধিক পরিমাণে অমঙ্গল থাকিবারই কথা; কিন্তু জগতের মূলে ঈশ্বরের অপরিসীম শক্তি এবং মঙ্গল ইচ্ছা বর্ত্তমান আছে বলিয়াই, যাবতীয় অমঙ্গল উত্তরোত্তর-ক্রমে মঙ্গল হইতে মঙ্গলে পরিণত হইতেছে। নিরীশ্বর মহলে এই কথাটি অকাট্য প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় যে, ঈশ্বর যদি সর্ব্ব-শক্তিমান্—তবে কেন তিনি জগৎকে পূর্ণ মঙ্গল করিয়া সৃষ্টি না করিলেন? ইহার উত্তর এই যে, এরূপ কতকগুলি কার্য্য আছে—যাহা পাগলে স্বচ্ছন্দে করিতে পারে,—বিজ্ঞলোক কোন মতেই করিতে পারে না;—কিন্তু বিজ্ঞ-লোক পাগলের কার্য্য করিতে পারে না বলিয়া—আমরা কি তাঁহাকে ক্ষমতাহীন বলিব? গোল-চতুষ্কোণ—দুই পূর্ণ মঙ্গল—দুই মহাকাশ—সমস্তই উন্মাদের কল্পনা; চতুষ্কোণ বলিবামাত্রই অ-গোল চতুষ্কোণ বুঝায়—

জগৎ বলিবামাত্রই অপূর্ণ জগৎ বুঝায় ;— ঈশ্বরের আবির্ভাব অল্পে অল্পে জগতে পরিস্ফুট হইতেছে,—কিন্তু ঈশ্বরের সর্ব্বাঙ্গীন ভাব জগতে থাকিতে পারে না,—তাই জগৎ অপূর্ণ। গোল-চতুষ্কোণ যেমন অসঙ্গত— দুই মহাকাশ যেমন অসঙ্গত—দুই ঈশ্বর যেমন অসঙ্গত—দুই পূর্ণ-মঙ্গল সেইরূপ অসঙ্গত। দুই ঈশ্বর যেমন অসঙ্গত—দুই পূর্ণ-মঙ্গল সেইরূপ অসঙ্গত। গোল-চতুষ্কোণ হইতে পারে—এরূপ মনে করাই উন্মাদের লক্ষণ,—তাহাতে বুদ্ধির শক্তিহীনতাই প্রকাশ পায়—ক্ষমতার পরিবর্ত্তে অক্ষমতাই প্রকাশ পায়। গোল-চতুষ্কোণ সৃষ্টি করা তো অনেক দূরের কথা—গোল-চতুষ্কোণের সম্ভাব্যতা বিশ্বাস করা পর্য্যন্ত অশক্তির লক্ষণ—নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ। গোল চতুষ্কোণ—দুই পূর্ণমঙ্গল—পাগলের জ্ঞানেই স্থান পাইতে পারে, ঈশ্বরের সুমহৎ জ্ঞানে তাহা কিরূপে স্থান পাইবে? ঈশ্বরের জ্ঞানে যাহা স্থান পাইবার অযোগ্য— তাঁহার সৃষ্টিতে তাহা কিরূপে স্থান পাইবে? বাহিরে যেমন দুই মহাকাশ অসম্ভব, অন্তরে যেমন দুই জীবাত্মা অসম্ভব, জগতে সেইরূপ দুই পরমাত্মা অসম্ভব ; পরমাত্মা স্বয়ংই পূর্ণ মঙ্গল, দ্বিতীয় পূর্ণ মঙ্গল অসম্ভব। গোল-চতুষ্কোণ জানা বুদ্ধি-বিপর্য্যয়েরই লক্ষণ,—যাহা বাস্তবিক সত্য তাহা জানা (যেমন জ্যোতিষ জানা)—ইহাই জ্ঞানের লক্ষণ। সেইরূপ, যাহা জ্ঞান-সঙ্গত নহে—তাহা করিতে না পারা অশক্তির লক্ষণ নহে ; উল্টা আরো, তাহা করিতে পারা যায়—এরূপ মনে করাই অশক্তির লক্ষণ। ঈশ্বর সর্ব্বগত হইয়া সমস্তই জানিতেছেন ; কিন্তু গোল-চতুষ্কোণ—দুই পূর্ণ মঙ্গল—এ সমস্ত অলীক কথা, যাহা আমাদেরই জ্ঞানের অযোগ্য, তাহা তাঁহার পরিশুদ্ধ জ্ঞানে স্থান পাইতে পারে না ;— যাহা তাঁহার জ্ঞানে স্থান পাইবার অযোগ্য, তাহা তাঁহার সৃষ্টিতে কিরূপে আসিবে? জগতে যখন পূর্ণ মঙ্গল নাই—তখন জগতে অমঙ্গল অবশ্যই আছে ; কিন্তু ঈশ্বরের অপরিসীম শক্তির প্রভাবে জগৎ মঙ্গলের দিকে আকৃষ্ট রহিয়াছে—জগৎ মঙ্গলের [illegible] নানা-বিধ বেদনা অনুভব করিতেছে—নানা-বিধ শক্তি প্রকটন করিতেছে ;—সকল শক্তির মূলে ঈশ্বরের মহতী শক্তি বিদ্যমান—এই অর্থে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ ; ঈশ্বরের মহতী শক্তি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কোন ঘটনাতেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না এই অর্থে ঈশ্বরের শক্তি অসীম শক্তি। অতএব "ঈশ্বর গোল-চতুষ্কোণ সৃষ্টি করিতে পারেন না" বলিলে নহে—কিন্তু "পারেন" বলিলেই তাঁহার জ্ঞান এবং শক্তিতে ক[illegible] আরোপ করা হয়। পরমার্থ কি—ই[illegible] ধান সত্যসত্যই প্রমাণ-দ্বারা অবগত হই[illegible] ইচ্ছা করেন, তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য এই [illegible] তিনি শেষ-পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া যত্ন-পূর্ব্বক তাহার অনুসন্ধান করেন—একটুতেই [illegible] ধৈর্য্য না হ'ন। আপনি অনুসন্ধান ক[illegible] স্বতন্ত্র, আর, তর্ক দ্বারা অন্যের মত খণ্ডন করা স্বতন্ত্র ; তর্কের ভিতর নানা প্রকার কুতর্ক প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু [illegible] অনুসন্ধানের মধ্যে কুতর্ক প্রবেশ করিতে পথ পায় না। অনুসন্ধান নিষ্ফল হইতে পারে,—তাহা হইলে সত্য জানা [illegible] না—এই পর্য্যন্ত ; কিন্তু কুতর্ক যেমন সত্যের পরিবর্ত্তে মিথ্যা দাঁড় করায়—অনুসন্ধান সে পাপে লিপ্ত হয় না। [illegible] একটা অভিপ্রেত বিষয়—যাহা আমরা নিজে বুঝি না, তাহা যখন আমরা অন্যকে [illegible] ইতে যাই, তখন আমরা কুতর্ক দ্বারা [illegible] হার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার চে[illegible]

করি; কিন্তু আমরা যখন প্রাণপণ যত্নে কোন-একটা বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে চাই, তখন আমরা পারৎপক্ষে আপনার চক্ষে সেরূপ ধূলি নিক্ষেপ করি না। পরন্তু যেখানে সত্য অনুসন্ধান নহে—কেবল জয়-পরাজয়ই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, সেখানে আমরা আপনার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিব—তাহাও স্বীকার, তথাপি—কোটি বজায় রাখিতেই হইবে—তাহা প্রাণান্তেও ছাড়া হইবে না—এইটি আমাদের সংকল্প। অতএব পরমার্থ কি—ইহা যাঁহারা সত্যভাবেই জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক আপন অন্তরান্বেষণে প্রবৃত্ত হউন; অন্য লোকের কাছে [illegible] বা নাস্তিক বুঝাইতে [illegible] যত্নপূর্ব্বক আপনি তাহা [illegible] পরমার্থ-সম্বন্ধে তাঁহার মনে যদি কোন প্রশ্ন উদিত হইয়া থাকে—পরমার্থ আছে কি না, পরমার্থ নাই এইরূপ যদি কোন প্রশ্ন উদিত হইয়া থাকে, তবে তিনি আপনি সেই প্রশ্নের ভিতর তলাইয়া দেখুন,—তাঁহার শ্রম নিতান্ত নিষ্ফল হইবে না। তাঁহার প্রশ্নের গভীর অভ্যন্তরে তিনি যে এক মুহূর্ত্তেই তলাইতে পারিবেন—এরূপ প্রত্যাশা করাই অন্যায়; ধৈর্য্য ধরিয়া তাঁহাকে অল্প অল্প করিয়া তলাইতে হইবে,—ক্রমে তিনি দেখিবেন যে, সে প্রশ্নের গভীর অন্তস্তলে তাহার উত্তর ঝক্‌মক্ করিতেছে; দেখিবেন যে, সে উত্তর মনুষ্য-জ্ঞানের নিতান্ত অগম্য নহে। এখন, পরমার্থ কি, এই প্রশ্নটির ভিতর কি জ্যোতির্ম্ময় রত্ন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

পরমার্থ কি? অর্থাৎ মনুষ্য-জীবনের পরম অর্থ কি? এ প্রশ্নের ভিতর আর একটি প্রশ্ন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; সে-টি এই যে, মনুষ্য-জীবনের পরম অভাব কি? ক্ষুধারূপী অভাব যদি আমাদের না থাকিত, তবে খাদ্য আমাদের অর্থের মধ্যে পরিগণিত হইত না। ক্ষুধা আছে বলিয়াই খাদ্যের অন্বেষণ; পরম অভাব আছে বলিয়াই পরম অর্থের অন্বেষণ। ক্ষুধা-তৃষ্ণা আমাদের বিশেষ একজাতীয় অভাব; কিন্তু তাহা ছাড়া আরো নানা জাতীয় অভাব আমাদের আছে; [illegible]-স্থিত ব্যক্তির ক্ষুধা-তৃষ্ণার জন্য কোন ভাবনা নাই, কিন্তু তাহার সমস্ত [illegible] পরিপূর্ণ? আমাদের বিশেষ বিশেষ নানা জাতীয় অভাবের মধ্যে এক সাধারণ অভাব কি? পরম [illegible] কিন্তু আমরা পরিমিত—এইটিই আমাদের পরম অভাব। বিশেষ বিশেষ অভাবের [illegible] বিশেষ আধার আছে; এক-একটা বিশেষ অভাবের এক-একটা বিশেষ বিষয় আছে;—অন্ধকারটা [illegible] অভাবের আধার চক্ষুরিন্দ্রিয়। [illegible] চক্ষুরিন্দ্রিয় নাই, সে জীব আলোকের অভাব কি না [illegible] উপলব্ধি করে না। অন্ধকার-রূপী অভাবের আধার চক্ষুরিন্দ্রিয়, এবং তাহার আকাঙ্ক্ষার বিষয়—আলোক। নিস্তব্ধতা-রূপী অভাবের আধার শ্রবণেন্দ্রিয় এবং তাহার আকাঙ্ক্ষার বিষয়—শব্দ। এখানে দেখিতে হইবে যে, চক্ষু কেবল অন্ধকার-রূপী একটি-মাত্র অভাবের আধার; কর্ণ কেবল নিস্তব্ধতা-রূপী একটি মাত্র অভাবের আধার; উভয়ের কেহই সাধারণতঃ সকল অভাবের আধার নহে; কিন্তু "আমরা পরিমিত" ইহা আমাদের সকল অভাবের মূলস্থিত সাধারণ অভাব—এই সাধারণ অভাব-টির আধার কে? আত্মাই, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সাধারণ মধ্যস্থল; অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আত্মাই ঐ সাধারণ অভাবটির আধার; আত্মাই অপূর্ণতা-রূপী অভাবের আধার। আত্মার এই যে, পরম

অভাব, ইহার অর্থ (কি না আকাঙ্ক্ষার বিষয়) কাজেই পরম অর্থ—এক কথায়—পরমার্থ। সে পরমার্থ কি? চাক্ষুষ অভাব যে, অন্ধকার, তাহার আকাঙ্ক্ষার বিষয় অন্ধকারের অবিকল বিপরীত; কি? না আলোক; তেমনি আত্মার অভাব যে, অপূর্ণতা, তাহার আকাঙ্ক্ষার বিষয় অপূর্ণতার অবিকল বিপরীত—কি?—না পূর্ণ মঙ্গল। অতএব, পূর্ণ মঙ্গলই আত্মার পরম অর্থ—এক কথায়—পরমার্থ। এখন চক্ষু অন্ধকার-রূপী অভাবের আধার, আত্মা অপূর্ণতা-রূপী অভাবের আধার, এ যেন হইল; কিন্তু আলোকের আধার কে? পূর্ণ মঙ্গলের আধার কে? আলোকের আধার—সূর্য্য; পূর্ণ মঙ্গলের আধার—পরমাত্মা।

পরমার্থের দিক্ যে কি, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি; প্রবৃত্তি হইতে স্বার্থের দিক্ পরমার্থের দিক্, স্বার্থ হইতে লোকার্থের দিক্ পরমার্থের দিক্, লোকার্থ হইতে নিরপেক্ষ মঙ্গলের দিক্ পরমার্থের দিক্; এখন পাইতেছি যে, পূর্ণ মঙ্গলই পরমার্থ এবং তাহার আধার—পরমাত্মা। প্রকৃতির অভ্যন্তরে কোথাও সাক্ষাৎ পরমার্থ নাই—পূর্ণ মঙ্গল নাই; কিন্তু প্রকৃতির সর্ব্ব স্থানেই পরমার্থের দিকে—পূর্ণ মঙ্গলের দিকে—গতি নিরন্তর চলিতেছে; তাই, অসভ্যতার মধ্য হইতে সভ্যতা, অধর্ম্মের মধ্য হইতে ধর্ম্ম, অজ্ঞানের মধ্য হইতে জ্ঞান, ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত হইতেছে। কোথায় কোন্ এক অলক্ষিত ভাণ্ডার রহিয়াছে (আছে এই খানেই—আমরা মনে করিতেছি কতই না জানি দূরে) সেই পরমাশ্চর্য্য অলৌকিক ভাণ্ডার হইতে মনুষ্যের আত্মার অভাব নিত্য নিত্য পরিপূরিত হইয়া আসিতেছে; সে ভাণ্ডার পূর্ণ ভাণ্ডার—সে ভাণ্ডার অক্ষয় ভাণ্ডার; তাহার নাম পূর্ণ মঙ্গল এবং তাহার অধ্যক্ষ এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা। পরমাত্মার এই পূর্ণ মঙ্গল—যাহা সমস্ত প্রকৃতির মূলে কার্য্য করিয়া সকলকেই নিম্ন পংক্তি হইতে ক্রমে ক্রমে উচ্চ পংক্তিতে উঠাইয়া দিতেছে—এই পূর্ণ মঙ্গলের সহিত আমরা যদি আমাদের ইচ্ছাকে একতানে মিলিত করি, তাহা হইলে—যদি সমস্ত জগতের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় তবেই আমাদের ইচ্ছা ব্যর্থ হইবে, কিন্তু বরং সূর্য্য পশ্চিমে উদিত হইতে পারে, নিখিল আকাশ রসাতলে নিমগ্ন হইতে পারে, তথাপি পূর্ণ মঙ্গলের একটি রেণু কণাও বিচলিত হইতে পারে না, যথার্থ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির আধ্যাত্মিক অন্তঃসারের দুর্ভেদ্য প্রভাবও ব্যর্থ হইতে পারে না।

সকলেই দেখিতে পাইতেছেন যে, এ পর্য্যন্ত যত কিছু বলা হইল, সমস্তই কাটা ছাঁটা করিয়া বলা হইল। কিন্তু উপসংহার স্থলে খাঁটা সোজা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। অনেক কাল প্রসব বেদনা ভোগ করিয়া, স্বার্থ—গার্হস্থ্য প্রসব করে, গার্হস্থ্য কৌলীন্য প্রসব করে কৌলীন্য—সভ্যতা প্রসব করে, সভ্যতা—পরমার্থ প্রসব করে। এই সব প্রসব বেদনা বিপ্লব নামে প্রসিদ্ধ। ধর্ম্ম-সোপানের প্রত্যেক পংক্তিতে হাঁ এবং না এই দুইটি দিক্ আছে; তাহার মধ্যে না'য়ের দিকে লোকের বেশী ঝোঁক পড়িলেই লোক-সমাজে বিপ্লব ও মাতামাতি উপস্থিত হয়। গত শতাব্দীর ফরাসিস্ রাজ্য-বিপ্লব ইহার একটি জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। গত শতাব্দীতে, ইউরোপে, সভ্যতা-পংক্তি হইতে পরমার্থ-পংক্তিতে উত্থান করিবার একটা অব্যবস্থিত উদ্যম—আঁকুবাঁকু—চারিদিকে মস্তক উত্তোলন করিয়া উঠিয়াছিল। এ অবস্থায়, সভ্যতা-পংক্তি ছাড়িয়া দেওয়া না'য়ের দিক্ (প্রসিদ্ধ ফরাসীস্ গ্রন্থকার রোসো ইহার পথ প্রদর্শক), ও পরমার্থ পংক্তি

রূপে কার্য্যোদ্ধার হয়—তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকলে সমবেত হইয়া কার্য্য করাই এখনকার কালে শোভা পায়। কিন্তু আমাদের দেশে এখনো কৌলীন্যের এমনি প্রাদুর্ভাব ও সভ্যতার এমনি হীনাবস্থা যে, কোন একটি কার্য্য-সাধনের অভিপ্রায়ে দশ-জন একত্র হইলেই কার্য্যোদ্ধারের দিকে কাহারো লক্ষ্য থাকে না—আপনার আপনার প্রাধান্যের দিকে সকলেরই লক্ষ্য সন্নিবিষ্ট হয়। ইউরোপীয় কার্য্য-ক্ষেত্রে, অগ্রে কার্য্যোদ্ধার—তাহার পরে আর যাহা কিছু,—এই-স্পষ্ট-একটি ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান পরিচায়ক। ইউ-রোপীয়দিগের নিকট হইতে আমরা আর-কিছু শিখি বা না শিখি—এই পরস্পরাধীন-তার ভাবটি শিক্ষা করা আমাদের পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক হইয়াছে। আমার আপ-নার দ্বারাই বা কি কার্য্য ও কতটা কার্য্য হইতে পারে, এইটি নিরপেক্ষ ভাবে পর্য্যা-লোচনা করিয়া দেখিয়া আপনি আপনার উপযুক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া এবং অন্যকে তাহার আপনার উপযুক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেওয়া—তাহার সে কার্য্যে কোন প্রকার বাধা নিক্ষেপ না করা, এইটি হইলেই সকলে সমবেত হইয়া কার্য্য করিবার পথ—এক কথায় সভ্যতার সোপান—আমাদের দেশে উন্মুক্ত হইয়া যায়। এরূপ হইলে, সভ্যতা-পংক্তি হইতে পরমার্থ পংক্তিতে উত্থান করিবার পথ এখনকার অপেক্ষা অনেক পরিমাণে নিষ্কণ্টক হইয়া যায়।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্ন লিখিত ও পুস্তক পত্রিকাগুলি উঁহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। ঈশ্বর স্তোত্র ও প্রার্থনা। বাঁকুড়া ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইয়া প্রকা-শিত।

২। নবগীত মঞ্জরি, প্রথম খণ্ড। শ্রী নবীনচন্দ্র দাস প্রণীত।

৩। সাঙ্খ্য-সূত্র। কপিল মহর্ষিকৃত। অনিরুদ্ধ ভট্টকৃত বৃত্তি ও বঙ্গানুবাদ সহিত শ্রী কালীবর বেদান্ত-বাগীশ কর্তৃক সংশোধিত ও প্রকাশিত।

৪। জীবন পরীক্ষা বা ভীষণ স্বপ্ন চতুষ্টয়। প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা বিরচিত।

৫। শতদল। শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

৬। ভক্তি ও ভক্ত। শ্রীশ্রী কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন কর্তৃক ব্যাখ্যাত।

৭। নীতি পাঠ ও [illegible]। শ্রী ঈশানচন্দ্র বসু বিরচিত।

৮। মধ্য বাঙ্গালা সম্মিলনীর চতুর্থ সাংবৎসরিক কার্য্য বিবরণ। বঙ্গাব্দ ১২৯২-৯৩।

৯। হোমিও প্যাথিক চিকিৎসা সার। শ্রী অভয়-কৃষ্ণ [illegible] কর্তৃক সঙ্কলিত।

১০। Phrenological relation of the brain in its mental functions by Nursing chandra Haldar.

Jurnal of the Asiatic Society of Bengal Vol LV. Part 1. No. 111. 1886.

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal November 1886.

Theosophist—December 1886.

Hindu Reformer, December 1889.

Fellow-Worker—November 1886.

ভারতী ও বালক। অগ্রহায়ণ ১২৯৩।

নব্য ভারত। মাঘ ঐ।

বামাবোধিনী। অগ্রহায়ণ ঐ।

বেদব্যাস। ঐ ঐ।

বীণা। ঐ ঐ।

সজ্জন তোষণী। কার্ত্তিক ঐ।

বান্ধব। ঐ ঐ।

ধর্ম্ম প্রচারক। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ঐ।

আর্য্য-প্রতিভা। অগ্রহায়ণ ঐ।

বৈষ্ণব। ভক্তি প্রচারক পত্রিকা। কার্ত্তিক ঐ।

বিজ্ঞাপন।

বহুকাল হইল আদি ব্রাহ্ম-সমাজের গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। এখন ইহা নিতান্ত জীর্ণ। ১১ মাঘের উৎসব উপলক্ষে বহু লোকের সমাগম হয়। ইহাতে বিলক্ষণ অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। এ জন্য ট্রষ্টীরা এস্থানে ঐ উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। পরে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের অধ্যক্ষেরা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করাতে তিনি আপনার বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে মাঘোৎসবের স্থান স্থির করিয়া দিয়াছেন। অতএব আগামী ১১ মাঘ রবিবার প্রাতঃকালের ব্রহ্মোপাসনা আদি ব্রাহ্ম-সমাজের ত্রিতল গৃহে না হইয়া শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে হইবে। ঐ দিন সর্ব্বসাধারণে প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আদি ব্রাহ্মসমাজের নিযুক্ত কর্ম্মচারী।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু।

ট্রস্টী।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ([illegible])
,, রাজারাম মুখোপাধ্যায়।
,, রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
,, মহাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
,, শ্রীনাথ মিত্র।
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
,, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী।
,, আশুতোষ চৌধুরী।
,, অমিয়নাথ মুখোপাধ্যায়।
,, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সহকারী সম্পাদক ও [illegible]।

শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায়।

ধনাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ মিত্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[illegible]নী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

আয় ব্যয়।

শ্রাবণ হইতে কার্ত্তি[illegible] ৪ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	... ...	১৭৪৪৸৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৯৮০৸ ৬
সমষ্টি	... ...	৪৭২৫॥৶০
ব্যয়	...	২০৩১॥ ৬
স্থিত	... ...	২৬৯৪৶০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজে ... ... ১৩৯॥৵৩

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	
ব্রহ্ম সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সাহায্য	৪০৲
শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
" " রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়	২৲
" " শ্রীনাথ মিত্র	১৲
" " বৈকুণ্ঠনাথ সেন	২৲

সাম্বৎসরিক দান।

রায় রমণীমোহন চৌধুরী তুষভাণ্ডার	২৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
" " গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
" " নীলকমল মুখোপাধ্যায়	১০৲
" " কাশীনাথ দত্ত	২৲
শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনেশচন্দ্র বসু	২৲
" " কৈলাশচন্দ্র সিংহ	১৲
" " নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস	১৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	১৲
দানাধারে প্রাপ্ত	৯॥৵৩
	১৩৯॥৵৩

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৮৬॥৬
পুস্তকালয়	...	৫০।৵৬
যন্ত্রালয়	..	৮৩৯।০
গচ্ছিত	...	২৩৯ /৯
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৩২৸০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার	...	৬০৲
দাতব্য	...	৮৬৲
অধ্যাত্ম রামায়ণ		১১।৭
সমষ্টি		১৭৪৪৸৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	৩৮১॥/৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৪৯।৩
পুস্তকালয়	... ...	৬৯/০
যন্ত্রালয়	...	১০০৮/৩
গচ্ছিত	... ...	৩৬ ৶৩
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১৭/০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার		৬[illegible]
দাতব্য		৯৫৲
অধ্যাত্ম রামায়ণ		১৫৲
সমষ্টি	... ...	২০৩১॥ ৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

[illegible]

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৪ মাঘ [illegible]

[illegible] উপদেশ।

আমরা প্রতিজনেই আপনাকে আপনাকে দুই ভাবে দেখিতে পারি,—নিখিল সমস্তের সহিত সংযুক্ত ভাবে, এবং নিখিল সমস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে। সমস্তের সহিত সংযুক্ত ভাবই পারমার্থিক ভাব, আর সমস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবই সাংসারিক ভাব। এই পারমার্থিক ভাবের মূল কেন্দ্র স্বয়ং পরমাত্মা, এবং এই সাংসারিক ভাবের মূল কেন্দ্র জীবাত্মা। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগ—পরমার্থের সহিত সংসারের যোগ—অকাল মহাকালের সহিত বর্তমান কালের যোগ—ইহাই অধ্যাত্ম-যোগ। অধ্যাত্ম-যোগের নানা পদ্ধতি নানা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যে পদ্ধতি ব্রাহ্মদলের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয় তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মে উপদিষ্ট হইয়াছে; তাহা এই,—

"প্রণবোধনুঃ শরোহাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়োভবেৎ"

ওঙ্কার ধনু স্বরূপ জীবাত্মা শর স্বরূপ [illegible] পরমাত্মা [illegible] সেই [illegible] পরব্রহ্মেতে [illegible] হইবে। [illegible] কঠিন কার্য্য [illegible] প্রমাদ শূন্য হইতে হইলে প্রমাদের মূল কারণ অন্তঃকরণ হইতে উচ্ছিন্ন করা আবশ্যক। প্রমাদের মূল কারণ আমাদের আত্মগরিমা; আত্মগরিমার উচ্ছেদের একমাত্র উপায় এই—পরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে জীবাত্মা যে কি প্রগাঢ় হীনাবস্থায় নিপতিত হয়, তাহা আপনাতে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা। আপনার ঐকান্তিক অকিঞ্চনতা উপলব্ধি করা, আর, পরমাত্মার অপার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা—এ দুই উপলব্ধি-কার্য্য বাস্তবিক কিছু আর দুই কার্য্য নহে—ইহা একই কার্য্যের দুই পৃষ্ঠ। আপনার প্রগাঢ় অকিঞ্চনতার উপলব্ধিতেই পরমাত্মার অপার মাহাত্ম্যের উপলব্ধি হয়, এবং পরমাত্মার অপার মাহাত্ম্যের উপলব্ধিতেই আপনার প্রগাঢ় অকিঞ্চনতার উপলব্ধি হয়। এ কথার সত্যাসত্য যদি পরীক্ষা করিতে চাও—তবে দ্বিপ্রহর রজনীতে একাকী কোন ঝিল্লিকা-নিনাদিত গহন অরণ্যে প্রবেশ কর—পর্ব্বত

এদেশে এমন অনেক অরণ্য আছে যেখানে হিংস্র জন্তুর গতিবিধি নাই—সেইরূপ কোন অরণ্যে দ্বিপ্রহর রজনীতে একাকী প্রবেশ কর, তাহা হইলেই—এক দিকে আপনি এবং আর-এক দিকে নিখিল সমস্ত—এই দুয়ের তুলনায় আপনার প্রগাঢ় অকিঞ্চনতা দেদীপ্যমান হইয়া উঠিবে; সেই নিস্তব্ধ মুহূর্ত্তে নিখিল সমস্ত ভেদ করিয়া যখন ঈশ্বরের পবিত্র চক্ষু অনাবৃত আত্মার অভ্যন্তরে নিপতিত হইবে—তখন পাপ-কলুষিত আত্মা আপাদ-মস্তক প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়া লুকাইবার আর স্থান পাইবে না; এই সময়ে যখন সাধক উচ্চৈঃস্বরে ওঙ্কার ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া পরমাত্মার অপার করুণার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, তখনই ওঙ্কার ধনু অবলম্বনে জীবাত্মারূপ শর পরব্রহ্মরূপ লক্ষ্যেতে তন্ময়ীভূত হইয়া যায়।

পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইতে হইলে আত্মাই তাহার একমাত্র দ্বার—তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় দ্বার নাই। আত্মার দ্বার তিনটি—জ্ঞান প্রেম এবং কর্ম্ম; তাই অধ্যাত্ম-যোগ ত্রিধা-বিভক্ত—জ্ঞান-যোগ, প্রেম-যোগ এবং কর্ম্মযোগ। আপনার প্রগাঢ় অজ্ঞতা-জ্ঞানের দ্বার দিয়া ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা উপলব্ধি করাই জ্ঞান-যোগের আরম্ভ-সূত্র। আমরা অসত্য জানি না—"দুই আর দুয়ে পাঁচ হয়" জানি না—ইহা আমাদের অজ্ঞতার লক্ষণ নহে,—কিন্তু আমরা সত্য জানি না—এক গাছি ক্ষুদ্র তৃণেরও প্রকৃত তত্ত্ব জানি না—ইহাই আমাদের অজ্ঞতার লক্ষণ। "দুই আর দুয়ে পাঁচ হয়" ইহা আমরা জানিও না—জানিতে চাহিও না, এই জন্য আমরা তাহা জানি না বলিয়া আমাদের খেদের কোন কারণ নাই। জ্ঞানের সহিত যাহার আদবেই কোন সম্পর্ক নাই—এরূপ সত্তা আমরা জানি না বলিয়া ইউরোপীয় তার্কিকেরা অত্যন্ত খেদ প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু "দুই আর দুয়ে পাঁচ" যেমন হইতেই পারে না—পৃষ্ঠা-রহিত পত্র যেমন হইতেই পারে না, সেইরূপ জ্ঞানের সহিত একেবারেই সম্পর্ক-রহিত—এরূপ সত্তা হইতেই পারে না,—অতএব তাহা না জানার জন্য খেদের কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য, এমন অনেক সূক্ষ্ম সত্তা আছে, যাহা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের অগোচর,—কিন্তু যাহা একেবারেই জ্ঞানের অগোচর—ঈশ্বরেরও জ্ঞানের অগোচর—এরূপ সত্তা হইতেই পারে না; "দুই আর দুয়ে পাঁচ" যেমন অসঙ্গত, ওরূপ অন্ধ সত্তাও সেইরূপ অসঙ্গত; অতএব ওরূপ সর্ব্বজ্ঞান-বহির্ভূত সত্তা আমরা জানি না বলিয়া—অসত্য জানি না বলিয়া—আমাদের খেদের কোন কারণ নাই। আমাদের খেদের কারণ কেবল এই যে, আমরা একগাছি তৃণেরও প্রকৃত তত্ত্ব জানি না, অথচ আমরা আপনাকে বিপর্য্যয় জ্ঞানী মনে করি। আমরা যে কত অজ্ঞান, তাহা যদি আমরা একবার প্রণিধান-পূর্ব্বক হৃদয়ঙ্গম করি, তবে সেই সঙ্গে আমরা এই মহান্ সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করি যে, ঈশ্বর সমস্তই জানিতেছেন। অতএব আমাদের অজ্ঞতাবাদ ইউরোপীয় অজ্ঞতাবাদের ন্যায় অলীক এবং নৈরাশ্যপূর্ণ নহে, কিন্তু আমাদের অজ্ঞতা ঈশ্বর-প্রসাদে ক্রমশই জ্ঞানে পরিণত হইতে থাকিবে এইরূপ আশায় পরিপূর্ণ।

এখন, জ্ঞান-যোগ কি? আপনার অজ্ঞতা-উপলব্ধির মধ্য দিয়া পরমাত্মার পূর্ণ জ্ঞানে যুক্ত হওয়াই জ্ঞান-যোগ; আপনার অজ্ঞতা-জ্ঞান [illegible] শর-স্বরূপ ও পরমাত্মার পূর্ণ জ্ঞান [illegible] লক্ষ্য-স্বরূপ। প্রেম-যোগ কি? [illegible]-জনিত ব্যা-

কুলতার মধ্য দিয়া পরমাত্মার পূর্ণ আনন্দে যুক্ত হওয়া ; অন্তঃকরণের ব্যাকুলতা এখানে শর-স্বরূপ ও পরমাত্মার পূর্ণ আনন্দ এখানে লক্ষ্য-স্বরূপ। কর্ম্ম যোগ কি? না আপনার প্রগাঢ় দৈন্যের মধ্য দিয়া পরমাত্মার মঙ্গলময় শক্তিতে যুক্ত হইয়া তাঁহার আদিষ্ট কর্ম্ম সাধন করা ; এখানে আপনার দৈন্যই শর-স্বরূপ ও পরমাত্মার মঙ্গলময় শক্তিই লক্ষ্যস্বরূপ। এইরূপ যত প্রকার যোগ আছে—আপনার অকিঞ্চনতা এবং পরমাত্মার করুণাই সমস্তেরই সার সম্বল।

হে পরমাত্মন্! এই ভয়াবহ সংসার-সমুদ্রে তুমিই আমাদের একমাত্র কর্ণধার। আমরা অজ্ঞান ও মোহে আচ্ছন্ন হইয়া বিপথে পড়িলে তুমিই আমাদিগকে জ্ঞানালোক প্রদর্শন কর ; আমাদের প্রাণ অধীরে ক্রন্দন করিলে তুমিই তোমার প্রেম-মুখ প্রদর্শন করিয়া আমাদের ব্যাকুলতা হরণ কর ; আমরা দীন হীন অসহায় হইলে তুমিই আমাদের একমাত্র সহায় হইয়া আমাদিগকে অমোঘ আশ্রয় প্রদান কর ; তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর নাই—আমরা যেন তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া সংসারের বিষময় পথে বিচরণ না করি—তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার প্রসাদ বিতরণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সপ্তপঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ রবিবার ৫৭ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

প্রাতঃকাল।

এবারে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়েরই বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে ১১ মাঘের প্রাতঃকালীন মহোৎসব হইয়াছিল। তথায় অতি বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপের নিম্নে ও বাহিরে বহু সংখ্যা লোক উপবিষ্ট হন। প্রাতঃকালে এরূপ জনতা ও উৎসাহ কখন দৃষ্ট হয় নাই। ব্রহ্মনামের কি গূঢ় ও গভীর আকর্ষণ। এই মহোৎসবে কোন বাহ্যাড়ম্বর নাই অথচ লোকের এইরূপ অনুরাগ। ইহা বাস্তবিকই ব্রাহ্মের মনে ভবিষ্যতের আশা প্রদীপ্ত করিয়া দেয়। ক্রমশ জন-কোলাহল নিস্তব্ধ হইলে বন্দনাগীত আরম্ভ হইল। পরে আচার্য্যেরা বেদি গ্রহণ করিলে পণ্ডিত শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নের উপদেশ ও উদ্বোধন পাঠ করিলেন।

ধর্ম্মসাধনই ব্রহ্মলাভের কারণ। কিন্তু কথাটী বড় সহজ নয়। ইহার জন্য ইচ্ছা চিন্তা ও কার্য্যের ক্রমশ সম্প্রসারণ আবশ্যক। কিন্তু কোন্ উপায়ে ইহা সহজ। মনুষ্যের যখন সমাজবন্ধন হয় নাই তখন প্রবৃত্তি তাহার নিয়ন্তা ছিল। এই প্রবৃত্তি হইতে স্বার্থের জন্ম এবং স্বার্থ হইতে গার্হস্থ্যের ভিত্তি নির্ম্মাণ হয়। এই অবস্থায় কেবল স্বার্থের আর একাধিপত্য থাকিতে পারে না। সমাজের স্থিতির নিমিত্ত পরার্থও দুরপনেয় হইয়া উঠে। আমি যখন সমাজ-সূত্রে আর পাঁচ জনের সহিত সম্বদ্ধ তখন তাহাদের স্বার্থ আমার উপেক্ষার বিষয় হইলে চলে না। সুতরাং গার্হস্থ্যই আত্মসম্প্রসারণের সহজ ও সুন্দর উপায়।

এক্ষণে দেখা যাক্ কোন্ সমাজের গার্হস্থ্য ব্যবস্থা ইহার অনুকূল। তুমি পৃথিবীর যে কোন সমাজ পরীক্ষা কর তন্মধ্যে স্বার্থ ও পরার্থের সঙ্কোচন ও প্রসারণ দেখিতে পাইবে কিন্তু প্রাচীন ভারতের গার্হস্থ্য সর্ব্বাপেক্ষা স্বতন্ত্র। এখানে পরার্থই স্বার্থ এবং পরমার্থ তাহার নিয়ন্তা। এই পরমার্থের নামান্তর সার্ব্বভৌম মহাব্রত। অর্থাৎ ইহা দেশকাল নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ ধর্ম্মনিয়ম।

এই মহাব্রতে প্রাচীন ভারতের গার্হস্থ্য জীবন নিয়মিত হইত। আমি এই প্রসঙ্গে অধিক বলিতে চাই না, ছত্রিশ বৎসর ত্রৈবেদিক ব্রত সমাপনের পর গার্হস্থ্যে প্রবেশ করিয়া লোকে যাহা করিত তাহারই একটী উল্লেখ করিব। প্রাচীন সমস্ত গার্হস্থ্য কার্য্যের একমাত্র পৃষ্ঠবংশ পঞ্চযজ্ঞ। এই পঞ্চযজ্ঞ শব্দে হয়তো অনেকে মনে করিতে পারেন ইহা প্রাচীন কালের কুসংস্কারোপহত একটী সংকীর্ণ ক্রিয়া মাত্র। বাস্তব ইহা ক্রিয়া বটে কিন্তু ইহার প্রসার বিশ্বব্যাপক। এখনকার গার্হস্থ্য নিয়মে স্বগৃহের বড় জোর প্রতিবাসীর কতকটা শ্রেয় সাধিত হয় কিন্তু এই প্রাচীন পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠায়ী গৃহীর গৃহ্য ধর্ম্ম স্বপরনির্ব্বিশেষে সার্ব্বভৌমিক মঙ্গলে প্রসারিত হইয়াছে। এই জন্যই বলিয়াছি পরমার্থ ইহার নিহিত। ফলত ইহা গৃহীর দৈনিক একটী অপরিহার্য্য কার্য্য ছিল। ইহাতে ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত শ্রেয় সম্পূর্ণ নির্ভর করিত এবং ইহা দ্বারা ইচ্ছা চিন্তা ও কার্য্য ক্রমশ সম্প্রসারিত হইয়া পরম পুরুষার্থ লাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিত।

দেব, ঋষি, পিতৃ, মনুষ্য ও তির্য্যক্‌জাতির সেবা এই পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্ভূত। ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মপূজা দেবসেবা। অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ঋষিসেবা। লোকান্তরিত আত্মার স্মরণ পিতৃসেবা। অভ্যাগতের অন্নদান মনুষ্যসেবা। আর পশুপক্ষ্যাদির তৃপ্তিসাধন ভূতসেবা। ভগবান মনু বলিয়াছেন যিনি প্রতিদিন এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক ও সমদর্শী। তাঁহার দয়ার অন্ত নাই, স্নেহের পার নাই। তিনি এক পলকে আমাদের ইহ কাল ও পরকাল উভয়ই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এই মহান্ আদর্শে ক্ষুদ্র আত্মশক্তি প্রসারণের চেষ্টাই হিন্দুর ব্রহ্মসাধন ও দেবসেবা। পঞ্চযজ্ঞের এই কএকটী কার্য্যে তাহাই শিক্ষা হইয়া থাকে। জ্ঞান দ্বারা অন্যকে মোহমুক্ত করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য আর নাই, এই বুঝিয়া ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসরের সমষ্টি জ্ঞানের উপর আরও আহরণ ও মুক্ত হস্তে তাহা বিতরণ করা হইত। ইহা জ্ঞানযোগে জনসমাজে আত্মপ্রসারণ। প্রাচীন হিন্দুর হৃদয় কেবল জীবিতের শুভ কামনায় তৃপ্ত নয় এই জন্য যে সমস্ত আত্মা পৃথিবীর মায়াবন্ধন ছিঁড়িয়া লোকান্তরে বাস করিতেছে, যেষাং ন মাতা, যাহাদের মাতা নাই ঈশ্বরই মাতা, ন পিতা, পিতা নাই ঈশ্বরই পিতা, ন বন্ধুঃ, বন্ধু নাই ঈশ্বরই বন্ধু, নৈবান্নসিদ্ধিঃ, অন্নসিদ্ধি নাই ঈশ্বরই অন্ন, শ্রদ্ধার সহিত প্রতিদিন তাঁহাদিগকে স্মরণ ও তাঁহাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক শুভ কামনা করা হইত। ইহা শ্রদ্ধাযোগে লোকান্তরে আত্মসম্প্রসারণ। প্রাচীন হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস নিজের নিমিত্ত পাক করা পাপ আহার করার তুল্য, এই জন্য যে অন্নপূর্ণার স্থালীকটাহে তাঁহাদের একমুষ্টি ছিল তদ্দ্বারা বর্ণ ও জাতি নির্ব্বিশেষে ক্ষুৎপিপাসায় শ্রান্ত ক্লান্ত অভ্যাগত অন্ধ আতুর সকল প্রকার লোককে তৃপ্ত করা হইত। ইহা সাম্যযোগে আত্মপ্রসারণ। পৃথিবীর পশু পক্ষী প্রভৃতিকে আর কে কৃপার চক্ষে দেখিয়া থাকে, উহারা তো মনুষ্যের সদর্প পদক্ষেপেই দলিত হয়, কিন্তু পূর্ব্বের গার্হস্থ্য নিয়মে তাহাদিগেরও ক্ষুৎপিপাসা উপেক্ষিত হইত না। ইহা করুণাযোগে আত্মপ্রসারণ।

এই তো পঞ্চযজ্ঞ। এখন বুঝিয়া দেখ এই সমস্ত কার্য্য কেবলই পরার্থ এবং এই পরার্থে স্বার্থ অন্তর্ভূত। এইরূপ গৃহ্য নিয়ম কেবল নিজের ও প্রতিবাসীর নয় কিন্তু সমস্ত বিশ্বের মঙ্গল সাধন করিতেছে। সুতরাং

ইহা পরমার্থে কি না। সার্ব্বভৌমিক মঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত।

ইতিপূর্ব্বেই বলিলাম মহান আদর্শে ক্ষুদ্র আত্মশক্তি প্রসারণের চেষ্টাই হিন্দুর ধর্ম্মসাধন ও দেবসেবা। ক্ষুদ্র মনুষ্য অনন্ত কাল তাহাই করিবে। যে কার্য্য অনন্ত কালের জন্য হিন্দুর গার্হস্থ্যে তাহারই প্রতিষ্ঠা এবং পঞ্চযজ্ঞে তাহারই পূর্ণ বিকাশ। ফলত এই একটি কার্য্যে ঐহিক ও পারত্রিক উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হইতেছে। ইহা এক দিকে যেমন আত্মশক্তি প্রসারণ বা ধর্ম্মসাধনের উপযোগী তেমনি আর এক দিকে সামাজিক উৎকর্ষ সাধনের উপযোগী। দেবসেবায় আধ্যাত্মিক শক্তি, ঋষিসেবায় দিব্য জ্ঞান, পিতৃসেবায় লোকান্তরে বিশ্বাস, মনুষ্যসেবায় সাম্য, এবং ভূতসেবায় বিশ্বজনীন দয়া ও স্নেহ। ইহার একটীকে ছাড়িলে মনুষ্যের ধর্ম্মসাধন অসম্ভব হইয়া উঠে। পঞ্চযজ্ঞের এই হইল পারত্রিক উপযোগিতা। আবার ইহার ঐহিক উপযোগিতা কতদূর তাহাও দেখ।

জনসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি করা দেহ ধারণের অপর একটি উচ্চ লক্ষ্য। কিন্তু এই বিষয়ে মুখ্যত এই কএকটি গুণ থাকা চাই। আধ্যাত্মিক বল, জ্ঞান, প্রাচীন সমাজব্যবস্থার প্রতি সম্মান, সাম্য ও দয়া। পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা তাহাও সিদ্ধ হইতেছে। কর্ত্তব্য সাধনের প্রতি উপেক্ষা থাকিলে সংসারের স্থিতি নষ্ট হয়। ইহার জন্য আধ্যাত্মিক বল চাই। আবার সর্ব্বাপেক্ষা দেবসেবাই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যসাধন। ইহার প্রভাবে অন্যান্য গুলি সহজ ও সুগম হয়। সুতরাং দেবসেবা হইতেই মনুষ্যের কর্ত্তব্যসাধনে আধ্যাত্মিক বল। জ্ঞান ব্যতীত হিতাহিত উৎকর্ষাপকর্ষ কিছুই বোধ হয় না, ঋষিসেবায় সেই জ্ঞান। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষের চিন্তা, বুদ্ধি, জীবন পরম্পরায় প্রবাহিত হইয়া জনসমাজের ধর্ম্ম নীতি ও আচারাদি নির্দ্ধারণে স্পষ্ট কথায় সমাজগঠনে তোমার সহকারিতা করিতেছে। তোমার তরুণ জ্ঞানের ঔদ্ধত্য ইহার নিকট নতমস্তকে থাকুক নতুবা সমস্তই বিপর্য্যস্ত হয় এই জন্য পিতৃসেবা অর্থাৎ প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় সম্মান। কোন ব্যবধান না মানিয়া জনসমাজের শান্তিভঙ্গ নিবারণের জন্য জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে অভ্যাগতের সম্মান নৃযজ্ঞ অর্থাৎ সাম্যরক্ষা। যাহার অভাবে মনুষ্য নিষ্ঠুর রাক্ষস, যদ্ব্যতীত সামাজিক বন্ধনের মর্ম্মসন্ধি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় কৃমি কীটাদি ভূতসেবায় সেই বিশ্বজনীন দয়া। ফলত ইহার একটিকে ছাড়িলে ঐহিক উৎকর্ষ-সিদ্ধি বা সমাজস্থিতি অসম্ভব হইয়া উঠে। প্রাচীন হিন্দুর এই পঞ্চযজ্ঞ। গার্হস্থ্যের একটী নিয়মে ইহকাল ও পরকাল অনুস্যূত রহিয়াছে। এই জন্যই বলিয়াছি হিন্দুর গার্হস্থ্য পরমার্থে কি না। সার্ব্বভৌমিক বিশুদ্ধ ধর্ম্মনিয়মে প্রতিষ্ঠিত।

এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান হিন্দুর নিত্য কার্য্য ছিল। জীবনের এই মহৎ উদ্দেশ্যে সহায়তা করিবার নিমিত্তই তাহার দার গ্রহণ। এই জন্য হিন্দুস্ত্রীর অপর নাম সহধর্ম্মিণী হইয়াছে। স্ত্রীলোকের হৃদয়ের শিক্ষাই শিক্ষা। এখনকার ন্যায় পূর্ব্বকালে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ যে কোন প্রণালী ছিল তাহা বোধ হয় না। কিন্তু স্বামীর এই দৈনিক ধর্ম্মকার্য্যে তাহারা যার পর নাই হৃদয়ের শিক্ষা লাভ করিত। যে দোষ গৃহের শ্রী নষ্ট করে প্রাচীন গার্হস্থ্যের পরার্থপরতা স্ত্রীলোকের সেই আত্মম্ভরিতা নির্ম্মূল করিয়া দিত। গৃহের বৃদ্ধ আতুর স্ত্রী বালক এবং অতিথি ও পশুপক্ষ্যাদি তৃপ্ত হইলে পরে দম্পতীর জলস্পর্শ করিবার ব্যবস্থা। এই জন্য মহর্ষি মনু দম্পতীকে শেষভুক্ বলিয়া

নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলতঃ এইরূপ ধর্ম্ম-বোধে অকাতরে স্বহস্তে আতিথ্য সৎকার, স্বহস্তে বৃদ্ধ মাতাপিতার পরিচর্য্যা, স্বহস্তে বাক্‌শক্তিহীন পশুপক্ষ্যাদির সেবা। পূর্ব্বকালে এই সমস্ত কার্য্য স্ত্রীলোকদের হৃদয়ের শিক্ষায় কত দূর না অনুকূল ছিল। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় গার্হস্থ্যে বিদ্যাবতী অপেক্ষা হৃদয়বতীই পূজ্য। কারণ উদার স্ত্রীহৃদয়ে সংসার-দাব দগ্ধ পুরুষের সকল ক্লেশেরই শান্তি হয়। ফলতঃ প্রাচীন গার্হস্থ্যে স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইত।

কৃতবিদ্য বান্ধবগণ, ইহাই হিন্দুর পরম মন্ত্র। এই এক অনুষ্ঠানে বিশ্ব সংসারের সকল প্রকার উন্নতির বীজ নিহিত। কি ধর্ম্ম কি জনসমাজ কি ব্যক্তিগত কি জাতিগত সকল সাধই ইহার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। হিন্দুর বিরাট জাতির এই বিরাট অনুষ্ঠান. তোমরা আজও যে বিদ্যা বুদ্ধি সাধনার সভ্যতা যে কোন বিষয়ের পূর্ব্বগৌরব কীর্ত্তন কর সকলের বীজ এই এক অনুষ্ঠানে পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছিল। ইহা কি উচ্চ কি গভীর কি ব্যাপক। ভাগ্যক্রমে তোমরা সেই জাতিতে জন্মিয়াছ এবং ভাগ্যক্রমে তোমরা এই সমস্ত পূর্ব্বস্মৃতির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়াছ। কিন্তু ভাবিতে হৃৎকম্প হয় তোমাদের সংস্কার-কুঠার অতি সাংঘাতিক ও যার পর নাই নির্ম্মম। আমি যে উজ্জ্বল গার্হস্থ্যের আদর্শ দেখাইলাম আজিও তাহার ভগ্নাবশেষ ভারতে রহিয়াছে। যদি জীবনে ধর্ম্মসঞ্চয় প্রার্থনীয় হয়, যদি গৃহ ও জনসমাজের শ্রী আবশ্যক হয় ইহা কদাচ নির্ম্মূল করিও না। যদি সামর্থ্য থাকে বরং ইহার সংস্কার সম্পাদন কর কিন্তু একেবারে কদাচ নির্ম্মূল করিও না। বর্ত্তমান শতাব্দীর জ্ঞান কুণ্ঠিত হয় এই প্রাচীন পঞ্চযজ্ঞে এমন কি শেখবার কিছুই নাই। ফলতঃ ইহার প্রায় বড় জ্যোতিষ্মান। তোমরা তদ্দ্বারা স্ব স্ব গৃহ অনুপ্রাণিত কর। আমি নিজে অকিঞ্চন, আমার যা কিছু সমস্তই বিশ্বের জন্য হৃদয়ে এইরূপ ভাবনা সঞ্চয় না করিলে দুর্গম ধর্ম্ম-পথে দাঁড়ানো বড় কঠিন। হিন্দুর এই প্রাচীন গার্হস্থ্যে তাহারই উচ্চ শিক্ষা। ধর্ম্মের সংকীর্ণতা উদার মত অধিকার করিয়া এক দিনের সাময়িক উপাসনায় ধর্ম্ম-সাধন হয় না। এই জন্য দিন দিন ধর্ম্মে আপনার জীবন উন্নত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য. ঈশ্বর সকলের জ্ঞানদাতা অন্নদাতা. তাঁহার নিকট জাতি বর্ণের কোন ব্যবধান নাই। এই সম্বন্ধে আপনার আপনার গৃহকে তাঁহারই লীলাক্ষেত্র কর। কারণ এইটি ধর্ম্মসাধনের সহজ ও সুন্দর উপায়। তোমরা জাতিতে হিন্দু, ধর্ম্মে হিন্দু। অতএব পুনরায় বৈদিক ব্রহ্মোপাসনা, বেদান্তের জ্ঞানযোগ এবং গার্হস্থ্যের এই কর্ম্মযোগ আপনাদের সহজ কর। ইহাতে তোমার মঙ্গল, আমার মঙ্গল, সমস্ত দেশের মঙ্গল।

আজ ১১ মাঘের মহা মহোৎসব। আজ এই সুদূর বিদেশের জনতা দেখিয়া হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। কোন্ কথায় সম্বর্দ্ধনা করিব উদ্বেল হৃদয়ে কিছুই আসিতেছে না। দুঃস্বপ্নান্তে আবার ভ্রাতায় ভ্রাতায় পিতার ক্রোড়ে আসিয়া মিলিলাম। আমরা অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল যে গৃহে এই মহা মহোৎসবের আয়োজন করিতাম আজ তাহার ইষ্টক জীর্ণ। কিন্তু বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না আজি সেই জীর্ণ গৃহের স্মরণই আমাদের অন্তর্বল বৃদ্ধি করিতেছে। এই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাকালে চতুর্দ্দিক হইতে কতই উপদ্রব [illegible] আরম্ভ হইয়াছিল। তখন কে ভাবিতে পারিয়াছিলেন কালে ইহার ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে। কিন্তু সেই সমাজগৃহের এক এক-

অতএব, অদ্য আমাদের মন হইতে সমস্ত দুশ্চিন্তা—সমস্ত বিষয়-চিন্তা—সমস্ত পাপ তাপ মোহ—দূর হইয়া যাক, এবং পরমাত্মাকে লইয়া আত্মা জাগ্রত হইয়া উঠুক্। অদ্য সমস্ত আকাশ ভেদ করিয়া—সসাগরা পৃথিবী কম্পিত করিয়া—আত্মা হইতে ওঙ্কার ধ্বনি উত্থিত হউক, সমস্ত আকাশমণ্ডল সেই ধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া যাউক—সেই ধ্বনি জ্যোতিষ্কমণ্ডল সূর্য্য হইতে ...-ছটারূপে নিঃসারিত হউক—মেদিনী হইতে ধনধান্য ফল পুষ্পরূপে উত্থিত হউক, বেদী হইতে বেদধ্বনিরূপে উদ্ঘোষিত হউক্—সঙ্গীত-মঞ্চ হইতে সঙ্গীত রবে উত্থিত হইয়া প্রশান্ত নিস্তব্ধ দশদিক্ মাধুর্য্যে দ্রবীভূত করিয়া দিক। অদ্য আমাদের শরীরের আত্মা আত্মার আত্মার সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত হইতেছে—এই সম্বন্ধ-সূত্র জ্যোতির্ময় অমৃত জীবনের একমাত্র নিদান। নাড়ীর সম্বন্ধ-সূত্র দিয়া যেমন গর্ভস্থ শিশুতে মাতার প্রাণ সঞ্চারিত হয়, তাহা অপেক্ষা শতগুণ আশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ-সূত্র দিয়া আমাদের আত্মাতে পরমাত্মার অমৃত জীবন সঞ্চারিত হইতেছে; আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার অক্ষয় জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে পরিপূরিত হইতেছে—আমাদের হৃদয়ের পিপাসা সুগভীর প্রেম-সমুদ্র হইতে পরিপূরিত হইতেছে; আমাদের দীন-হীন অকিঞ্চনতা অপর্য্যাপ্ত শক্তি-ভাণ্ডার হইতে পরিপূরিত হইতেছে। পরম প্রেমাস্পদ পরমাত্মার সহিত আমাদের এরূপ অচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠ এবং নিগূঢ় সম্বন্ধ যে, তাহা আমাদের রক্তে রক্তে, নিশ্বাসে নিশ্বাসে চিন্তায় চিন্তায় প্রাণে প্রাণে মিশাইয়া রহিয়াছে—তাহাকে ছাড়াইয়া লওয়া মৃত্যুরও অসাধ্য। পরমাত্মার পরম পরাৎপর জ্ঞান-প্রেমের সীমা কোথায়? যাঁহার একবিন্দু প্রসাদ-বারিতে পৃথিবীর ক্ষুদ্র কীট দেব-লোকের অধিকারী হইয়া উঠে—তাঁহার করুণার সীমা কোথায়? আমাদের এই ক্ষুদ্র জ্ঞান-প্রেমের অভ্যন্তরেই কি যে এক পরমাশ্চর্য্য অমৃতের দ্বার প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেইখান হইতে অদ্য পরব্রহ্মের অমোঘ প্রভাব আমাদের আত্মাতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আমাদের মুখশ্রী উজ্জ্বল করিতেছে; সেই অমৃত দ্বারে আমাদের অন্তঃকরণের প্রার্থনা পুঞ্জীভূত হইয়া পরম করুণাময়ের অমোঘ প্রসাদ বারিতে প্লাবিত হইতেছে। আইস আমরা সেই দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া উৎসবের প্রাণকে—পরম প্রেমাস্পদ পরমাত্মাকে—প্রাণের সহিত আহ্বান করি—অদ্যকার এই উৎসবের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করি।

আমাদের যিনি আরাধ্য দেবতা, তিনি জাগ্রত জীবন্ত দেবতা। তিনি অচেতনের অভ্যন্তরেও জাগ্রত—সচেতনের অভ্যন্তরেও জাগ্রত, কোথাও তিনি নিদ্রিত নহেন। এই যে প্রভাতসূর্য্যকিরণ, ইহার অভ্যন্তরে তিনি জাগিতেছেন, এই যে বায়ু বহিতেছে ইহার অভ্যন্তরে তিনি জাগিতেছেন, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের অভ্যন্তরে তিনি জাগিতেছেন, প্রাণের অভ্যন্তরে তিনি জাগিতেছেন,—কোথায় না তিনি জাগ্রত—কখন না তিনি জাগ্রত। আদিম সূর্য্য যখন নূতন জাগ্রত হইতেছে, তখন তাহার অভ্যন্তরে তিনি জাগ্রত,—ক্ষুদ্র একটি তড়াগের কমল-কলিকা যখন উন্মেষিত হইতেছে তখন তাহার অভ্যন্তরেও তিনি জাগ্রত, জ্ঞানোজ্জ্বল আত্মার অভ্যন্তরেও তিনি জাগ্রত, প্রেমরসার্দ্র হৃদয়ের অভ্যন্তরেও তিনি জাগ্রত,—সর্ব্বত্রই তিনি জাগ্রত জীবন্ত। এই পবিত্র সাধুসমাগমের মধ্যে এই খানেই এই মুহূর্ত্তেই তিনি জাগ্রত বিরাজমান—এই খানেই তাঁহার মহিমা ভূলোক হইতে অন্তরীক্ষে অন্তরীক্ষ হইতে দ্যুলোকে উদ্ভাসিত

হইতেছে; আমাদের সম্ভজনীয়—ভূর্ভুবঃ স্বঃ তিন লোকের সম্ভজনীয়—এখানে জাগ্রত, বিরাজমান; অতএব শ্রদ্ধা-ভক্তিতে বিনম্র হইয়া—প্রেমে পুলকিত হইয়া হৃদয়ের কপাট উদ্‌ঘাটন করিয়া আইস আমরা তাঁহার সাম্বৎসরিক মহিমা-গানে প্রবৃত্ত হই, ও তাঁহার চরণে প্রীতি-কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিয়া জীবন সার্থক করি।

হেমখেম চৌতাল।

সবে মিলি গাওরে, মিলি মঙ্গলাচারো,
ডাকি লহ হৃদয়ে প্রিয়তমে।
মঙ্গল গাও আনন্দ মনে,
মঙ্গল প্রচারো বিশ্ব মাঝে।

আসাবরি — কাওয়ালি।

অনেক দিয়েছ নাথ, আমার বাসনা তবু পুরিল না।
দীন দশা ঘুচিল না অশ্রুবারি মুছিল না,
গভীর প্রাণের তৃষা মিটিল না মিটিল না।
দিয়েছ জীবন মন প্রাণপ্রিয় পরিজন
সুধাস্নিগ্ধ সমীরণ, নীলকান্ত অম্বর
শ্যামশোভা ধরণী।
এত যদি দিলে সখা আরো দিতে হবে হে,
তোমারে না পেলে আমি ফিরিব না ফিরিব না।

অনন্তর আচার্য্য নিম্নের প্রার্থনা পাঠ করিলেন।

হে পরমাত্মন্—সিদ্ধিদাতা বিধাতা! অদ্য তোমার সাম্বৎসরিক পূজার মানসে আমরা এখানে সমাগত হইয়াছি, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদের পূজা গ্রহণ কর। তুমি তোমার পরিশুদ্ধ জ্ঞান-নেত্রে সকলেরই মনোগত অভিপ্রায় পরিষ্কার দেখিতেছ—আমাদের যাহার যাহাতে আত্মার পরিতৃপ্তি হয় সেইরূপ শান্তি-পীযূষ বর্ষণ কর,—এখান হইতে আমরা কেহ যেন শূন্য পাত্রে ফিরিয়া না যাই। যাঁহারা তোমার চরণের ভক্ত—তোমার প্রেমে প্রেমী, তাঁহারা জনশূন্য অরণ্যের মধ্যে থাকিলেও শূন্য হৃদয়ের বিষাদ জানিতে পান না। তোমার প্রেমই তাঁহাদের জীবন—তোমার প্রেমই তাঁহাদের জ্ঞান, তোমার প্রেমই তাঁহাদের ধ্যান, নিরানন্দময় অশান্ত সংসারের অভ্যন্তরে তাঁহারা কি গভীর আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করেন! পৃথিবীর কর্ম্মশালায় তাঁহারা কর্ম্ম করেন—পৃথিবীর পান্থ-শালায় তাঁহারা ভোজন করেন—পৃথিবীর রঙ্গ-শালায় তাঁহারা নাট্য দর্শন করেন, কিন্তু তাঁহাদের অন্তঃকরণের নিভৃত নিলয়ে তোমার সহবাসের বিমল আনন্দ নিরন্তর জাগিতেছে—কিছুতেই তাহার ক্ষয় নাই পরিসমাপ্তি নাই; তাহা বিনা-ইন্ধনে প্রজ্বলিত, তাহা নিভিতে জানে না; তাহা বিনা-নিশ্বাসে সম্প্রাণিত, তাহা মৃত্যুকে জানে না; সেই তোমার অমোঘ প্রেমামৃত রসের বিন্দু-মাত্রের অভিলাষী হইয়া আমরা অদ্যকার এই উৎসবক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়াছি—তোমার অসীম করুণাই আমাদের একমাত্র ভরসা! আমাদের এই মহোৎসব তোমারই পূজার মহোৎসব,—তুমিই ইহার প্রবর্ত্তক—তুমিই ইহার অধ্যক্ষ—তুমিই ইহার অধিদেবতা! আমাদের এই দীন হীন দেশে—দীনহীন হৃদয়ে—অদ্য তুমি সহস্র হস্তে কল্যাণ বর্ষণ করিবে তাই আমাদিগকে এখানে একত্রিত করিয়াছ; আমরা আজ হৃদয় ভরিয়া তোমার অমৃত-রস পান করিব, হৃদয়-থাল-ভার প্রীতি-পুষ্পহার তোমার চরণে সমর্পণ করিয়া আজ আমরা আমাদের জীবনকে সার্থক করিব, আমাদের আজ কত না আনন্দ! হে জীবনের জীবন প্রাণের প্রাণ; তুমি তোমার প্রেমামৃত-কণা বিতরণ করিয়া আমাদের এই উৎসবকে জাগ্রত করিয়া তোলো—এবং এই আনন্দের স্রোত যাহাতে বৎসর বৎসর প্রবাহিত থাকে সেইরূপ উৎস আমাদের অন্তরে উন্মুক্ত করিয়া দেও। অদ্যকার মত চিরদিনই তুমি আমাদের হৃদয়ে প্রীতি ভক্তির কণিকা

উদ্বোধিত করিয়া আমাদের পূজা গ্রহণ করিতে থাক, আর আমরা তোমার প্রসাদের বলী হইয়া—তোমার মৃতসঞ্জীবনী করুণামৃত প্রেমামৃত ও আনন্দামৃতে প্রাণ পাইয়া উঠিয়া দিগ্‌দিগন্তরে তোমার মহিমা ঘোষণা করিতে থাকি—এই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

গৌড়সারং—চৌতাল।

পেয়েছি সন্ধান তব অন্তর্যামী.
অন্তরে দেখেছি তোমারে।
চকিতে চপল আলোকে হৃদয় শতদল মাঝে
হেরিনু এ কি অপরূপ রূপ।
কোথা ফিরিতেছিলাম পথে পথে দ্বারে দ্বারে,
মাতিয়া কলরবে।
সহসা কোলাহলমাঝে শুনেছি তব আহ্বান,
নিভৃত হৃদয় মাঝে
মধুর গভীর শান্তবাণী।

যোগিয়া বিভাস—একতালা।

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে
হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।
বাসনার বশে মন অবিরত
ধায় দশদিশে পাগলের মত,
স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত
জাগিছ শয়নে স্বপনে।
সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ,
তুমি আছ তার আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ,
সেও আছে তব ভবনে।
তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাই আর
সমুখে অনন্ত জীবন বিস্তার,
কাল পারাবার করিতেছ পার
কেহ নাহি জানে কেমনে।
জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি,
তুমি প্রাণময় তাই আমি বাঁচি,
যত পাই তোমায় আরো তত যাচি,
যত জানি তত জানিনে।
জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর,
লোক লোকান্তরে যুগ যুগান্তর,
তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই,
কোন বাধা নাই ভুবনে।

সারঙ্গ—ঝাঁপতাল।

অসীম রহস্য মাঝে কে তুমি মহিমাময়।
জগত শিশুর মত চরণে ঘুমায়ে রয়।
অভিমান অহঙ্কার মুছে গেছে নাহি আর
ঘুচে গেছে শোকতাপ, নাহি দুঃখ নাহি ভয়।
কোটি রবি শশি তারা, তোমাতে হয়েছে হারা,
অযুত কিরণ ধারা তোমাতে পাইছে লয়।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

তোমারে জানিনে হে তবু মন তোমাতে ধায়।
তোমারে না জেনে বিশ্ব তবু তোমাতে বিরাম পায়।
অসীম সৌন্দর্য্য তব কে করেছে অনুভব হে,
সে মাধুরী চির নব,
আমি না জেনে প্রাণ সঁপেছি তোমায়।
তুমি জ্যোতির জ্যোতি আমি অন্ধ আঁধারে,
তুমি মুক্ত মহীয়ান আমি মগ্ন পাথারে,
তুমি অন্তহীন আমি ক্ষুদ্র-দীন,
কি অপূর্ব্ব মিলন তোমায় আমায়।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

বাণী তব নাহি শুনি নাথ হে।
অন্ধ জনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে,
বিরহে তব কাটে দিন রাত হে।
স্বপন সম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা,
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চির মরম বেদনা,
আপনাপানে চাহি শুধু নয়ন জল পাত হে।
পরশে তব জীবন নব সহসা যদি জাগিল,
কেন জীবন বিফল কর মরণ শরঘাত হে।
অহঙ্কার চূর্ণ কর প্রেমে মন পূর্ণ কর
হৃদয় মন হরণ করি রাখ তব সাথ হে।

দেওগিরি—সুরফাঁকতাল।

দেবাধিদেব মহাদেব।
অসীম সম্পদ অসীম মহিমা।
মহাসভা তব অনন্ত আকাশে
কোটি কণ্ঠ গাহে জয় জয় জয় হে।

ভৈরবী—একতালা।

ভয় হয় পাছে তব নামে আমি
আমারে করি প্রচার হে।
মোহবশে পাছে ঘিরে আমায়, তব
নামগান অহঙ্কার হে।

তোমার কাছে কিছু নাহিত লুকানো,
অন্তরের কথা তুমি সব জানো,
আমি কত দীন, আমি কত হীন,
কেহ নাহি জানে আর হে।
ক্ষুদ্র কণ্ঠে যবে উঠে তব নাম,
বিশ্ব শুনে তোমায় বন্দে গো প্রণাম,
তাই আমার কাছে জাগে অভিমান,
গ্রাসে আমায় আঁধার হে।
পাছে প্রতারণা করি আপনারে,
তোমার আসনে বসাই আমারে,
রাখ মোহ হতে রাখ তম হতে
রাখ রাখ বার বার হে।

মিশ্র বিভাস—আড়াঠেকা।

এবার বুঝেছি সখা এ খেলা কেবলি খেলা।
মানব জীবন লয়ে এ কেবলি অবহেলা।
তোমারে নহিলে আর ঘুচিবে না হাহাকার
কি দিয়ে ভুলায়ে রাখ কি দিয়ে কাটাও বেলা।
বৃথা হাসে রবি শশি বৃথা আসে দিবানিশি,
সহসা পরাণ কাঁদে শূন্য হেরি দিশিদিশি!
তোমারে খুঁজিতে এসে কি লয়ে রয়েছি শেষে,
ফিরিগো কিসের লাগি এ অসীম মহামেলা!

আলাইয়া—একতালা।

বসে আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী।
কবে বাহির হইব জগতে মম জীবন ধন্য মানি।
কবে প্রাণ জাগিবে তব প্রেম গাহিবে,
দ্বারে দ্বারে ফিরি সবার হৃদয় চাহিবে,
নর নারী মন করিয়া হরণ চরণে দিবে আনি।
কেহ শুনে না গান জাগে না প্রাণ
বিফলে গীত অবসান,
তোমার বচন করিব রচন সাধ্য নাহি নাহি।
তুমি না কহিলে কেমনে কব, প্রবল অজেয় বাণী তব,
তুমি যা বলিবে তাই বলিব, আমি কিছুই না জানি,
তব নামে আমি সবারে ডাকিব হৃদয়ে লইব টানি।

রাত্রিকালের ব্রহ্মোপাসনা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে হইয়াছিল। বৈদ্যুতিক আলোক ও গ্যাসালোক এবং পত্র পুষ্পে নানারূপ [illegible] সুদৃশ্য হইয়াছিল। লোকসমাগম যথেষ্ট হয়। পরে আচার্য্যেরা যথাসময়ে বেদিগ্রহণ করিলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নের এই উপদেশটী পাঠ করিলেন—

অদ্য আমরা সেই সত্যপুরুষের কল্যাণময় ধর্ম্মের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া এই উপাসনামণ্ডপে সমবেত হইয়াছি। সত্যের সুন্দর পবিত্র মূর্ত্তি চিরকালই মনুষ্য-সমাজকে এইরূপে একত্রে আনয়ন করিতেছে, পরস্পরের প্রতি প্রেম ও সদ্ভাব শিক্ষা দিতেছে এবং জ্ঞানানুশীলনে ও আত্মার উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত করিতেছে। ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম-সলিলের প্রস্রবণ-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া মনুষ্য-কুলের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতেছেন। ধন্য সেই বিধাতা। ধন্য সেই করুণাময়, কল্যাণময় পুরুষ। তাঁহারি প্রসাদে আমরা বিষয়-কোলাহল হইতে মুক্ত হইয়া এই উপাসনামণ্ডপে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতেছি এবং তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতাভরে প্রণিপাত করিতেছি। সেই মহান্ সত্য পুরুষের মঙ্গল জ্যোতি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ রহিয়াছে, সেই করুণাময়ের করুণা সকলের হৃদয়ে আবির্ভূত হইতেছে। চারিদিকে কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মেরই মহত্ত্ব, ব্রাহ্মধর্ম্মেরই জয়। সেই অনাদি অনন্ত জাগ্রত দেবতা আজ সমস্ত দিনই আমাদের সম্মুখে। নয়ন উন্মীলন করিলে সেই আনন্দময় অমৃতময় পুরুষকে এই শোভাময় নিকেতনের প্রত্যেক পদার্থে দেখিতে পাই; এই শুভ্র দীপপুঞ্জের আলোক-কিরণে তাঁহার অমল জ্যোতি এবং সাধু সজ্জনগণের মুখছবিতে তাঁহার পবিত্র মঙ্গল-ভাব সন্দর্শন করি। আবার যখন নেত্র নিমীলন করিয়া অন্তরে দেখি, তখন দেখি যে, সেই প্রাণপতি আমাদের হৃদয়-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রেমালোকে সমস্ত মন-রাজ্যকে সমুজ্জ্বলিত করিতেছেন। বাহিরে তাঁহারি জ্যোতি, অন্তরে তাঁহার জ্যোতি। বাহিরে তাঁহার

আনন্দ, অন্তরে তাঁহার আনন্দ। তিনি বাহিরে সমস্ত পদার্থকে শুভ্রকিরণে সুশোভিত করিয়া অন্তরে আত্মাকে প্রেমভাবে, পবিত্রভাবে রঞ্জিত করিতেছেন। ঈশ্বরের প্রকাশ সর্ব্বত্র কিন্তু বেক্ষজ্ঞ লোক তাঁহাকে কোথায় জাগ্রৎ জীবন্তরূপে দেখিতে পান? আকাশে এই যে তিনি ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন সেখানে তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়াই আত্মার ব্রহ্মদর্শন কি চরিতার্থ হয়? বাহিরে তাঁহাকে দেখা সম্পূর্ণ নিকট করিয়া দেখা নয়। সমুদয় জগতে তাঁহার প্রতিরূপ, কিন্তু আত্মাতে তাঁহার রূপ দেখা যায়। সেই হিরন্ময়ে পরে কোষে আত্মাতে তিনি সাক্ষাৎ বিরাজমান। আত্মার অন্তরে সেই ব্রহ্মধাম। সেখানে তাঁহার নির্ম্মল নিরবয়ব সুন্দর মূর্ত্তি প্রকাশ পাইতেছে। অমৃতপানেচ্ছু সাধকের ঊর্দ্ধে আকাশে কোন সপ্তম স্বর্গের অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। অন্তরে আত্মাতে দৃষ্টি করিলে সেই অন্তরাত্মাকে দেখা যায় এবং সেখানে প্রবেশ করিলে অমৃত পানে আত্মার অনন্ত জীবন ও অমল শান্তি উপার্জ্জিত হয়। সেখানে তিনি আপন মহিমাতেই বিরাজিত। তিনি লোকভঙ্গ নিবারণার্থ সেতুস্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিতেছেন। এই আত্মারূপ সেতুর এ পারে দিন রাত্রি নিয়মিত হইতেছে, ও-পারে দিনও নাই রাত্রিও নাই; সুকৃতও নাই দুষ্কৃতও নাই; এখান হইতে পাপ-সকল প্রতিনিবৃত্ত হয়; ইহা পুণ্য-জ্যোতিতে সর্ব্বদাই পবিত্র রহিয়াছে। পাপতাপ-রহিত এই ব্রহ্মলোক। এই সেতুর পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া যে অন্ধ সে অনন্ধ হয়; যে সংসারের দুঃখ ক্লেশে বিদ্ধ সে অবিদ্ধ হয়; যে পাপে ও দোষে উপতাপী সে অনুপতাপী হয়। এই সেতুকে উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রিও দিনের সমান আলোক ধারণ করে; এই ব্রহ্মলোক; ইহা সর্ব্বদাই প্রকাশিত রহিয়াছে।

নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ। ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং। সর্ব্বে পাপ্মানোহতো নিবর্ত্তন্তে। অপহতপাপ্মাহ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ। তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বা অন্ধঃসন্ননন্ধো ভবতি। বিদ্ধঃসন্নবিদ্ধো ভবতি। উপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি। তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাপি নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে। সকৃদ্বিভাতোহ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ।

সংসারের আপাত মনরঞ্জন বিষয়-সকল এক দিকে আমাদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে, আর এক দিকে আমাদের প্রিয়তম পরমেশ্বর। এক দিকে দুর্গতি আর এক দিকে অনন্তের ক্রোড়ে অনন্ত উন্নতি। আমরা এই দুইয়ের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। আমাদের মধ্যে যে কেহ সংসারের দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ চাহেন তাঁহাকে শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া ভক্তি-যোগে পরমাত্মার সহিত যুক্ত থাকিতে হইবে। যিনি এইরূপে পরব্রহ্মের পবিত্র সহবাস লাভ করিতে পারেন তাঁহারি জীবনে পরম মঙ্গল সাধিত হয়। তাঁহার প্রেমের সুগন্ধ তখন চতুর্দ্দিক আমোদিত করে এবং তাঁহার জ্ঞান-নেত্র প্রস্ফুটিত হইয়া অতিশয় উজ্জ্বল দীপ্তি ধারণ করে। তখন তিনি ব্রহ্মপ্রেমে তদ্গত হইয়া যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করেন সেই দিকেই সেই পরম মঙ্গল নিলয় পরমেশ্বরের আবির্ভাব সন্দর্শন করেন। সর্ব্বত্র তাঁহার আনন্দ ও সর্ব্বত্র তাঁহার মহিমা দেখিতে পাইয়া তাঁহারই ইচ্ছানুসারে জীবনের তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন এবং সংসারে ফলকামনা পরিশূন্য হইয়া তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতে থাকেন— স্বার্থপরতা আর তাঁহাকে কলঙ্কিত করিতে পারে না। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনই তাঁহার একমাত্র ব্রত হয়। অতএব তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, পাপ হইতে

উত্তীর্ণ হয়েন এবং সংসারের মোহ-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া চিরন্তন পরব্রহ্মে নিত্য কালের জন্য আপনাকে প্রতিষ্ঠিত দেখেন এবং এই বিশ্বরাজ্যে সুখে আনন্দে বিচরণ করিতে থাকেন। পাপ ইহাঁকে স্পর্শ করিতে পারে না, ইনি সমুদায় পাপকে অতিক্রম করেন, পাপ ইহাঁকে সন্তাপ দিতে পারে না, ইনি সমুদায় পাপের সন্তাপক হয়েন। ইনি নিষ্পাপ নির্ম্মলচিত্ত ও পরব্রহ্মের সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া পরব্রহ্মোপাসক হয়েন।

"নৈনং পাপ্মা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি। নৈনং পাপ্মা তপতি সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি। বিপাপো বিরজোঽবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

অনন্তর শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি নিম্নের এই উপদেশ পাঠ করেন।

অদ্য ১১ই মাঘের ব্রহ্মোৎসব। অদ্য সমস্ত ভারত ভূমির উৎসব—সমস্ত বঙ্গভূমির উৎসব—প্রতি পরিবারের উৎসব, প্রতি হৃদয়ের উৎসব। যিনি রাজগণ-রাজা মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবনপালক—যিনি সকলের দারিদ্র্য-ভঞ্জন—যিনি আনন্দরূপমমৃতং, যাঁর আনন্দ হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, যিনি শিবং সুন্দরং, যাঁর অতুল সৌন্দর্য্যের ছায়া এই সৃষ্টির উপর পতিত হইয়াছে, তিনিই আমাদের উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি কৃপা করিয়া আজ আমাদের জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার আনন্দ কিরণ অন্তর বাহিরে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ দেখিতেছি। সেই পবিত্র কিরণ স্পর্শেই আজ আমাদের হৃদয়-কমল পবিত্র ও প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সেই কুসুমে অদ্য তাঁহার পূজা করিব বলিয়া, উৎসাহের সহিত, প্রেমের সহিত, ভক্তির সহিত আমরা উৎসব-ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়াছি। তিনি এখন শিবং সুন্দরং রূপে আমাদিগকে অন্তরে বাহিরে দেখা দিতেছেন, এবং আমাদের পূজা গ্রহণ করিবেন বলিয়া আমাদিগকে স্নেহের সহিত আহ্বান করিতেছেন। কি মনোহর দৃশ্য! কি পবিত্র মুহূর্ত্ত! এখন অন্তর বাহিরে তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমাদের হৃদিস্থিত প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহার দিকেই গমন করিতেছে।

যিনি আপনার অপার সৌন্দর্য্য-সাগরে আপনিই প্রেমে নিত্য বিভোর হইয়া আছেন. তিনি মনুষ্যকে কৃপা করিয়া, তাঁর এই শোভার ভাণ্ডার সংসারে স্থাপন করিলেন, এবং তাহার হৃদয়ে প্রেম দিলেন। যদি প্রেম না দিতেন, তবে কে এ শোভা অনুভব করিয়া সুখী হইত? আত্মার স্বাভাবিক্ গতিই শোভা ও সৌন্দর্য্যের দিকে। কেবল মাত্র বাহিরের শোভা দেখিয়া ইহা সন্তুষ্ট হইতে পারে না। ইহা আরও কিছু চায়, আরও কিছু অনুসন্ধান করে। সকল শোভা ভেদ করিয়া সে সেই শোভার আকর স্থানে যাইতে স্পৃহান্বিত হয়। সেই অকৃত অমৃতের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ ব্যতীত কিছুতেই তাহার প্রেম চরিতার্থ হয় না। তিনিই তাহার পরম গতি—তিনিই তাহার পরম লোক। সেই লোকে বাস করিতেই তাহার বিশেষ আনন্দ। মধুকর যেমন পুষ্পে বসিয়া অনন্য মনে তাহার মধুপান করে, আত্মা তেমনি পরমেশ্বরে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার প্রীতি-সুধা পান করিতে ভাল বাসে।

সেই কি সন্ন্যাসী—সেই কি যোগী যিনি গৃহত্যাগী হইয়া কেবল মাত্র ব্যায়াম-তুল্য নিশ্বাস রোধ করিয়া যোগ অভ্যাস করেন?

না—কখনই নহে। তিনিই যোগী—যিনি প্রেমিক, যিনি এই প্রেমের সাহায্যে সেই শোভার আকর পরমেশ্বরে উপনীত হইয়া নিঃসংশয়ে আপনাকে তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত দেখেন এবং নিঃসংশয়ে বলিতে পারেন এষাস্য পরমা গতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ এষোস্য পরমোলোকঃ—এষোস্য পরম আনন্দঃ।

যিনি প্রকৃত প্রেমিক তিনি তাঁহাকে আপনার পিতা মাতা জানিয়া প্রিয়রূপে হৃদয়-মন্দিরে পূজা করেন। অনুগত পুত্রের ন্যায় তাঁহার আদেশ সকল—কঠোর আদেশ সকল পালন করিয়া তাঁহার প্রসাদ অনুভব করেন। এবং বিশেষ অনুরাগের সহিত তাঁহার প্রেম-মুখ নিরীক্ষণ করেন।

আমরা যাহাকে ভালবাসি, তাঁহার জন্য কি না করিতে পারি? সেইরূপ ঈশ্বর-প্রেমী—যিনি তাঁহারি হৃদয়েশ্বরকে প্রেমের চক্ষে দেখেন, তাঁহার প্রেম-মুখ ভাল করিয়া দেখিবার জন্য—আরও ফুটন্তরূপে দেখিবার জন্য কি না করিতে পারেন?

তাঁহার সেই সুন্দর আনন তাঁর নিকট যেমন মধুর, এমন আর কিছুই নহে। সেই প্রসন্ন মুখ—সেই প্রেম-মুখ ধ্যান করিতে তাঁহার বিশেষ আনন্দ। তিনি তখন প্রেমের ভরে ভক্তির আবেশে তাঁহাতে ডুবিয়া যান। সেই সৌন্দর্য্য-সাগরে নিমগ্ন হয়েন। তখন আর তিনি আপনার নহেন, সম্যকরূপে তাঁর। তাঁহার অন্তরে তখন কি প্রেমের গান নিনাদিত হয়, তাহা এ জগতে অপ্রকাশ থাকে, তিনি প্রেমে বিভোর হইয়া কি তাঁহাকে নিবেদন করেন তাহা যিনি বাক্যের বাক্য শ্রোত্রের শোত্র, তিনিই শুনিতে পান। সেই প্রেমদাতাও তখন কি মোহন স্বরে তাঁহার সাধককে আহ্বান করেন—কি অপার স্নেহের সহিত তাঁহার নিকটে প্রকাশিত হন, কি অপ্রতিম সৌন্দর্য্য দ্বারা তাঁহাকে উদাস করিয়া তুলেন, কেহই তাহার সন্ধান পায় না। সে অন্তরের ব্যাপার অন্তরেই থাকে। এবং চির দিনই অন্তরে থাকিবে। কি সুখের সম্মিলন। তাঁহার স্পর্শ-সুখ কি গভীর—কি বচনাতীত।। কোথায় প্রেমময় এ সময়ে। দুঃখী অকিঞ্চন আমরা। আমরা এখন তোমাকেই চাহিতেছি, তোমাকেই যাচিতেছি। দেখা দেও—দেখা দেও—দেখা দেও হে। আমরা তোমার প্রেমের ভিখারী—চিরানুগত—চিরাশ্রিত। তোমার প্রেমের স্পর্শ-মণির আলোকে—সেই স্নিগ্ধালোকে, আমাদিগকে শীতল কর।

এই সংসার মৃত্যুর প্রতিকৃতি। এই সংসারে থাকিয়া, কত দুঃখ কত সন্তাপই ভোগ করি। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার অমৃত নিকেতনের দ্বার খুলিয়া দেও। আমরা তথায় প্রবেশ করিয়া পরম শান্তি লাভ করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইমন কল্যাণ—তেওরা।

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি
ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজো
দুখ জালা সেই পাশরে,
সব দুখ জালা সেই পাশরে।
তোমার জ্ঞানে তোমার ধ্যানে
তব নামে কত মাধুরী
সেই ভকত সেই জানে,
তুমি জানাও যারে সেই জানে
ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে।

কেদারা—সুরফাকতাল।

স্বরূপ তাঁর কে জানে, তিনি অনন্ত মঙ্গল
অযুত জগত মগন সেই মহাসমুদ্রে।

তিনি নিজ অনুপম মহিমা মাঝে বিলীন,
সন্ধান তাঁর কে করে বিফল বেদ বেদান্ত,
পরব্রহ্ম পরিপূর্ণ অতি মহান্,
তিনি আদি কারণ তিনি বর্ণন অতীত।

হাম্বীর—চৌতাল।

আনন্দ রয়েছে জাগি ভুবনে তোমার
তুমি সদা নিকটে আছ বলে।
স্তব্ধ অবাক নীলাম্বরে রবি শশি তারা
গাঁথিছে হে শুভ্র কিরণ মালা।
বিশ্ব পরিবার তোমার ফেরে সুখে আকাশে,
তোমার ক্রোড় প্রসারিত ব্যোমে ব্যোমে।
আমি দীন সন্তান আছি সেই তব আশ্রয়ে,
তব স্নেহ মুখ পানে চাহি চিরদিন।

শঙ্কর—ঝাঁপতাল।

কি ভয় অভয় ধামে, তুমি মহারাজা,
ভয় যায় তব নামে।
নির্ভয়ে অযুত সহস্র লোক ধায় হে
গগনে গগনে সেই অভয় নাম গায় হে।
তব বলে কর বলী যারে কৃপাময়
লোক ভয় বিপদ মৃত্যু ভয় দূর হয় তার,
আশা বিকাশে সব বন্ধন ঘুচে,
নিত্য অমৃতরস পায় হে।

রামপ্রসাদী সুর।

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক দিন থাকে!
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে
আয় বলে ওই ডেকেছে কে!
সেই গভীর স্বরে উদাস করে
আর কে কারে ধরে রাখে!
যেথায় থাকি যে যেখানে,
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
সেই প্রাণের টানে টেনে আনে
সেই প্রাণের বেদন জানে না কে!
মান অপমান গেছে ঘুচে,
নয়নের জল গেছে মুছে,
নবীন আশে হৃদয় ভাসে
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে!
কত দিনের সাধন ফলে
মিলেছি আজ দলে দলে,
আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয় গো মাকে!

গৌড়—চৌতাল।

তুমি জাগিছ কে।
তব আঁখি জ্যোতি ভেদ করে সঘনগহন তিমির রাতি।
চাহিছ হৃদয়ে অনিমেষ নয়ন,
সংশয়চপল প্রাণ কম্পিত ত্রাসে।
কোথা লুকাব তোমা হতে আমি,
এ কলঙ্কিত জীবন তুমি দেখিছ জানিছ,
প্রভু ক্ষমা কর হে!
তব পদ প্রান্তে বসি একান্তে দাও কাঁদিতে আমায়
আর কোথা যাই!

মুলতান—একতালা।

আমায় ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় বলে
পদে পদে পথ ভুলি হে।
নানা কথার ছলে নানান্ মুনি বলে
সংশয়ে তাই দুলি হে।
তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ,
কানের কাছে সবাই করিছে বিবাদ
শত লোকের শত বুলি হে।
কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি
আড়াল করে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,
ধরণীর ধূলো তাই নিয়ে আছি
পাইনে চরণ ধূলি হে।
শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়
আপনা আপনি বিবাদ বাধায়,
কারে সামালিব, এ কি হল দায়,
একা যে অনেক গুলি হে।
আমায় এক কর তোমার প্রেমে বেঁধে
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে,
ধাঁধার মাঝে পড়ে কত মরি কেঁদে
চরণেতে লহ তুলি হে।

পূরবী—চৌতাল।

তোমা লাগি নাথ জাগি জাগি হে
সুখ নাহি জীবনে তোমা বিনা।
সকলে চলে যায় ফেলে চির শরণ হে,
তুমি কাছে থাক সুখে দুখে নাথ
পাপে তাপে আর কেহ নাহি।

বেহাগ—চৌতাল।

স্বামী তুমি এস আজ, অন্ধকার হৃদয় মাঝ,
পাপে ম্লান পাই লাজ, ডাকি হে তোমারে।
ক্রন্দন উঠিছে প্রাণে, মন শান্তি নাহি মানে,
পথ তবু নাহি জানে আপন আঁধারে।
ধিক ধিক জনম মম, বিফল বিষয় শ্রম,
বিফল ক্ষণিক প্রেম টুটিয়া যায় বারবার।
সন্তাপে হৃদয় দহে নয়নে অশ্রুবারি বহে,
বাড়িছে বিষয় পিপাসা বিষম বিষ বিকারে।

মিশ্র ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

চাহিনা সুখে থাকিতে হে।
হের কত দীন জন কাঁদিছে।
কত শোকের ক্রন্দন গগনে উঠিছে,
জীবন বন্ধন নিমেষে টুটিছে,
কত ধূলিশায়ী জন মলিন জীবন
সরমে চাহে ঢাকিতে হে।
শোকে হাহাকারে বধির শ্রবণ
শুনিতে না পাই তোমার বচন,
হৃদয় বেদন করিতে মোচন
কারে ডাকি কারে ডাকিতে হে।
আশার অমৃত ঢালিদাও প্রাণে,
আশীর্ব্বাদ কর আতুর সন্তানে,
পথহারা জনে ডাকি গৃহ পানে
চরণে হবে রাখিতে হে।
প্রেম দাও, শোকে করিতে সান্ত্বনা,
ব্যথিত জনের ঘুচাতে যন্ত্রণা,
তোমার কিরণ করহ প্রেরণ
অশ্রু আকুল আঁখিতে হে।

নট্ মল্লার—চৌতাল।

চির দিবস নব মাধুরী নব শোভা নব বিশ্বে,
নব কুসুম পল্লব নব গীত নব আনন্দ।
নব জ্যোতি বিভাসিত, নব প্রাণ বিকশিত,
নব প্রীতি প্রবাহ হিল্লোলে।
চারিদিকে চিরদিন নবীন লাবণ্য
তব প্রেম নয়ন ছটা।
হৃদয় স্বামী তুমি চির প্রবীণ,
তুমি চির নবীন, চির মঙ্গল চির সুন্দর।

দেশ সিন্ধু—একতালা।

আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারিনি
তোমারে নাথ।
আমার লাজভয় আমার মান অপমান সুখ দুখ ভাবনা।
মাঝে রয়েছে আবরণ কত শত কত মত
তাই কেঁদে ফিরি; তাই তোমারে না পাই,
মনে থেকে যায় তাইহে মনের বেদনা।
যাহা রেখেছি তাহে কি সুখ, তাহে কেঁদে মরি
তাহে ভেবে মরি।
তাই দিয়ে যদি তোমারে পাই (জানি না) কেন
তা দিতে পারি না,
আমার জগতের সব তোমারে দেব, দিয়ে তোমার
নেব বাসনা।

সাহানা—কাওয়ালি।

আজ বুঝি আইল প্রিয়তম,
চরণে সকলে আকুল ধাইল।
কত দিন পরে মন মাতিল গানে
পূর্ণ আনন্দ জাগিল প্রাণে,
ভাই বলে ডাকি সবারে,
ভুবন সুমধুর প্রেমে ছাইল।

মিশ্র জয়জয়ন্তী—একতালা।

তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার,
তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত পাথার।
তুমিইত আনন্দ লোক জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক,
তাপ হরণ তোমার চরণ অসীম শরণ দীন জনার।

বিজ্ঞাপন।

বর্ত্তমান মাস হইতে যাঁহারা পত্রাদি অথবা মনি অর্ডার প্রভৃতি পাঠাইবেন তাহা কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তীর নামে আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে পাঠাইবেন।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

আগামী ১৬ই ফাল্গুন রবিবার বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সপ্তবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ সরকার।
সম্পাদক।

একাদশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
চৈত্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭
৫২৬ সংখ্যা
১৮০৮ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

অভিনন্দন পত্র।

ভক্তিভাজন শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রধানাচার্য্য মহাশয় শ্রীচরণেষু।

আর্য্য!

অদ্যকার দিন আমাদিগের পক্ষে সুদিন, যে দিন আমরা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ, পবিত্র মাঘোৎসবের আনন্দকর সময়ে, আপনাকে আমাদের হৃদয়ের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য আপনার সন্নিধানে উপস্থিত হইতেছি। দিন দিন আপনার শরীর জরাজীর্ণ ও অবসন্ন হইতেছে দেখিয়া আমরা বহুসংখ্যক নরনারী আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধার উপহার লইয়া আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। আমরা জানি, আমাদের সমাগমে আপনার মনে যে উত্তেজনা হইবে, তাহাও আপনার শরীরের বর্ত্তমান অবস্থাতে প্রার্থনীয় নহে; তথাপি আমাদিগের মধ্যে অনেকে আপনাকে দেখিবার জন্য ও আপনার ওই পবিত্র মুখের কয়েকটী কথা শুনিবার জন্য এত উৎসুক, যে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া আপনাকে এই ক্লেশ দিতে হইয়াছে।

আপনার ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের হিতকারী বন্ধু কে? মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ইহলোক হইতে অপসৃত হইলে, তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই যখন ইহাকে পরিত্যাগ করিলেন, যখন ইহার অন্তরের দুর্ব্বলতা ও বাহিরের প্রবল বিপক্ষকুল ইহাকে অবসন্ন দশায় পতিত করিল, যখন দেশব্যাপী ঘন নিবিড় অন্ধকার ও বিবিধ দুর্নীতির মধ্যে এই সমাজ মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল, যখন ইহার অঙ্কুরিত দেহে জল সেচন করিবার কেহই থাকিল না, যখন উৎসাহ দিবার ও সাহায্য করিবার লোক অধিক ছিল না বরং নিরাশ ও ভগ্নোদ্যম করিবার সকল কারণই বিদ্যমান ছিল, তখন আপনি বিধাতার মঙ্গল হস্ত দ্বারা নীত হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে প্রাণের সহিত আলিঙ্গন করিয়া ও ইহার কার্য্যভার নিজ মস্তকে লইয়া ইহাকে রক্ষা করিয়াছেন, এবং ইহার সেবাতে আপনার সময়, অর্থ ও সামর্থ্য অকাতরে নিয়োগ করিয়া ইহার অবসন্ন দেহে জীবন সঞ্চার করিয়াছেন। আপনার আগমনের পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক অবস্থা অতিশয় হীন ছিল। ইহার চেষ্টা প্রধানতঃ

কতকগুলি কুসংস্কারের প্রতিবাদে ও কতক-গুলি বিশুদ্ধ মত প্রচারে পর্য্যবসিত হইত। আপনিই সত্য-স্বরূপের অর্চ্চনা বিধিপূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; এবং সেই জীবনের উৎসের সহিত আমাদের আত্মার যোগ স্থাপন করিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক পিতার কার্য্য করিয়াছেন। আপনি ব্রাহ্ম-সমাজকে অনেক কুসংস্কার হইতে উন্মুক্ত করিয়াছেন; আপনি শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া অনেক সত্যামৃত উদ্ধার পূর্ব্বক আমাদিগকে অমৃত জীবন লাভ করিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন; আপনিই সর্ব্বাগ্রে নিজ চেষ্টা এবং বিদ্যালয় স্থাপন ও প্রচারক নিয়োগ প্রভৃতি দ্বারা দেশমধ্যে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; আপনিই সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের অপৌত্তলিক প্রণালী অনুসারে গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন; আপনিই সর্ব্বাগ্রে বিশুদ্ধ উপাসনা প্রণালী প্রণয়ন পূর্ব্বক তদনুসারে নিজে সাধন করিয়া অধ্যাত্মযোগের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন; এবং নিজ জীবনে জ্ঞান প্রীতি ও ঈশ্বরসেবার অসাধারণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত ভাবকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। অতএব ব্রাহ্মসমাজ আপনার নিকট চিরদিনের জন্য ঋণী।

কেবল ব্রাহ্মসমাজ কেন, সমগ্র ভারত সমাজ আপনার নিকট ঋণী। পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরের আধ্যাত্মিক পূজা বহুদিন হইতে এদেশে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। আপনি তাহাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে ও ভারতের ধর্ম্ম-চিন্তাকে জাগ্রত ও আধ্যাত্মিকতার পথে প্রবৃত্ত করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন; শত শত নর নারীর হৃদয়ে উন্নত আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিয়াছেন; এবং শত শত ব্যক্তিকে সংসারাসক্তির ও পাপাসক্তির করাল [illegible] হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ভারতের এমন বন্ধু কয় জন? আমরা এই সকল উপকার স্মরণ করিয়া আপনার চরণে আমাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার উপহার অর্পণ করিতেছি।

আমরা আপনারই আধ্যাত্মিক সন্তান; আপনারই শ্রম ও কার্য্যের উত্তরাধিকারী। আপনি যে গুরুভার, উৎসাহ, অনুরাগ ও স্বার্থত্যাগের সহিত চিরদিন বহন করিয়া আসিয়াছেন, আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন সেই ভার সেইরূপ বিশ্বাস নির্ভর ও আত্ম-সমর্পণের সহিত বহিতে পারি। আপনি আমাদিগকে যে গভীর আধ্যাত্মিকতার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাহা আমরা প্রাণপণে সাধন করিতে পারি। "তাঁহাকে প্রীতি করা তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা"—এই অমূল্য সত্য আপনিই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন; আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই উপদেশ আমরা কখনও বিস্মৃত না হই। আপনার কার্য্যের শক্তি যত দিন ছিল তত দিন সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতে ত্রুটি করেন নাই। এখন আপনি জরা ও অসুস্থতা বশতঃ যদিও কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়াছেন, তথাপি এখনও আপনার জীবন আমাদিগকে বিশুদ্ধ ঈশ্বর-প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছে; এবং এখনও আমরা ব্রাহ্মসমাজের বিবিধ সদনুষ্ঠানে আপনার পরামর্শ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছি। আপনি এখনও আমাদের মধ্যে আছেন, ইহা ভাবিলেও আমাদের আনন্দ। অতএব ঈশ্বরের চরণে আমাদের এই আন্তরিক প্রার্থনা, যে তিনি এখনও দীর্ঘকাল আপনাকে আমাদের মধ্যে রাখুন। আপনি নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে জীবনের অবসান কাল যাপন করুন। আমাদিগের

দৃষ্টান্ত, উপদেশ ও পরামর্শের দ্বারা ধর্ম্মসাধন ও সেই সত্যস্বরূপের নাম প্রচারে উৎসাহিত করুন। আমরা আপনার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া সেই পবিত্র স্বরূপের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে দেহ মন নিয়োগ করি; এবং উৎসাহের সহিত দেশ বিদেশে তাঁহার নাম প্রচার করি; আপনি দেখিয়া সুখী হউন। যে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিতে আপনার এত আনন্দ, সেই ব্রাহ্মসমাজের দৈনন্দিন উন্নতি দেখিয়া আপনি জীবনের শেষ অবস্থায় পরম পরিতৃপ্তি লাভ করুন।

আজ একবার আমাদের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখুন; এমন দিন ছিল যখন আপনার প্রিয় ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল; এখন দেখুন ঈশ্বর-কৃপায় কত শত নরনারী সেই পবিত্র অগ্নি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন; দেখুন কত মহিলা কত পরিবার আজ এই কৃতজ্ঞতার উপহার লইয়া আপনার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি সমবেত সকলকে স্নেহাশীর্ব্বাদ করুন। ইতি।

আপনার আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ।

ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রত্যুত্তর।

প্রীতিভাজন

শ্রীমৎ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ [illegible]

[illegible]

সৌম্য!

তোমরা সকলে মিলিয়া আমার হস্তে যে [illegible] উপহার প্রদান করিলে ইহাতে আমি ধন্য হইলাম—ইহা কৃপণের ধনের ন্যায় অতি যত্নে চিরজীবন আমি রক্ষা করিব। অদ্য আমার কি আনন্দের দিন। পূর্ব্বে যখন কোন এক জন ব্রাহ্মকে আমি দেখিতে পাইতাম, তখন তাঁহাকে দেখিয়া আমার আনন্দ হৃদয়ে আর ধরিত না। এখন এখানে শত শত নর নারীকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত ও অনুরক্ত দেখিয়া আমার কত আনন্দ। হৃদয়ে হৃদয়ে অনুরাগের সহিত অনুরাগ মিশ্রিত হইয়া কি এক অপূর্ব্ব আনন্দের ধারা এখানে প্রবাহিত হইয়াছে। আনন্দের এমন আস্বাদ আমি আর কখনই পাই নাই। "এষহ্যেবানন্দয়াতি।" ইনিই আনন্দ বিধান করেন। এতগুলিন জ্ঞানে, প্রেমে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিশুদ্ধ পরিবারবদ্ধ ব্রাহ্মদিগকে এজীবনে দেখিয়া যাইব ইহা আমার চিন্তার ও আশার অতীত। আমার এমন কি বল, কি পুণ্য যে, এই প্রশস্ততম, উন্নততম ব্রাহ্মধর্ম্মকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আমি উপযুক্ত সেবক হইতে পারি। ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য যাহা কিছু বলিয়াছি, যাহা কিছু করিয়াছি তাহা কেবল তাঁহারই কৃপাতে—তাঁহারই সাহায্যে। আমার হৃদয়ে তিনি আসীন হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির জন্য যে শুভ বুদ্ধি প্রেরণ করিয়াছেন আমি তাহারই অনুযায়ী চলিয়া এতটুকু যাহা কিছু করিতে পারিয়াছি। সমুদায় আকাশ যাঁহার [illegible] ভার বহন করিতে পারে না, আমার দুর্ব্বল হৃদয়ে সেই ভার পড়িয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্য কি। তাঁহার কৃপাতে যাহী যে, সে সোণা হয়, পঙ্গু গিরিকে লঙ্ঘন করে। ব্রহ্মকৃপা হি কেবলং—ব্রহ্মকৃপা হি কেবলং, ব্রহ্মকৃপা হি কেবলং পাপনাশহেতুরেব ব্রহ্মকৃপা হি কেবলং।" তোমরা তাঁহার [illegible] অনুক্ষণ প্রার্থনা কর, তাঁহাকে হৃদয়ে [illegible]

তাঁহার আদেশ অনুযায়ী অটল ভাবে চলিতে থাক, ব্রাহ্মসমাজের অশেষ উন্নতি হইবে। চিরদিন তোমরা তাঁহাতে বিশ্বাস, নির্ভর ও আত্ম সমর্পণ করিয়া তাঁহার পবিত্র উপাসনার দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র প্রদর্শন কর, ইহাতে আর আর সকলের হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়া তোমাদের সঙ্গী করিয়া লইতে পারিবে। তোমাদের সহিত এমন পবিত্র সম্মিলন সুখ এ জীবনে আর উপভোগ করিবার আমার আশা নাই, আমার তো কথাও শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমি এক্ষণে তোমাদের নিকট হইতে বিদায় লই; তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা সকলে একমনা হইয়া, স্কন্ধে স্কন্ধে মিলিয়া, ঊর্দ্ধমুখে—তাঁহার সিংহাসনাভিমুখে অটল ভাবে চলিতে থাক, তোমাদের মধ্যে সকল বিবাদ কলহ তিরোহিত হউক, শান্তি-সুখ বিস্তার হউক। তোমাদের ধর্ম্মেতে মতি হউক, ঈশ্বরের প্রেম-মুখ দর্শন করিয়া তোমাদের হৃদয় নিষ্পাপ ও পবিত্র হউক। তোমাদের প্রত্যেক পরিবার ধর্ম্মের পরিবার হউক, তোমাদের কুলে যেন কেহ অব্রাহ্ম না হয়। তোমরা সকলে ব্রহ্মবান্ ও ব্রহ্মবতী হও। এই সভাস্থ প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রসাদ অবতীর্ণ হউক, এই আমার স্নেহপূর্ণ শেষ আশীর্ব্বাদ।

সাধারণ সমাজের অন্তর্গত ছাত্র সমাজের অভিনন্দন পত্র।

ওঁ তৎসৎ।

পরম ভক্তিভাজন

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধানাচার্য্য

মহাশয় শ্রীচরণেষু।

দেব!

আমাদের প্রিয়তম মাঘোৎসবে আমরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত ছাত্রসমাজের সভাগণ ভক্তিপূর্ণ অন্তরে হৃদয়ের গভীরতম শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা চিহ্ন-স্বরূপ এই যৎসামান্য প্রীতি-উপহার লইয়া আপনার চরণ-প্রান্তে উপস্থিত হইতেছি। যদিও আমাদের মধ্যে অনেকে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত নহে, এবং যে সময় আপনি ব্রাহ্মসমাজের বেদিকে অলঙ্কৃত করিয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় জ্বলন্ত ও জীবন্ত সত্য সকল বর্ষণ করিতেন যদিও আমরা তৎপরকালবর্ত্তী বলিয়া সেই উপদেশ শ্রবণে সুখসম্ভোগ করিতে পারি নাই, তথাপি আমরা সকলেই বাল্য দিন হইতে আপনার নাম হৃদয়ের নিভৃত স্থলে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত ধারণ করিয়া আসিতেছি, এবং অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক তত্ত্বের খনির-স্বরূপ আপনার ব্যাখ্যানমালা পাঠ করিয়া আমরা প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছি ও অদ্যাপি করিতেছি। আপনি নিজ জীবনে যে প্রগাঢ় ঈশ্বরপ্রীতি, আধ্যাত্মিকতা ও সত্যপরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা দুর্ব্বল শক্তিতে যথাসাধ্য সেই পদবীর অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

আমাদের অধিকাংশেরই পাঠদ্দশা। ছাত্রগণের মধ্যে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করা, শিক্ষাকে ধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করা, যুবকদিগের মনে কর্ত্তব্য জ্ঞানকে উজ্জ্বল করা, তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতির সুনিয়মে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, এবং সকল প্রকার সদনুষ্ঠানে উৎসাহিত করা, ছাত্রসমাজের লক্ষ্য। আমাদের এই ছাত্রসমাজকে আপনার পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্যের উত্তরাধিকারী বলিলেও হয়। আমরা অদ্যকার এই বিশেষ দিনে আপনার স্নেহাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। আপনি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন, যেন এদেশে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যুবকগণ আপনার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী

হইতে পারে, যেন আমাদের শিক্ষা আমাদিগকে সত্যস্বরূপে উপনীত করিতে পারে, যেন জ্ঞান-লাভ করিয়া আমরা ধর্ম্মের মহিমা অনুভব করি এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ-চরিত্র থাকিয়া ঈশ্বর-প্রীতি ও ঈশ্বর-সেবাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারি। ইতি।

ব্রাহ্মাব্দ ৫৮, ১০ মাঘ } আপনার আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
কলিকাতা। } ছাত্রসমাজের সভ্যগণ,

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রত্যুত্তর।

ওঁ তৎসৎ।

স্নেহাস্পদ ছাত্রসমাজের সভ্যগণ
সমীপেষু।

প্রিয়দর্শন!

আমার প্রতি তোমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার ও প্রীতির উপহার আমি আদরের সহিত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলাম। তোমরা ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া হৃদয়কে পবিত্র কর এবং তাহাতে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ রোপিত হইবে তাহা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত পালন করিতে থাক, কালে তাহাতে যে ফল ফলিবে সে ফল হইতে নিশ্চয় অমৃত লাভ হইবে। তোমরা যাহা কিছু শিখিবে, তাহাতে প্রমাদশূন্য হইবে। তোমরা ঈশ্বরের পথে যতটুকু অগ্রসর হইবে যত্নপূর্ব্বক তাহা রক্ষা করিবে। ভবিষ্যতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি তোমাদের উপরেই নির্ভর করিতেছে। তোমরা জ্ঞান লাভ করিয়া ধর্ম্মের মহিমা অনুভব কর এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রকে বিশুদ্ধ করিয়া ঈশ্বর-প্রীতি ঈশ্বর-সেবাতে আত্ম সমর্পণ কর। ইহাতে তোমাদের ইহকালের ও পরকালের মঙ্গল হইবে। যেখানে থাক, তোমাদের শরীর মন আত্মা কুশলে থাকুক এই আমার আশীর্ব্বাদ।

ব্রাহ্মসাধারণের প্রতি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপহার।

ওঁ তৎসৎ।

হে প্রিয় ব্রাহ্মগণ!

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং।
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে ॥"

তোমরা সকলে এক সঙ্গে মিলিত হও, এক সঙ্গে কথা বল, এক সঙ্গে সকলের মন সকলে জানো। পুরাতন দেবতারা যেমন একমত হইয়া হবির্ভাগ গ্রহণ করেন—তোমরাও সেইরূপ একমত হও।

"সমানীব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥"

তোমাদের সংকল্প এবং অধ্যবসায় সমান হউক, তোমাদের হৃদয় সমান হউক, তোমাদের মন সমান হউক—যাহাতে তোমাদের মধ্যে সুশোভন সম্মিলন প্রাদুর্ভূত হয়।

তোমরা সকলে এক-হৃদয় এক-বাক্য হইয়া চল বেদবচনে তোমাদের প্রতি এই যে আমার স্নেহের আশীর্ব্বাদ ও হিত-কামনা প্রকাশ করিলাম, এই বিবাদ কলহের মধ্যে তাহার প্রতি তোমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ইহার জন্য তোমরা এই পদ্ধতিটি যদি অবলম্বন কর, তবে ইহাতে সিদ্ধকাম হইবে। পদ্ধতিটি এই—আমরা আদি-ব্রাহ্ম, সাধারণ ব্রাহ্ম বা মন্ত্রগ্রাহী ব্রাহ্ম বা অন্য কোন রূপ ব্রাহ্ম, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব বিস্মৃত হইয়া, আমরা ব্রাহ্ম—এক ঈশ্বরের উপাসক, এক পিতার পুত্র, মনুষ্য আমাদের ভ্রাতা, এই মহৎ ভাবটির প্রতি আত্মার

সমস্ত ঝোঁক সমর্পণ করা। এই পদ্ধতিই সম্মিলনের পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অবলম্বন করিলে তোমাদের মধ্য হইতে সকল বিবাদ চলিয়া যাইবে, শান্তির অভ্যুদয় হইবে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে।

১। ব্রাহ্মধর্ম্ম আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম। তাহার বীজ এই যে, আত্মার দ্বারা পরমাত্মাকে জানিবে। আত্মাতে ঈশ্বরকে দেখিলে সর্ব্বত্রই তাঁহাকে দেখা যায়। যিনি সকল বৈচিত্র্যের মূল, সকল সংসারের একাধিপতি, তাঁহার প্রিয় আবাস-স্থান নর-নারীর আত্মা। আত্মাকে যদি না জানো তবে সকলি শূন্য। আত্মাই পরমাত্ম-জ্ঞানের মূল।

২। এই শরীরের মধ্যে যে শরীরী আত্মা, তাহার অভ্যন্তরে বিশুদ্ধ জ্ঞানালোকে শুদ্ধ-বুদ্ধ অশরীর পরমাত্মাকে দেখিবে—শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, সমাহিত হইয়া স্বীয় আত্মাতে পরমাত্মাকে দেখিবে। এই অধ্যাত্মযোগ। ভক্তির সহিত এই যোগে যুক্ত হইলে সকল পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, মুক্তির সোপান লাভ করিবে। মৃত্যুর পরে শরীর পড়িয়া থাকিবে কিন্তু এই যোগে যুক্ত হইয়া আত্মা পরমাত্মার সহিত অনন্ত কাল বিচরণ করিবে।

৩। শরীরের সুস্থতার জন্য যেমন প্রতিদিন নিয়মিত আহার কর, সেইরূপ আত্মার সুস্থতার জন্য প্রতি দিন ঈশ্বরের উপাসনা করিবে। ঈশ্বরের উপাসনা আত্মার অন্ন।

৪। "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" দেশকালাতীত অথচ দেশকালব্যাপী সর্ব্বসাক্ষী সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মকে পিতা মাতা সুহৃৎ জানিয়া, অন্তর্যামী হৃদয়ের প্রভু জানিয়া প্রেম-ভক্তে নিত্য আরাধনা করিবে এবং সংসারের হিতকামনায় তাঁহার প্রিয় ধর্ম্ম-কার্য্য সকল অহোরাত্র সাধন করিতে থাকিবে। তাঁহার উপাসনার এই নিত্য-যুক্ত দুই অঙ্গকে কদাপি বিচ্ছিন্ন করিবে না।

৫। কুলপাবন সৎপুত্র হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্ব-প্রযত্নে পিতা মাতার সেবা করিবে। তাঁহাদের প্রতি কদাপি কর্কশ ব্যবহার করিবে না। আপনার সুখভোগের কামনা খর্ব্ব করিয়াও তাঁহাদিগকে সুখী ও সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিবে।

৬। পরমেশ্বরের প্রীতি-কামনায় ভ্রাতা, ভগিনী, ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা সন্ততিদিগকে অপরাজিত চিত্তে প্রতিপালন করিবে এবং তাহাদের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করিবে।

৭। সর্ব্বাবয়বসম্পন্না সাধুশীলা স্ত্রীকে বিবাহ করিবে। রুগ্না বা অঙ্গ-হীনা বা দুশ্চরিত্রার পাণি-গ্রহণ করিবে না। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কেহ চারিত্র্যহীন হইলে অশেষ অমঙ্গল উৎপন্ন হয়, অতএব পরস্পর পরস্পরের সুশীলতা অবগত হইয়া বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবে। পত্নী স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইবেন, সহকর্ম্মিণী হইবেন, সহভোগিনী হইবেন। মূল্য দ্বারা পত্নীক্রয় করিবে না এবং নিজেও অর্থলোলুপ হইয়া পত্নীগ্রহণ করিবে না, তাহা ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে।

৮। স্বামীর প্রিয়কারিণী, হিতকারিণী, সদাচারা, জিতেন্দ্রিয়া, ব্রহ্মপরায়ণা স্ত্রীর প্রতি যেমন মনুষ্যেরা সন্তুষ্ট হন, সেইরূপ তাঁহার প্রতি ঈশ্বর সন্তুষ্ট থাকেন। এইরূপ স্ত্রী ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল লাভ করিয়া কৃতার্থ হন এবং তাঁহার কীর্ত্তি পৃথিবীতে অন্যান্য স্ত্রীদিগকে সাধু কর্ম্মে উৎসাহ দান করে।

৯। আমোরা স্ত্রীর [illegible] ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনে [illegible]

বেন, সদুপদেশ প্রদান ও সাধু-দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন এবং প্রীতি ও সমাদরের সহিত তাঁহাকে প্রতিপালন করিবেন। সাধ্বী স্ত্রীকে পুরুষ কদাপি পরিত্যাগ করিবেন না।

১০। দুর্বিনীতদিগের যে অভদ্র দর্শনে, অভদ্র শ্রবণে মন অভদ্র হইতে পারে, যে সকল আমোদ প্রমোদে ধর্ম্মভাব মলিন হইয়া যায়, যেখানে পাপ-প্রলোভন মনকে বিচলিত করে, তথায় দুঃসঙ্গে অবস্থান কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগকে এই সকল দুঃস্থান ও দুঃসঙ্গ হইতে অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। পাপ-সংসর্গে পাপের প্রতি আসক্তি জন্মে।

১১। যাহা কিছু পরাধীন তাহা দুঃখের কারণ। আত্মবশ সকলি সুখের কারণ। অতএব জ্যেষ্ঠেরা স্বাধীন ভাবে অবস্থান করিবার চেষ্টা করিবেন। আত্মচিন্তা আত্মনির্ভর অভ্যাস করিবেন। সাধ্য থাকিতে অন্যের গলগ্রহ হইবেন না। মিতব্যয় অভ্যাস করিয়া অতিলোভ পরিত্যাগ করিবেন। মিতব্যয় দ্বারা আপনার ও পরিবারের ও সমাজের কুশল রক্ষা করিবেন। কদাপি কৃপণতা দোষে লিপ্ত হইবেন না।

১২। আত্মার দ্বারা যে আত্মা বশীভূত হইয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু। আত্মাই নিয়ত বন্ধু আত্মাই নিয়ত রিপু।

১৩। উত্তম মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়া এবং ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠব লাভ করিয়া যে ব্যক্তি আত্ম-হিত না জানে সে আত্মঘাতী হয়।

১৪। যতই বিষয় ভোগ করিবে, বিষয়-তৃষ্ণা ততই বৃদ্ধি পাইবে। অতএব সন্তোষ অবলম্বন করিবে এবং প্রকৃত তৃপ্তি-স্থান সংসারের অতীত জানিয়া সংসারের আসক্তি পরিত্যাগ করিবে।

১৫। সুখই হউক আর দুঃখই হউক, প্রিয় ঘটনাই হউক আর অপ্রিয় ঘটনাই হউক, সর্ব্বদাই এই লক্ষ্য রাখিবে যেন তাহাতে হৃদয় অভিভূত না হয়। ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে একান্ত নির্ভর করিয়া সুখ দুঃখ ও সম্পদ বিপদকে পরাজয় করিবে। প্রিয় ঘটনায় আহ্লাদে মত্ত হইবে না, অপ্রিয় ঘটনায় বিষাদে ম্রিয়মান হইবে না। মনের মধ্যে অত্যন্ত সন্তাপ উপস্থিত হইতে দিবে না। সন্তাপের কারণ উপস্থিত হইলে ধৈর্য্য ও বিবেচনা পূর্ব্বক আপনাকে রক্ষা করিবে।

১৬। আত্ম-প্রশংসা ও পরনিন্দা পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্বদা সত্যব্রত থাকিবে। মনকে সত্যের অনুগত করিবে, বাক্যকে সত্যের অনুগত করিবে, এবং আচরণকে সত্যের অনুগত করিবে। যাহাতে সত্যের অপলাপ হয় না অথচ লোকের প্রীতি ও কল্যাণ উৎপন্ন হয় তাদৃশ বাক্যই কহিবে। যাহা সত্য কিন্তু তাহা কহিলে কাহারো হৃদয়ে আঘাত দেওয়া হয়, তাহা সংযত করিয়া রাখিবে, ধর্ম্মের অনুরোধে আবশ্যক না হইলে কহিবে না। প্রিয় অথচ মিথ্যা একেবারে পরিত্যাগ করিবে। বাক্যে সত্যবাদী ও ব্যবহারে সত্যপরায়ণ হইবে। সত্যের সমান আর ধর্ম্ম নাই—সত্য হইতে প্রকৃষ্ট বস্তুও আর কিছুই নাই। ইহলোকে মিথ্যার পর তীব্র পদার্থও আর নাই।

১৭। যাহাতে মঙ্গল হইবে তাহারই অনুষ্ঠান করিবে। পাপকারীর প্রতি পাপাচার করিবে না। কেহ অন্যায় করিলে অন্যায় করিয়া তাহার প্রতিকার করিবে না। সর্ব্বদা সাধু থাকিবে। সাধু উপায় অবলম্বন করিয়া অসাধুতার প্রতিবিধান করিবে। ন্যায়-পথে থাকিয়া অন্যায়াচরণের প্রতিবিধান করিবে। অসাধুকে সাধুতার দ্বারা জয় করিবে। কেহ অসদ্ব্যবহার করিলেও তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে।

১৮। যত্নপূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করিবে। সংসারে নানাবিধ অবস্থায় পতিত হইতে হয়, তাহাতে অন্তঃকরণ নানাবিধ ভাবে আক্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত হইতে পারে। ধর্ম্মভাব ম্লান হইতে পারে, পবিত্র উৎসাহ নির্ব্বাণ হইতে পারে, সাধু আশা নৈরাশ্যে পরিণত হইতে পারে, মোহ উৎপন্ন হইয়া জীবনকে মলিন করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় সাধুগণের সংসর্গ আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারে। সাধুসঙ্গ প্রভাবে মুমূর্ষু আত্মা জীবন প্রাপ্ত হয়, হতাশ মনুষ্য আশা লাভ করে এবং নিরুৎসাহ চিত্ত উৎসাহিত হয়। যেমন সূর্য্যের আলোক রূপহীন বস্তুকে রূপবান করে, সেইরূপ সাধুগণের সাধুতা অসাধু জীবনকেও পবিত্র ও পুণ্যশীল করে। সাধু সঙ্গের এই মহৎ গুণ যে, তাহাতে অসাধু ভাবের দমন হয়, সাধু ভাবের উদ্দীপন হয়। অতএব ধর্ম্মার্থীগণ সাধুসঙ্গ সেবনে অবহেলা করিবেন না।

১৯। অসাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। যাহার সঙ্গে অবস্থান করিলে নীচ কামনা ও নীচ ভাব উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবে। অসাধু ব্যক্তিদিগের সহবাসে সমস্ত মোহের উৎপত্তি হয়। অসাধুসঙ্গে পাপের প্রতি ঘৃণা ও ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা মন্দীভূত হয়। অতএব তোমরা অসাধু-সঙ্গ পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্বদা সাধু-সঙ্গ করিবে।

২০। কাহারো সহিত বিবাদ করিবে না। ক্রোধ সম্বরণ করিবে এবং ক্ষমা ও প্রীতির সহিত সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। মৈত্রীই যেন অন্যের সহিত ব্যবহারের নিয়ামক হয়।

২১। উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে। কেহ সামান্য উপকার করিলেও তাহা বিস্মৃত হইবে না। কৃতজ্ঞতার বিপরীত ভাব কৃতঘ্নতা যেন তোমাদের মনে স্থান না পায়। যেহেতুক কৃতঘ্নের ধর্ম্মই বা কোথায়, স্থানই বা কোথায়, সুখই বা কোথায়? কৃতঘ্ন ব্যক্তি শ্রদ্ধার পাত্র নহে—কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই।

২২। অল্পই হউক আর অনল্পই হউক শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সৎপাত্রে দান করিবে। দাতার শ্রদ্ধা, পাত্রের উপযুক্ততা অনুসারে দানের উৎকর্ষতার তারতম্য হয়। যাহাকে দান করিলে অসৎ কর্ম্মে উৎসাহ দেওয়া হয় তাদৃশ অসৎ পাত্রে দান ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। যে ব্যক্তি বাস্তবিক অভাবে নিপীড়িত হইতেছে, দাতাগণের অনুগ্রহই যাহার একমাত্র ভরসা সেই ব্যক্তিই দানের উপযুক্ত পাত্র। তাদৃশ সৎপাত্রে শ্রদ্ধা সহকারে যথাসাধ্য দান করিয়া তোমরা পুণ্য উপার্জ্জন করিবে। ইহাতে তোমাদের আত্মা প্রসাদ লাভ করিবে।

২৩। দানের জন্য অন্যায় পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করিবে না। তাদৃশ দানে পুণ্যলাভ হয় না, প্রত্যুত তাহাতে মহৎ পাপে পতিত হইতে হয়। অতএব যদি ধন দানে সামর্থ্য না থাকে তবে আর অন্যান্য উপায়ে দুঃখীদিগের দুঃখমোচন করিবে। কদাপি অন্যায় করিয়া ধন আহরণ করিবে না।

২৪। আপনার জীবিকা ও অবশ্য-পোষ্য পরিবারগণের প্রতিপালনের জন্যও অন্যায় পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করিবে না। ঈশ্বর যে ধর্ম্মজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন তাহার আদেশ প্রতিপালন করা এ ক্ষণ-ভঙ্গুর জীবনকে রক্ষা করা অপেক্ষাও গরীয়ান্। যদি অন্যায় পথে থাকিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে সে জীবন বাস্তবিক মৃত্যু এবং যদি ন্যায় রক্ষার অনুরোধে যথার্থই মৃত্যু উপস্থিত হয় তবে সেই মৃত্যুই আমাদিগের জীবন।

২৫। অহরহ আপনাকে শিক্ষা দান করিবে—আপনাকে শাসন করিবে—আপ

নাকে ধর্ম্মপরায়ণ করিবে। যিনি আপনার ইন্দ্রিয়গণ ও অন্তঃকরণ বশীভূত করিতে পারেন, তাঁহার ক্লেশ ভোগ করিবার কোন কারণ থাকে না। যিনি আপনাকে দমন করিতে না পারেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকেই যন্ত্রণা।

২৬। পরশ্রীতে কাতর হইবে না। পরশ্রীতে কাতরতার তুল্য কুৎসিত ব্যাধি আর কিছুই নাই। অন্যের মঙ্গলের প্রতি যাহার বিদ্বেষ হয়, তাহার আর মনের আরাম থাকে না, তাহার আর শান্তি থাকে না। এই সংসারে যে যত উন্নত হইয়া শুভ ফল ভোগ করিতে থাকে, সে অজ্ঞাতসারে ঈর্ষ্যাকারীর মনে তত আঘাত দিতে থাকে। অতএব সকলের মঙ্গলের মধ্যে আপনার মঙ্গল সন্নিবিষ্ট জানিয়া তোমরা ঐরূপ ক্ষুদ্রতা হৃদয়ে স্থান দিবে না।

২৭। সম্পদে বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করিবে। যে ব্যক্তি মনের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করে, সহস্র দোষে দোষী হইলেও তাহাকে ক্ষমা করিবে। বিকার-জনক প্রলোভনে পরিবেষ্টিত থাকিলেও অন্তঃকরণ যাহাতে বিকার প্রাপ্ত না হয় এইরূপে তাহাকে বশীভূত করিবে। স্বামীর অজ্ঞাতসারে বা প্রতারণা পূর্ব্বক অথবা বলপূর্ব্বক পরদ্রব্য গ্রহণ করিবে না। কায়িক, মানসিক, বাচনিক দোষ-সকল প্রক্ষালন করিয়া সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইয়া থাকিবে। ইন্দ্রিয়গণকে শাসন করিবে, বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিবে, জ্ঞান অভ্যাস করিবে, সত্য কথা কহিবে এবং ক্রোধ সম্বরণ করিবে। ইহাই ধর্ম্মের লক্ষণ।

২৮। অন্যের মুখ হইতেও একটি অশ্লীল বাক্য শুনিলে যাহার লজ্জা বোধ হয়, সেই হ্রীমান্। হ্রীমান্ ব্যক্তি পাপকে অতিমাত্র ঘৃণা করেন এবং তাহার সম্পর্ক হইতে দূরে থাকিতে স্বভাবতই ইচ্ছা করেন—তাঁহার শ্রী বর্দ্ধিত হয়। যাহার হ্রী নষ্ট হয়, তাহার পক্ষে ঘৃণিত পাপ-পথ সহজ হয়—কল্যাণকর ধর্ম্মপথে তাঁহার বাধা জন্মে এবং অধর্ম্মে পতিত হইয়া শ্রীহীন ও মলিন হয়। অতএব তোমরা কথাতে, ভাবেতে, বেশ-বিন্যাসে যত্নপূর্ব্বক হ্রীকে রক্ষা করিবে।

২৯। "যথৈবাত্মা পরস্তদ্বৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা" যিনি সকলের শুভাকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি যেমন আপনাকে তেমনি পরকে দেখেন। যেমন আপনাকে অন্যের প্রীতিভাজন দেখিলে সুখী হও, সেইরূপ অন্যের প্রতি প্রীতি করিয়া তাহাকে সুখী করিবে। যেমন অন্যের বিদ্বেষে কষ্ট বোধ কর, সেইরূপ অন্যকেও বিদ্বেষ করিয়া কষ্ট প্রদান করিবে না। এইরূপ সকল বিষয়ে আপনার সহিত তুলনা করিয়া অন্যের সহিত ব্যবহার করিবে। কেননা সুখ দুঃখ আপনাতেও যেরূপ, অন্যেতেও সেইরূপ। এইরূপ আচরণই কল্যাণ লাভের উপায়।

৩০। যিনি ঈশ্বরকে ভক্তি করেন এবং মনুষ্যকে প্রীতি করেন, তিনিই সাধু। তিনি কখন মনুষ্যকে অপবাদ প্রদান করিয়া আনন্দিত হন না। কেননা মনুষ্য তাঁহার প্রিয়। তিনি কাহারো দোষ দেখিলে দুঃখিত হন এবং প্রীতির সহিত তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন। তিনি মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়া প্রীতি করেন, এই জন্য তিনি কাহারো সদ্গুণ দেখিলে আনন্দিত হন এবং কাহারো দোষ দেখিলে দুঃখিত হন। তাঁহার সুখ ও দুঃখ উভয়ই প্রীতি হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং তিনি আহ্লাদের সহিত কাহারো দোষ ঘোষণা করিতে পারেন না। পিতা মাতা যেমন পুত্রকে পুত্র বলিয়াই প্রীতি করেন এই জন্য পুত্রের গুণ দেখিলে সুখী হন এবং দোষ দেখিলে হৃদয়ে আঘাত পান, সেইরূপ মনুষ্যকে কেবল মনুষ্য বলিয়াই প্রীতি করিতে শিক্ষা করিবে।

তাহা হইলে অন্যের অপবাদে হৃদয় আর আনন্দিত হইবে না। যে ব্যক্তি অন্যের দোষ দেখিয়া ও অন্যের দোষ ঘোষণা করিয়া হৃদয়ে সুখ অনুভব করে, তাহার হৃদয় অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তাদৃশ ক্ষুদ্রতার সংশোধন করিতে সর্ব্বদা যত্নবান থাকিবে।

৩১। বিনয়ী ব্যক্তিই ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হন এবং বিনয়ী ব্যক্তিই সংসারে উন্নতি লাভ করিতে পারেন। বিনয়হীন ব্যক্তি সকলেরই বিদ্বিষ্ট হয়। যদি সম্পত্তি থাকে, বিনয়ী হইলে তাহার শোভা বৃদ্ধি হইবে; যদি বিপত্তি হয়, বিনয়গুণে তাহা হইতে মুক্তিলাভ হইবে। অতএব ঈশ্বর অন্তরে যে সকল সদ্গুণ প্রদান করেন এবং বাহিরে যে সকল সৌভাগ্য প্রদান করেন, তাহার নিমিত্ত এক দিনও অহঙ্কার করিবে না।

৩২। "মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যং" মদ্যপানে মন, বুদ্ধি ও বিবেক-শক্তি নিস্তেজ ও প্রভাহীন হইয়া পড়ে, হৃদয়ের পবিত্র ভাব সকল অসাড় হইয়া যায়, আত্মার আর স্ফূর্ত্তি থাকে না। যে পরিবার মধ্যে এই মহা পাপ প্রবেশ করে, সে পরিবারের দুর্গতির আর অন্ত নাই। এই বঙ্গদেশে কত সুস্থ ও সবল ব্যক্তি এই মহাপাপ জন্য স্বাস্থ্য হারাইতেছে, অকালে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইতেছে এবং অসময়ে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে। কত কত বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ ব্যক্তি এই মহাপাপ জন্য আপনাদিগের বুদ্ধি ও বিদ্যা হারাইয়া লোকের সম্মুখে ঘৃণিত ও অপমানিত হইতেছে। কত কত বিচক্ষণ ব্যক্তি বিবেক-শক্তি-চ্যুত হইতেছে এবং রিপুগণের বশীভূত হইয়া পশুর ন্যায় আচরণ করিতেছে। কত কত ব্যক্তি আত্মার অবনতি করিয়া ঈশ্বর জ্ঞানে অনধিকারী হইয়া আপনাদিগের সুগতির পথে কণ্টক রোপণ করিতেছে। অতএব সাবধান! তোমাদিগের মধ্যে যেন এই পাপ প্রবেশ না করে। তোমরা অন্যকে মদ্য দিবে না। আপনারা মদ্যপান করিবে না—একেবারে তাহা স্পর্শ করিবে না। এই সনাতন ধর্ম্ম।

৩৩। অন্তরাত্মার পরিতোষ, আত্ম-প্রসাদ, তাহা ধর্ম্মানুষ্ঠানের অব্যর্থ ফল। আত্ম-প্রসাদেই ঈশ্বরের প্রসাদ অনুভূত হয়। আত্মা প্রসন্ন থাকিলে সকল দুঃখ বিনষ্ট হয়। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত আত্মা পরিতুষ্ট হয় না। বিষয়-সুখে মন সুখী হইতে পারে, কিন্তু আত্মাতে যদি গ্লানি থাকে তাহা হইলে রাশীকৃত বিষয়-সুখও ব্যর্থ হইয়া যায়; অতএব ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আত্মাকে পরিতুষ্ট রাখিবে এবং যাহাতে আত্ম-প্রসাদের হানি হয় তাহা পরিত্যাগ করিবে।

৩৪। ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত সাধ্যানুসারে যত্ন করিবে। সমুদায় শক্তি নিয়োগ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিলেও পুণ্য লাভ হইবে। ঈশ্বরের অশেষ কার্য্য কে কতদূর সম্পন্ন করিল, ঈশ্বর তাহা গণনা করেন না। তিনি যাহাকে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন সে তাহা অকপটে নিয়োগ করুক ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। তাহা হইলেই তিনি তাহাকে কৃতকৃত্য করেন।

৩৫। সারথী যেমন অশ্ব-সকলের সংযম করে, তদ্রূপ বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়-সকলকে সংযম করিবে। যে সকল বিষয় ইন্দ্রিয়গোচরে উপস্থিত হইলে অন্তঃকরণে অসৎ ভাবের উদয় হয়, ইন্দ্রিয়গণকে তাদৃশ অপবিত্র বিষয়ে নিয়োগ করিবে না। পবিত্র বিষয় উপভোগের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে পরিতৃপ্ত করিয়া অহরহ জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত থাকিবে। যখন যে প্রবৃত্তি উঠে তাহাতেই ইন্দ্রিয়দিগকে বিচরণ করিতে দিবে না, কিন্তু আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের আদেশে মনকে সুশিক্ষিত ও বশীভূত করিয়া ইন্দ্রিয়-

দিগকে দমন করিবে। মন যদি স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়-সকলের অনুগামী হয়, তবে বায়ু যেমন নৌকাকে জলেতে মগ্ন করে মনও তদ্রূপ পুরুষের বুদ্ধিকে নষ্ট করে। যখন প্রলোভন-সঙ্কুল সংসারে অবস্থান করিয়াই ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে তখন মনকে দমন করিতে না পারিলে পদে পদেই বিপদ ঘটিয়া উঠে। মন ইন্দ্রিয়গণের অনুকূল হইলে মনুষ্য হতচেতন হইয়া পাপে মোহে মুগ্ধ হয়। অতএব যাহাতে শরীর ক্ষীণ না হয় এমত উপায় দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়-সকলকে বশীভূত করিয়া ধর্ম্মসাধন করিবে।

৩৬। পাপ চিন্তা, পাপালাপ, পাপ অনুষ্ঠান করিবে না। যাঁহারা মন ও বাক্য ও কর্ম্ম ও বাক্য দ্বারা পাপাচরণ না করেন, সেই মহাত্মারাই তপস্যা করেন। যাহারা শরীর শোষণ করেন, তাঁহারা তপস্যা করেন না। অতএব তোমরা পাপ হইতে বিরত হইয়া শুভ কার্য্যে রত থাকিবে। ধর্ম্ম-পথে থাকিয়া জীবিকা লাভ করিবে।

৩৭। ধর্ম্ম-পথে থাকিয়া নিতান্ত অবসন্ন হইলেও অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে না। তোমরা প্রাণপণে ধর্ম্মকে রক্ষা কর, ধর্ম্ম তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।

৩৮। পরলোকে সহায়ের নিমিত্তে পিতামাতা স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু কেহই থাকেন না, কেবল ধর্ম্মই থাকেন। একাকী মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে, একাকী মৃত হয়, একাকী স্বীয় পুণ্য-ফল ভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃত ফল ভোগ করে। বান্ধবেরা ভূমিতলে মৃত শরীরকে কাষ্ঠ লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করেন, ধর্ম্ম তাহার অনুগামী হন। অতএব আপনার সাহায্যার্থে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মসঞ্চয় করিবে। ধর্ম্ম ইহকালের বন্ধু, ধর্ম্মই পরলোকের নেতা। "ধর্ম্ম সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।" ধর্ম্ম সকলের পক্ষে মধু স্বরূপ — ধর্ম্ম সকলেরই পক্ষে মধু স্বরূপ।

৩৯। "ন ধনেন ন প্রজয়া ন কর্ম্মণা ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ।" না ধনের দ্বারা, না পুত্রের দ্বারা, না কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি লাভ হয়, কেবল একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়। অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী হইয়া সংসার ত্যাগ করা নহে, কিন্তু গৃহে থাকিয়া সংসারী হইয়া হৃদিস্থিত কামনা সকল ত্যাগ করিতে হইবে।

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥"

যখন হৃদয়ের কামনা-সকল নিরস্ত হয় তখন মর্ত্ত্য অমৃত হয় এবং এখানেই ব্রহ্মকে উপভোগ করে। স্ত্রী পুত্র আত্মীয়দিগকে সদা প্রসন্নে পোষণ করিবে এবং নিজে নিষ্কাম হইয়া ফল ভোগের আসক্তি ত্যাগ করিবে, তবে মুক্তির সোপানে আরোহণ করিতে পারিবে। ইহার পূর্ণ আদর্শ স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি দেখ কেমন সংসারী। একটি কীট পতঙ্গেরও আহার দিতে তিনি ভুলেন না। কঠোর পর্ব্বতের প্রস্তর মধ্যেও তিনি জীব জন্তুকে অন্ন যোগাইতেছেন। কিন্তু তিনি আপনার জন্য কিছুই রাখেন না, কেবল সকলকে দিতেই থাকেন। এই আদর্শ অনুসারে তোমরাও আপনাকে ভুলিয়া সংসারের মঙ্গল কর্ম্মে ব্রতী থাকিবে। তাঁহাতেই যুক্ত হইয়া সংসার ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। যাহা তাঁহার আদেশ বলিয়া জানিবে তাহা প্রাণপণে প্রতিপালন করিবে। যাহা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ বলিয়া জানিবে তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। তুমি যদি আপনাকে ভুলিয়া এইরূপে তাঁহার কার্য্য করিতে থাক, নিশ্চয় জানিও তিনি তোমাকে ভুলিবেন না। তোমার যে সকল অভাব তাহা তিনি পূর্ণ করিবেন। তিনি

তোমাদিগকে যাহা দেন তাহাই যথেষ্ট বলিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া গ্রহণ করিবে। তিনি তোমাকে যে অবস্থায় রাখেন সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে। সম্পৎকালে তাঁহারই অনুগত হইয়া চলিবে, বিপৎকালে তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া বিচলিত হইবে না। কর্ম্মের সময় তাঁহাতে থাকিয়া কর্ম্ম করিবে, বিশ্রামের সময় তাঁহাতেই থাকিয়া বিশ্রাম করিবে। এই শরীর পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিবে, তোমার আত্মা পরমাত্মাতে যুক্ত থাকিবে। মৃত্যুতেও আত্মার সহিত পরমাত্মার এ যোগের অন্ত নাই।

৪০। পরতন্ত্ররাজ্যে স্বাধীনতা নাই। ঈশ্বর আত্মাকে স্বাধীনতা-অলঙ্কার দিয়াছেন। এই স্বাধীনতা থাকাতেই তোমাদের ধর্ম্ম কার্য্যে—শুভ কর্ম্মে অধিকার হইয়াছে, তোমাদের কেবল কর্ম্মেতে অধিকার হইয়াছে কিন্তু তাহার ফলেতে নহে। ফল ফলদাতার হস্তে।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ম্ম করিবে কিন্তু তাহার ফল-লাভের জন্য ব্যাকুল হইবে না। তোমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস হউক যে, জগতের মঙ্গলের সহিত তোমাদের মঙ্গল যাহা বাঁধা আছে তাহা তিনি নিশ্চয়ই বিধান করিবেন। তোমরা তাহা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিবে। তোমাদের শরীর মনের অবস্থা তিনি ছাড়া কে আর অধিক জানে? তোমাদের প্রতি স্নেহ ও দয়া তাঁহার মত আর কাহার আছে? তিনি তোমাদিগকে যেমন রক্ষা করেন তেমন আর কে করিবে? অতএব তাঁহার মঙ্গলভাবের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া যাহাতে আপনার কল্যাণ জানো, তোমরা প্রাণপণে সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিবে। তাহার ফল তিনি উপযুক্ত রূপে বিধান করিবেন। এই তমসাকীর্ণ সংসারে ভয় পাইলে তোমরা তাঁহার ক্রোড়ের আশ্রয় লইতে পার; রোগে, শোকে, দারিদ্র্য দুঃখে নিপতিত হইলে তাঁহার নিকট ক্রন্দন করিতে পার; পাপে, তাপে জর্জ্জরিত হইয়া সন্তপ্ত চিত্তে তাঁহার প্রসাদ-বারি ভিক্ষা করিতে পার; কিন্তু এই ভয় দুঃখকে অতিক্রম করিয়া পাপ তাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া যখন তাঁহার ইচ্ছার অধীনে তোমাদের ইচ্ছাকে নিয়োগ করিতে পারিবে, যখন তোমাদের হৃদয় হইতে সকল প্রার্থনা গিয়া এই একটি প্রার্থনা তাঁহার সিংহাসনাভিমুখে উত্থিত হইবে যে, হে ঈশ্বর! তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক, জগতের মঙ্গল হউক, তখনি অমৃতত্ব তোমাদের হস্তগত হইবে, জীবন্মুক্তি লাভ করিবে। যখনি তোমরা আপন আপন মনের ক্ষুদ্রতা অপসারিত করিবে এবং হৃদয়ের কঠিন গ্রন্থি-সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবে, তখনি সেই মহতো মহীয়ান সৌন্দর্য্য-সাগরে তোমাদের প্রেম মগ্ন হইয়া যাইবে, লোক লোকান্তরে অনন্ত লোকে সেই প্রেমসুধা তোমাদের উপজীবিকা হইবে এবং তাহার বলে বলীয়ান্ হইয়া সেই প্রেমদাতার সহচর অনুচর হইয়া থাকিবে।

৪১। "বিজ্ঞান-সারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ
সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥"

বিজ্ঞান যাহার সারথী, মন যাহার বশীভূত সে সংসার-পথের পার সেই বিষ্ণুর পরম পদকে প্রাপ্ত হয়। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং। সেই বিষ্ণুর পরম পদকে জ্ঞানীরা সর্ব্বদাই দেখেন, চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত বস্তু দেখে।

সেই আত্মাই কৃতাত্মা, সেই আত্মাই ভাগ্যবান, যে রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় নিষ্পাপ ও পবিত্র হইয়া, শরীরের অভিমান

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

একাদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

১৮০৭ শক

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৪২। কলিগতাব্দ ৪৯৮৬। ১ চৈত্র শনিবার।

মূল্য ৪ চারি টাকা মাত্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একাদশ কল্পের তৃতীয় ভাগের সূচীপত্র